KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No.: KLMLGK 2007	Place of Publication: ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কল-১৩
Collection: KLMLGK	Publisher: [illegible]
Title: চতুরঙ্গ	Size: 7"x 9.5" 17.78 X 24.13 c.m.
Vol. & Number: 45/6 45/9 45/10	Year of Publication: Oct 1984 Jan 1985 Feb 1985
	Condition: Brittle / Good ✓
Editor: রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত, আবদুর রাউফ	Remarks:

C.D. Roll No.: KLMLGK

হুমায়ুন কবির এবং আতাউর রহমান-প্রতিষ্ঠিত

চতুরঙ্গ

৪৫ বর্ষ ষষ্ঠ সংখ্যা
অক্টোবর ১৯৮৪

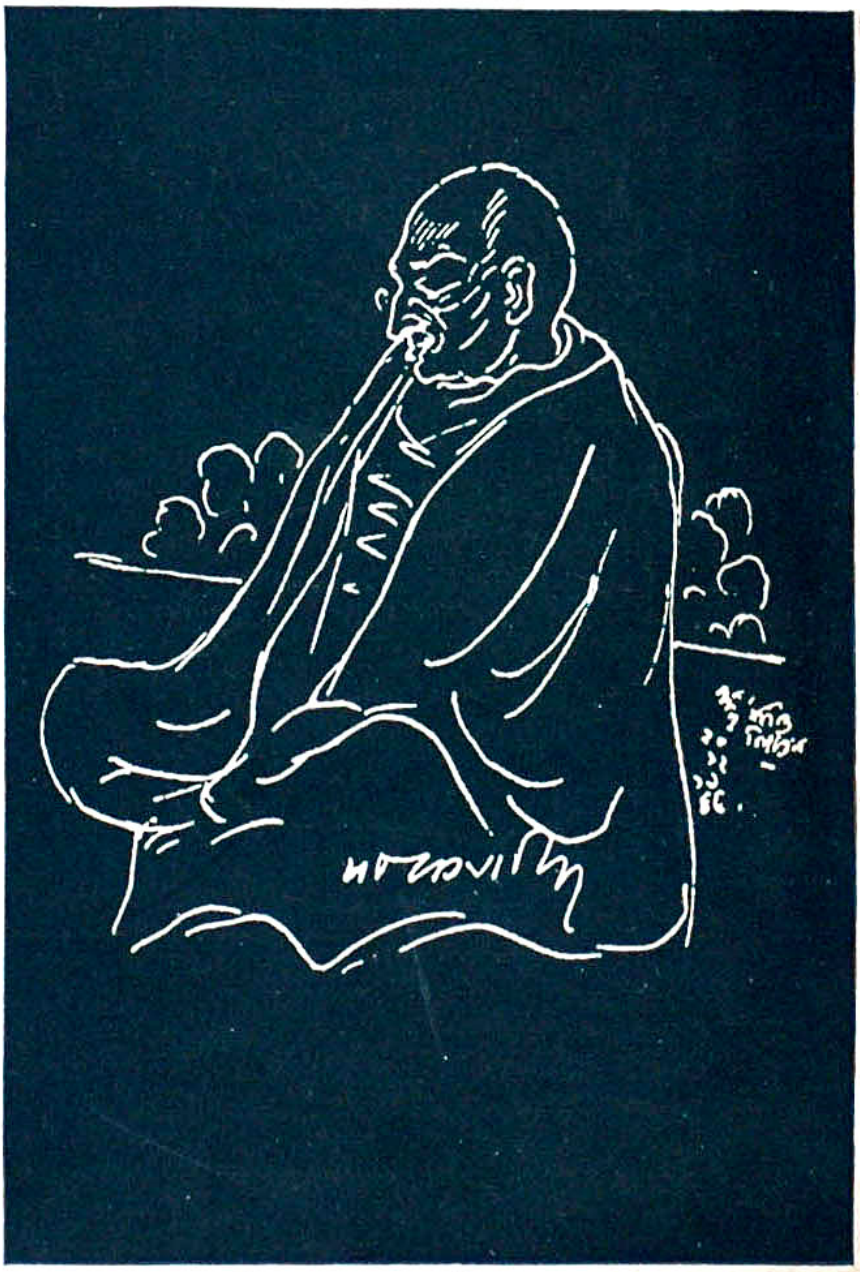

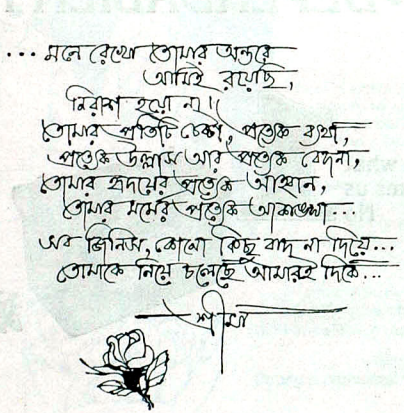

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
৯৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

বর্ষ ৪৫। সংখ্যা ৬
অক্টোবর ১৯৮৪
আশ্বিন-কার্তিক ১৩৯১

বাঙলা-সাধক আবদুল হাই অমলেন্দু বসু ৪৬৪
বস্তুরহস্য এবং জীবনদর্শন অসীম রায় ৪৯২

স্মরণে গোলাপ কমলকুমার মজুমদার ৪৬৩
ইনসমনিয়া খোন্দকার আশরাফ হোসেন ৪৭৫
ধাত্রী দিবেন্দু পালিত ৪৭৬
প্রিয়সখি, মিথ্যা বলেছিলে কৃষ্ণ ধরে ৪৭৭
অন্ধ চিৎকার ইকবাল আজিজ ৪৭৮

ক্লান্তদর্শী অন্নদাশঙ্কর রায় ৪৬৮
চোলগোবিন্দ-র আত্মদর্শন সুভাষ মুখোপাধ্যায় ৪৭৯
মেওয়া ও কিতাবসকল অমিয়ভূষণ মজুমদার ৪৮৩
শহর সংকরণ শংকর বসু ৫০১
জাহাজী গল্প অমৃতময় মুখোপাধ্যায় ৫০৯

গ্রন্থসমালোচনা ৫১৭
জগদীশ ভট্টাচার্য, কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, অসীম রায়, চিত্তব্রত পালিত, জ্যোতির্ময় গুপ্ত

আলোচনা ৫২৯
ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন ঘোষ, রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত

প্রচ্ছদচিত্র। নন্দলাল বসু : প্রার্থনারত গান্ধীজী
(বিশ্বভারতী কোয়ার্টারলির সৌজন্যে)
মুখপাতের চিত্র। বিকাশ ভট্টাচার্য

শিল্পপরিকল্পনা রনেনআয়ন দত্ত

প্রধান সম্পাদক। রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত

বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য কর্তৃক সম্পাদিত, শ্রীমতী নীরা রহমান কর্তৃক নবজীবন প্রেস, ৬৬ গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ থেকে অন্তরঙ্গ প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে মুদ্রিত ও ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত। ফোন : ২৭-৬৩২৭

নানা স্বাদের নানা রসের বই

অশোক মিত্র ॥ ছবি কাকে বলে ৩০·০০
সুশোভন সরকার ॥ প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথ ১০·০০
সুকুমার সেন ॥ দিনের পরে দিন যে গেল ৩০·০০
লোকেশ্বর বসু ॥ আমাদের পদবীর ইতিহাস ১০·০০
সত্যজিৎ রায় ॥ বিষয় চলচ্চিত্র ১২·০০
সন্তোষকুমার ঘোষ ॥ রবির কর ৮·০০
সৌরীন্দ্র মিত্র ॥ খ্যাতি অখ্যাতির নেপথ্যে ৪০·০০
অতুল্য ঘোষ ॥ কণ্টকল্পিত ৩৫·০০
অশোক রুদ্র ॥ বিয়েবাড়ির বিভীষিকা ও অন্যান্য ১৫·০০
নীরদ মজুমদার ॥ পুনশ্চ পারী ৫০·০০
রবিশংকর ॥ রাগ অনুরাগ ৫০·০০
আলাউদ্দিন খাঁ ॥ আমার কথা ১০·০০
রানী চন্দ ॥ জেনানা ফাটক ১৬·০০
শিবকালী ভট্টাচার্য ॥ চিরঞ্জীব বনৌষধি ১—৬ খণ্ড, প্রতি খণ্ড ৩০·০০
শান্তিদেব ঘোষ ॥ রবীন্দ্রসংগীতবিচিত্রা ২০·০০
চিত্রা দেব ॥ অন্তঃপুরের আত্মকথা ২৫·০০
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ॥ রাশিয়া ভ্রমণ ২০·০০
লীলা মজুমদার ॥ খেরোর খাতা ১৫·০০

সম্পূর্ণ পুস্তকতালিকার জন্য লিখুন

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ। ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন ॥ কলকাতা ৭০০ ০০৯ ॥

সন্তুর দিদিমার স্মরণে। বিকাশ ভট্টাচার্য

স্মরণে গোলাপ

কমলকুমার মজুমদার

স্মরণে গোলাপ, শূন্যতারে বন্দী করে বসে, পুণ্য ধন্য নাম গোলাপের—সুচিরাৎ
চ-লাখ লক্ষ বেদনা আজ ভাগ, ভাঙা, দ্বিধা—আসা-যাওয়া আলোক ও ছায়ায়
নমস্কার, নমস্কার।
কাঁচের আওয়াজগুলো, কাঁচের ভাসেতে গিয়ে থামে, রেশ বাজে হিম বেহালায়
সে যে কি তাহা জাগিয়া উঠে চলে...যাও

এত দীর্ঘ বিঘ্নবতী সাগরের ঝড় বাসা দাও, হানা দেয় ; হাই! যেথা...ব্যোমেতে খেচর...
অহো ডানাদ্বো লাল হয়ে উবালো বাস্তব, কপোতী চুম্বন যাচে টম্বুর আবেগে—
অক্ষয় সেকাল... !
নিরেট-উলঙ্গ যদি লাবণ্য দুস্তর ইদানীং লবণাক্ত হ্রদ হল পার, শূন্য-তারকায়ে পথ মাগে
গুরো দৃষ্টিতে তোমার হেরী হাজার দেওয়ালী...

'নু-অক্ষি নু-দৃষ্টি, নু-দৃশ্য কিংমায়াবা' পাটপ্রশ্ন হয়ে থাক প্রেমিকার রাত্র অপেক্ষায়
তবু তবু, মধ্যম নক্তমে, আমি বেঁচে আছি দূরত্বের রহস্যের নিঃস্ব ডোল জুড়ে...
আপনার আড়পারে।
মরণের পরে সুতরাং, আমি ভাসি নাই ডুবে আছি লোকোত্তর আদিম আঁতুড়ে
সত্য ধন্য নাম কি প্রেমের?

জলের বুদ্বুদগুলি, নিরালা সরণী বহি কাঁচের আওয়াজে গিয়ে থামে—
সেজদানের তুলিকায়, নামহারা জীবনের (বাস্তবের) কোন মোক্ষ নামে।

বাঙলা-সাধক আবদুল হাই

অমলেন্দু বসু

আজ থেকে পনেরো বছর পূর্বে, ১৯৬৯ সালের ৩রা জুন পূর্ব-বাঙলার (আজকালকার বাংলাদেশের) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগের শিক্ষকপ্রধান মুহম্মদ আবদুল হাই পরলোক গমন করেন। তিনি ঢাকা শহরের নিকটবর্তী খিলগাঁও-নামক গ্রামে রেলস্টেশনে চলন্ত রেলগাড়ির চাকায় কাটা পড়েন। এ-দুর্ঘটনার সম্পূর্ণ তথ্য আমি তখন জানি নি, আজও জানি না ; বস্তুত, জানবার আগ্রহ বোধ করি না। আবদুল হাই চলে গেছেন—এটাই শোকক্লেশদায়ক অবিস্মরণীয় কথা। একদা আবদুল হাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ ক্লাশে আমার ছাত্র ছিলেন ; পরে তিনি যখন লনডন বিশ্ব-বিদ্যালয়ে গবেষণা করতেন সে সময় আমিও কয়েক সপ্তাহ সেই মহানগরীতে কাটিয়েছিলাম ; এবং আমাদের স্বদেশে ফেরার পরে দুজনের মধ্যে প্রায়ই পত্র-ব্যবহার চলত। আবদুল হাই যে চলে গেলেন পরলোকে, তাঁর সঙ্গে যে আমার ইহজগতে আর-কোনো সংযোগ থাকবে না, এই তথ্যের অসহনীয় আঘাত আমাকে মেনে নিতে হচ্ছে। তবু এই আঘাতবোধের সঙ্গে জড়িয়ে আছে আমার চেতনা যে, আবদুল হাই ছিলেন আমাদের মাতৃভাষার এক মহৎ সাধক। আমার বিশ্বাস, বাঙলা-অনুরাগী ব্যক্তি যেখানেই বাস করেন—যে প্রদেশে বা রাজ্যে—হাইসাহেবের দান সেখানেই সশ্রদ্ধভাবে আলোচিত হওয়া আবশ্যক।

আমাদের দেশে বাঙলা-ভাষা এবং সাহিত্য-চর্চার একটা স্বর্ণযুগ গেছে যখন কয়েকজন মহারথীর একনিষ্ঠ সাধনার ফলে ভাষার এবং সাহিত্যের ইতিহাস, প্রকৃতি তথা মূল্য সম্বন্ধে আমাদের তথ্যজ্ঞান এবং ধারণা কাঠামো অর্জন করেছে। তারপর যেন কিছুকাল একটা স্থবিরতায় ভুগেছে আমাদের অনুসন্ধান আর গবেষণা। দেশবিভাগের ফলে নূতন উৎসাহে বাঙলা-ভাষা এবং সাহিত্য-চর্চার কিছু দায়িত্ব গ্রহণ করলেন পূর্ববঙ্গের, বিশেষত ঢাকার আর চট্টগ্রামের, জনকয়েক পণ্ডিত। যে উদ্দীপনা এই প্রসঙ্গে প্রকাশিত হল তার মূল প্রকাশ নয় সৃজনী সাহিত্যের নবত্বে, তার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বাক্-শিল্পের (অর্থাৎ সাহিত্যের) গুণবিশ্লেষণে এবং মূল্যায়নে। এদেশে কোনো কোনো সাহিত্যরসিক কিছু আত্ম-কেন্দ্রিক, ভারিক্কি চালের অভিমত বিকিরণে সন্তুষ্ট থেকেছেন। কিছু সমালোচক কান্ট বা ক্রোচে হতে চেয়েছেন, নিদেনপক্ষে লী হানট অথবা এমারসন হতে চেয়েছেন, কিন্তু আরিস্টটল বা কুন্তক বা কোলরিজ এবং ব্র্যাডলির মতো তথ্য-ও যুক্তি-ভিত্তিক মূল্যায়নে প্রবৃত্ত হতে চান না, চাইলেও প্রবৃত্ত হবার অন্তঃশক্তি তাঁদের নেই।

শিল্পমূল্যায়নের যে তথ্যসমৃদ্ধ ভিত্তি প্রয়োজন এই অন্তঃশক্তি অর্জনের জন্য, সেই ভিত্তি হাইসাহেব গড়ে তুলেছিলেন দুই উপায়ে। একদিকে আধুনিকতম ভাষা-তাত্ত্বিক পদ্ধতিতে বাঙলা ভাষার নানা আলোচনা করে, অন্যদিকে বাঙলা সাহিত্যের অনেক অনুদ্‌ঘাটিত তথ্য প্রকট করে। আবদুল হাই তাঁর ভাষাতাত্ত্বিক উৎসাহ পেয়েছিলেন কোন উৎস থেকে তা আমি জানি না, তবে খুব সম্ভবত এ বিষয়ে তাঁর স্বয়ংজাত প্রতিভার সঙ্গে মিশেছিল দু-চারজন পূর্বগামী বাঙালি ভাষাবিদের কাছ থেকে পাওয়া উদ্দীপনা : সর্বাগ্রে নাম করতে হয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের, পরে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের, হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর, সুনীতি চাটুজ্জের এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফরাসি-শিক্ষিত শহীদুল্লাহ্ সাহেবের। আবদুল হাই লনডনে ল্যাবরেটরিতে আধুনিক ভাষাশাস্ত্রের প্রকরণ শিক্ষা করেছিলেন অধ্যাপক ফারথের কাছে। অধ্যাপক ফারথ প্রাচীন ভারতীয় ভাষাশাস্ত্রীদের সম্বন্ধে গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করতেন, বিশেষত পাণিনি সম্বন্ধে। আবদুল হাই যে বিশেষ কাজ করেছিলেন অধ্যাপক ফারথের নির্দেশে সে কাজটি সম্পর্কে হাই নিজেই বলেছেন : "আমার এ গ্রন্থটিকে বাংলা ভাষায় চলিত (স্ট্যানডার্ড কলকিয়াল) উপভাষার বর্ণনা হিসেবেই গ্রহণ করা যেতে পারে।" আবদুল হাই তাঁর থিসিসের যে সংস্করণটি দেশে ফিরে এসে প্রকাশ করেন, সেই গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি বলেছেন :

"ভাষার আলোচনা—তা যে কোনো উপভাষারই হোক না কেন—অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। কারণ, একটি উপভাষার আলোচনা হলেও তাতে ভাষামাত্রেরই প্রধান বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়। একটি উপভাষার তথ্য ভাষা-মহাসমুদ্রের কোথায় যে সূচনা এবং কোথায় যে শেষ, তার আবিষ্কার সহজসাধ্য নয়। সেজন্য একালের ডেসক্রিপ-টিভ লিঙ্গুইসটিকস বা বর্ণনাত্মক ভাষাবিজ্ঞানের ভাষা-তাত্ত্বিকেরা ধ্বনিবিজ্ঞান (ফোনেটিকস), ধ্বনিতত্ত্ব (ফোনোলজি), ব্যাকরণ (গ্রামার) এবং বাগর্থ-বিজ্ঞান (সেমানটিকস) প্রভৃতি কয়েকটি শাখায় ভাষার বর্ণনাত্মক বিজ্ঞানকে বিভক্ত করে থাকেন। একটি ভাষার সামগ্রিক রূপের পরিচয় দেবার জন্যে এ-ভাগগুলো ভাষাতাত্ত্বিক-দেরই নিজস্ব সৃষ্টি। এদের যে-কোনো একটির সাহায্যে একটি ভাষার পূর্ণ বিবরণ দেওয়া যায় না ; তার জন্যে প্রয়োজন হয় পৃথকভাবে পরস্পরসম্বিত এই ভাগ-গুলোর সব কয়টির পৃথক প্রয়োগ।" এই সঙ্গে আবদুল হাই সাহেব তাঁর ভূমিকাতে পাঠকের জন্য আরো কিছু তথ্য প্রকাশ করেছেন :

"আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান সম্পর্কে লনডন বিশ্ববিদ্যা-লয়ে গবেষণা ও পড়াশোনা করে ১৯৫৩ সালে আমি যখন দেশে ফিরি, তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এ-পথে একমাত্র যাত্রী ছিলাম আমি। কয়েক বছর যেতে না যেতে আমার সহকেজন ছাত্র ও সহকর্মীকে এ-সাধনার ব্রতী হবার প্রেরণা যোগাই।*** পাক-ভারত উপমহাদেশে যাস্ক, পাণিনি ও পতঞ্জলি প্রমুখ ধ্বনিবিদই ধ্বনি-বিজ্ঞানের উদ্গাতা ছিলেন। আড়াই হাজার থেকে তিন হাজার বছর পূর্বে তাঁরা সংস্কৃত ভাষায় চুলচেরা বিশ্লেষণ করেছিলেন। এঁদের মধ্যে পাণিনিই ছিলেন শ্রেষ্ঠ। তাঁর মতো এত বড়ো ধ্বনিবিদ পৃথিবীতে আজও কেউ জন্মগ্রহণ করেছেন কিনা সন্দেহ। আমেরিকার শ্রেষ্ঠ ভাষাতত্ত্ববিদ ব্লুমফিল্ডের মতে, পাণিনির ব্যাকরণ 'অষ্টাধ্যায়ী' মানুষের বুদ্ধিমত্তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।"

আবদুল হাই সাহেব লনডনে গিয়ে গবেষণা করেন অধ্যাপক ফারথের সঙ্গে, এবং ফারথ ছিলেন সুবিখ্যাত ডেনিয়েল জোনস-এর পরবর্তী অধ্যাপক। অধ্যাপক ফারথের সঙ্গে এবং এডিনবরার অধ্যাপক এবারক্রমবির সঙ্গে আমি ১৯৬৪ সালে এক সপ্তাহ কাটিয়ে জানতে পেরেছিলাম হাই কত বড়ো পণ্ডিত ছিলেন। আবদুল হাইয়ের আলোচ্য বিষয় ছিল (অতীব মৌলিক এবং মূল্যবান বিষয়) বাঙলা ভাষার (অন্যান্য আরো কোনো কোনো ভাষার মতো, যথা ফরাসি) সানুনাসিক ধ্বনির বিশ্লেষণ। আমাদের ভাষায় দুটি ন-ধ্বনি ছাড়াও চন্দ্রবিন্দু এবং অনুস্বারের প্রয়োগ আছে। পূর্ববঙ্গের উচ্চারণে অনেক সময় চন্দ্রবিন্দু-ধ্বনি প্রযুক্ত হয় না। যেমন 'তাঁর' উচ্চারিত হয় 'তার', 'সাঁতার' উচ্চারিত হয় 'সাতার'। আবার পশ্চিমবঙ্গেও অনেক অহেতুক সানু-নাসিক ধ্বনি প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয় প্রাকৃত উচ্চারণে।

অবশ্য, আসল কথাটি হচ্ছে যে, বানান থেকে শুরু করে উচ্চারিত ধ্বনি সাব্যস্ত হয় না, উচ্চারণের পথ অনুসরণ করে বানান স্থির হয়। আবদুল হাইয়ের লনডনস্থ গবেষণার বিষয় ছিল ন্যাজালস অ্যান্ড ন্যাজালাইজেশন ইন বেঙ্গালি। এটি একটি অতীব টেকনিকাল কাজ। আবদুল হাই পরে স্ব-সম্পাদিত 'সাহিত্যপত্র' পত্রিকায় বাঙলা ধ্বনি (ব্যঞ্জনধ্বনি) নিয়ে মহার্ঘ প্রবন্ধমালা রচনা করেন। তাঁর 'বাঙলা ধ্বনিবিজ্ঞান' আমাদের ভাষায় অভূতপূর্ব গ্রন্থ, আমার মনে হয় না আগামী এক শতক কালেও এই গ্রন্থ কোনোক্রমে ম্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা আছে।

আবদুল হাইয়ের ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনা সর্বজনবোধ্য বিষয় নয়, কিন্তু তাঁর সাহিত্যালোচনা নিশ্চয় সর্বজনশ্রদ্ধেয়। বাঙলা ভাষায় এবং সাহিত্যে মুসলমানদের দান যদিও দীনেশচন্দ্র সেন, সুকুমার সেন প্রমুখ মনীষীদের কাছে আদৌ অজ্ঞাত অথবা অবজ্ঞাত ছিল না, তবুও এই বহুবিস্তৃত বিষয়টি সম্বন্ধে অনেক তথ্যই ছিল অস্পষ্ট, কিছু ছিল সম্পূর্ণ অনুদ্‌ঘাটিত এবং সর্বোপরি এই শ্রেণীর রচনাকে সমগ্র বাঙালি জাতির সাহিত্যসাধনার পরিপ্রেক্ষিতে দেখা হত না। এই মুসলিম-রচিত সাহিত্যকে বলা হত 'দোভাষী' সাহিত্য। এই সাহিত্যে প্রচুর আরবি, ফারসি শব্দ ব্যবহৃত হত, যে মিশেল রচনাকে ভারতচন্দ্র বলেছিলেন 'যাবনী মিশাল'। আমার বাল্যকালে দেখেছি—ঢাকা শহরে বুড়িগঙ্গার তীরে সন্ধ্যাকালে অসংখ্য নৌকো বাঁধা থাকত, মাঝিমাল্লারা একটা বড়ো নৌকোর উপরে গোল হয়ে বসে তাঁদের একজনের সুরেলা কাব্যপাঠ শুনতেন। সেই কাব্যই ছিল মুসলমানি কিস্‌সা, সেই সাহিত্যকেই বলা হত দোভাষি সাহিত্য। আমার বাল্যকালেও দেখেছি এই সাহিত্য ছিল নিতান্ত অনাদৃত, অথচ এই অনাদর আসত সর্বশ্রেণীর লেখাপড়া-জানা সম্ভ্রান্তবংশীয় লোকের কাছ থেকেই, বংশে তারা মুসলমান হোক, অথবা হিন্দুই হোক। এই দোভাষি সাহিত্যশ্রেণী নিয়ে, সাহিত্যের এই বিশেষ ক্যাটিগরি নিয়ে কোনো আলোচনাই হত না, অথচ এই তো আসল জনসাহিত্য (লোকসাহিত্য বলছি না, কারণ লোকসাহিত্য কথাটি অ্যানথ্রোপলজি শাস্ত্রে প্রযুক্ত একটি বিশেষার্থব্যঞ্জক শব্দ)। আবদুল হাই 'বাঙলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে প্রথম এই অবনত স্তরের রচনাকে বাঙলা সাহিত্যের অঙ্গ হিসাবে মর্যাদা দেন। এই মর্যাদাদান আবদুল হাইয়ের নামকে তুলেছে বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসের এক উচ্চ চূড়ায়।

আবদুল হাই সাহেবের অনুপ্রেরণায় জনসাহিত্যের এই মর্যাদা নিয়ে কিছু আলোচনা হয়েছে। কিছুকাল পূর্বে একখানা মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল : 'দি ইমারজেনস অ্যান্ড ডেভলাপমেনট অব দোভাষি লিটারেচার'। লেখক ড. কাজী আবদুল মান্নান। এটি একটি গবেষণাগ্রন্থ। বাঙলা ভাষা এবং সাহিত্য তো কোনো বিশেষ ধর্ম বা সম্প্রদায় বা কৌমের একক আত্মপ্রকাশ নয়, বস্তুত বাঙালি সংস্কৃতি অতীব আশ্চর্য রকমের মিশ্রসংস্কৃতি। বাঙলা ভাষা এবং সাহিত্য বাঙালির সমবেত সৃষ্টি। নগরবাসী ও গ্রামবাসী, পণ্ডিত ও প্রাকৃতজন, ধনী নির্ধন—সকলেই এই ভাষার এবং সাহিত্যের সেবা করেছেন, করছেন। অতএব মেহনতি শ্রেণীর বাঙালিদের (তাঁরা যদি গরিষ্ঠ সংখ্যার মুসলমানও হয়ে থাকেন) সাহিত্যকে তার আপাত-শিল্পহীনতার কারণে অবজ্ঞা করা সর্বতোভাবে ভুল, এবং জাতীয় সংস্কৃতির পক্ষে হানিকর। পাকিস্তান হওয়ার পরে স্বভাবতই পূর্ববঙ্গীয় মুসলমানেরা চেষ্টা করলেন নিজ সম্প্রদায়ের বিশেষ শিকড় অনুসন্ধান করতে। শুধু এই ক্ষণকালীন মনস্তাত্ত্বিক কারণেই মুসলিম পাঠক মুসলিমরচিত সাহিত্যকে অত্যুৎসাহিত মূল্য দিতে পারেন, আবার হিন্দু পাঠক মুসলিমরচিত কাব্যকে অবজ্ঞা করে হিন্দুরচিত কাব্যকে আকাশে তুলতে পারেন। এমন ধরনের সংকীর্ণতা বিদেশের সাহিত্য-ইতিহাসে, বিশেষত ইউরোপে, আদৌ বিরল ছিল না।

আবদুল হাই সাহেবের নির্মল বুদ্ধিতে এবং জ্ঞানে এহেন সংকীর্ণতার কিছুমাত্র লক্ষণ আমি দেখতে পাই না তাঁর রচনায়। যেখানে প্রশংসা প্রাপ্য সেখানে তিনি প্রশংসা দিয়েছেন, যেখানে রচনা নিকৃষ্ট সেখানে ত্রুটির নির্দেশ করেছেন। আবদুল হাই আর তাঁর সহকর্মীরা বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস-বিচারে সুন্দর ভারসাম্য অবলম্বন করেছেন। আবদুল হাই বহুমেধাসম্পন্ন সাহিত্যরসিক ছিলেন। তিনি ঢাকা থেকে প্রকাশিত বাঙলা অভিধানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। একটি চমৎকার সেমিনার পরিচালনা করেছিলেন, সেমিনারের নাম দিয়েছিলেন 'ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ'। এই সেমিনারে জনসাধারণকে এই ধারণা দেওয়া হয়—বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের বিবর্তনের গতি কিভাবে এগিয়েছে। এ ছাড়া ইউনেসকোর পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি 'ট্র্যাডিশনাল কালচার ইন ঈস্ট পাকিস্তান' নামক সংকলন-গ্রন্থে বঙ্গের লোকনৃত্য, লোকসংগীত, লোকশিল্প, হাতের কাজ, দেশীয় খেলাধুলো প্রভৃতি সম্বন্ধে তথ্য আর চিত্র সংগ্রহ করেছেন।

আবদুল হাই সাহেবের বহুমুখী সাহিত্যসাধনা এই অসম্পূর্ণ, সংক্ষিপ্ত বিবরণ থেকেও অংশত প্রমাণিত হবে।

ক্রান্তদর্শী

বারো

অন্নদাশঙ্কর রায়

পরের দিন বিদায় নেবার সময় মানস বলে স্বপনদাকে, "তোমার বাড়িতে বসে তোমাকেই আমি কাল যা-তা বলে অপমান করেছি। ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। ক্ষমা যদি কর তো নিজগুণেই করবে।"

"দূর পাগলা! তোমার সঙ্গে আমার যে সম্পর্ক তাতে মান-অপমানের প্রশ্নই ওঠে না। তুমি এমন কী বলেছ যে আমার মানহানি হবে? তোমার বউদি তো বলেন আমি একজন প্রচ্ছন্ন ইংরেজ আর প্রচ্ছন্ন মুসলমান। হা হা হা! হাসব না কাঁদব! আরে বাবা, যাদের সঙ্গে দুশো বছর একসঙ্গে কাটিয়েছি তাদের কি কেবল ঘৃণাই করেছি, ভালোবাসি নি? তারাও কি কেবল ঘৃণাই করেছে, ভালোবাসে নি? তেমনি, যাদের সঙ্গে সাতশো বছর একসঙ্গে কাটিয়েছি তাদের কি কেবল ঘৃণাই করেছি, ভালোবাসি নি? তারাও কি কেবল ঘৃণাই করেছে, ভালোবাসে নি? তুমি আমি রাজনীতির লোক নই, আমরা সাহিত্যিক। অর্থসত্য নিয়ে আমাদের কারবার নয়। আমরা পূর্ণসত্যের পূজারী। পূর্ণসত্যটা এই যে ইংরেজদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কটা শুধুমাত্র শাসক-শাসিতের নয়। কিংবা শুধুমাত্র শোষক-শোষিতের নয়। ওরা এদেশ থেকে মহাপ্রস্থান করলেও একই পৃথিবীতে বাস করবে। ওদের সঙ্গে মিত্রসম্পর্ক আত্মীয়সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। ঘৃণার চেয়ে বলবান হবে প্রেম। প্রেমই ওদের আপন করবে। আপন করবে আমাদেরও। আমি যদি সুদীর্ঘ অতীতের চেয়ে সুদীর্ঘতর ভবিষ্যতের কথা ভেবে কাজ করি তবে আমি একজন প্রচ্ছন্ন ইংরেজ হই নে, হই একজন প্রকৃত ভারতীয়। একই কথা খাটে মুসলমানদের বেলাও। ওরাও ভাবগতিক দেখে মহাপ্রস্থানের তালে আছে। কিন্তু আরবে ইরানে মধ্য এশিয়ায় নয়। ভারতেরই একটা ভাগ কেটে নিয়ে ভাগটাকে আস্ত একটা রাষ্ট্রের আকার দিয়ে সেই আজব-স্থানে। যার আনকোরা নাম পাকিস্তান। আদমের পাঁজরের হাড় থেকে হাওয়ার সৃষ্টি। খ্রীস্টানরা যাকে বলে ঈভ।

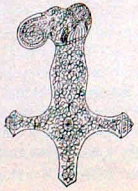

"আমাদের পাঁজরের একখানা হাড় কেটে নিলে আমাদের কন্ট হবে বইকি। আদমেরও হয়েছিল। কিন্তু পরে তার থেকেই তো আসে মধুর রস। এবারেও তাই হবে। ওরাও আমাদের আপন হবে, আমরাও ওদের আপন। কেউ কাউকে ছেড়ে বাঁচতে পারবে না। তবে একটু-আধটু ফ্লার্ট করবে বইকি পরনারী বা পরপুরুষের সঙ্গে। এক যেখানেই দুই হয়েছে সেখানেই এই রঙ্গ। আর এইজন্যেই তো স্বাধীনতা। আমরা কেন ধরে নেব যে পাকিস্তান হিন্দুস্থানের চিরশত্রু হবে? না, হিন্দুস্থান নামটা আমি পছন্দ করি নে। ইন্ডিয়া কী দোষ করল? ভারতের কী দোষ? বিনা দোষে ওদের তালাক দিতে নেই।"

মানস আশ্চর্য হয়। "বাঙলাদেশ তাহলে পাকিস্তানে যাচ্ছে? তুমিও যাচ্ছ সেই সুবাদে? ভারতের হয়ে কথা বলার এক্তার তো তোমার নয়।"

"না, না, বাঙলাদেশ পাকিস্তানে না যেতেও পারে। সে একাই একটা স্বাধীন রাষ্ট্র হতে পারে। এই অপশনটা তাকে দিতে হবে। আমরা বাঙালিরা হচ্ছি ভারতবর্ষের ফরাসি। ফ্রান্স যেমন অবিভাজ্য, বাঙলাদেশও তেমনি। বিপ্লব আমাদের রক্তে। হিন্দু-মুসলমানের লড়াই আমাদের বিপ্লব ভুলিয়ে দেবে। কলকাতা আমাদের প্যারিস। এখানেও যদি ওখানকার মতো ধর্মের জন্যে সেন্ট বার্থলোমিউজ্ ডে ম্যাসাকার হয় তবে সব মাটি। বাঙলাদেশও ভাগ হয়ে যাবে।" স্বপনদা অন্য দু-এক কথার পর বলেন, "Au revoir!" পুনর্দর্শনায়চ।

ট্রেনের কামরায় মানসরা চারজন ছাড়া আর কেউ ছিল না। গুছিয়ে বসে যূথিকা সুধায় মানসকে, "তোমাকে অমন মনমরা দেখাচ্ছে কেন! পুব বাঙলায় ফিরতে তুমি চাও নি, তবু যেতে হচ্ছে। এইজন্যেই কি?"

"না, জুঁই। তা নয়। পশ্চিম বাঙলার চেয়ে পুব বাঙলাই আমি পছন্দ করি। কিন্তু এই ছ বছরে একটা ব্রেক হয়ে গেছে। জোড় মেলাতে সময় লাগবে। সেসব পরের কথা। যা নিয়ে আমি চিন্তিত তা স্বপনদার সঙ্গেও আমার ব্রেক ঠিক নয়, তবে পায়ে পা মিলছে না।"

"তাই নাকি? ব্যাপার কী!" যূথিকা বিচলিত হয়।

"স্বপনদা হাল ছেড়ে দিয়ে বসে আছেন। যা হবার তা হবেই। কেউ ঠেকাতে পারবে না। আর আমি যদি মনে করি সেটা ভুল পদক্ষেপ আমার তো কর্তব্য সেটা নিবারণ করা। তা না করলে পরের পদক্ষেপগুলোও ভুল পদক্ষেপ হবে। তখন নিবারণ করা আরো কঠিন হবে। স্বপনদার কী? ঐতিহাসিক নিয়তি বা গ্রীক ট্র্যাজেডি বলেই তিনি সব সহ্য করবেন। আর আমি ইমপোটেন্ট হয়ে ছটফট করব। আমাদের দুই বন্ধুর সম্পর্কে চিড় ধরেছে, জুঁই।"

"কিন্তু ব্যাপারটা কী? খুলে বলছ না কেন?" যূথিকা কৌতূহলী হয়।

"আহা, ধৈর্য ধরো। ব্যাপারটা সংক্ষেপে এই যে, ইংরেজরা চলে গেলে ভারত কি আস্ত থাকবে, না ভাগ হয়ে যাবে? স্বপনদা ধরে নিয়েছেন যে দেশটা ভাগ হয়ে যাবে, সেটাই নাকি ভারতের নিয়তি। কিন্তু বাঙলাদেশের বেলা আরো একটা অপশন আছে। বাঙলাদেশ হতে পারে তৃতীয় এক স্বাধীন রাষ্ট্র। কারণ আমরাই এদেশের ফরাসি, ফ্রান্সের মতো বাঙলাদেশ অবিভাজ্য। আর বিপ্লব নাকি আমাদের রক্তে। তবে তিনি আশঙ্কা করেন যে কলকাতায় যদি প্যারিসের মতো সেন্ট বার্থলোমিউজ্ ডে পুনরভিনীত হয় তা হলে বাঙলাদেশও ভাগ হয়ে যাবে।" মানস শঙ্কিত স্বরে বলে।

"বটে। কিন্তু ওই যে কী ডে বললে, ওটাতে কী হয়েছিল? আমার ইতিহাসের জ্ঞান তোমার মতো ব্যাপক নয়।" যূথিকা জিজ্ঞাসু।

"ফরাসিদের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় রক্তাক্ত দিবস। তারিখটা ১৫৭২ সালের ২৪শে অগস্ট। রাজমাতার প্ররোচনায় রাজার আদেশে সেই রাত্রে যে নিধনপর্ব শুরু হয় তা দিনের পর দিন কয়েকদিন ধরে চলে আর প্যারিসের বাইরেও ছড়িয়ে পড়ে। শত শত প্রোটেস্টান্ট নিহত হয়।" মানস বর্ণনা করে।

যূথিকা শিউরে ওঠে। "ও প্রসঙ্গ থাক। বাচ্চারা এখনো ঘুমোয় নি। রাত্রে দুঃস্বপ্ন দেখবে।" সে অন্য প্রসঙ্গ পাড়ে।

"শোনো, কাল কেমন মজা হল। আমরা পাঁচজনে বসে একটা নতুন খেলা উদ্ভাবন করলুম। খেলাটার নাম কোণঠাসা। পাঁচজনের তিনজন জেলফেরতা—বাবলী আর মিলি আর জুলি। বউদি আর আমি কোণঠাসা। পাঁচজনের তিনজন বিলেতফেরতা—বউদি আর জুলি আর মিলি। বাবলী আর আমি কোণঠাসা। পাঁচজনের চারজন বিবাহিতা—বউদি আর মিলি আর জুলি আর আমি। বাবলী কোণঠাসা। পাঁচজনের দুজন মা হয়েছে—মিলি আর আমি। আমরাই কোণঠাসা। পাঁচজনের একজন দুবার মা হয়েছে—আমি। আমিই কোণঠাসা। অনারস

ভাগ করে নিই বাবলী আর আমি। এ তোমার দেশভাগ প্রদেশভাগের চেয়ে ভালো খেলা।"

দীপক আর মণি ঘুমিয়ে পড়েছে অনুমান করে যূথিকাই আবার কথাবার্তার খেই হাতে নেয়। "তোমরা ভারতবর্ষের ফরাসিও নও, ইংরেজও নয়, তোমরা ভারত-বর্ষের পোল।"

উপরের বার্থ থেকে দীপক বলে ওঠে, "নর্থ পোল না সাউথ পোল?"

"না, বাবা। পোল মানে এখানে পোলান্ডের লোক। যেমন মাদাম কুরি। যেমন শোপ্যাঁ।" যূথিকা তার পিয়ানোর শোপ্যাঁ বাজিয়ে শুনিয়েছে।

"মাদাম কুরি তো রেডিয়াম আবিষ্কার করেছিলেন। আমিও ভাবছি সেইরকম একটা কিছু আবিষ্কার করব।" দীপক ইতিমধ্যে ভাবুক হয়েছে।

"আগে তো বড়ো হও, তার পরে ও কথা ভাববে।" যূথিকা আশ্বাস দেয়।

"ততদিনে সবাই সব কিছু আবিষ্কার করে থাকবে। আমার জন্যে কিছু বাকি থাকলে তো?" দীপক শুষ্ক-কণ্ঠে বলে।

মানস তা শুনে গুরুদেবের কবিতা আওড়ায়, "ভয় নাই, ওরে ভয় নাই তোর, কিছু নাহি তোর ভাবনা। নিঃশেষ হয়ে যাবি যবে তুই ফাগুনে তখনো যাবে না।"

দীপক ঠাণ্ডা হলে যূথিকা আবার খেই ধরে, "তোমাদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ, অরবিন্দ, জগদীশ, অবনীন্দ্র হয়েছেন। পোলদের চেয়ে তোমরা কিসে কম? কিন্তু তাদের মতোই তোমরা আত্মকলহে জর্জর, তেমনি বিশ্লবপ্রেমিক। তাই তেমনি ভাগ্যহত। ওরা তোভাগা হয়ে যায়, ওদের দেশ ভাগ করে নেয় রাশিয়া, প্রাসিয়া আর অস্ট্রিয়া। আর তোমরা তো পলাশিতে যে রেকর্ড দেখালে সেটা বিশ্ব-রেকর্ড। একমুঠো ইংরেজের হাতে হেরে গিয়ে তিন-তিনটে প্রদেশ হারালে। সেটাও এক-রকম তোভাগা। পোলরা প্রায় দেড়শো বছর পরাধীন হয়ে কাটিয়ে দিল। তোমরাও তো দেড়শো বছর কাটালে, আর কদ্দিন কাটাবে কে জানে! স্বাধীন হলেও যে অবিভক্ত হবে তাও নয়। কেউ কেউ এখন থেকেই লর্ড কার্জনের সিদ্ধান্তে ফিরে যাবার কথা ভাবছেন। কিন্তু যতই চেষ্টা কর, ভারতের রাজধানী আর কলকাতায় ফিরবে না। যতদিন তোমরা ভারতের রাজধানীর লোক ছিলে তত-দিন রাজনীতিক্ষেত্রেও তোমাদের নেতৃত্ব ছিল। সে নেতৃত্ব তোমরা বরাবরের মতো হারিয়েছ। একজন দেশবন্ধু কি একজন নেতাজী তার শূন্যস্থান পূরণ করতে পারেন না।"

মানস ঠেস দিয়ে বলে, "তুমি তো প্রায় আজন্ম দিল্লীওয়ালি। তোমার নিজের তো আমাদের মতো অব-নতি বা অধোগতি হয় নি।"

"ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে আমি আসতে চাই নি, তুমি যখন কথাটা তুলেছ তখন শোনো। দিল্লীতে বদলির বছর এগারো বারো পর্যন্ত বড়লাটের দিল্লীর বা সিমলার বাড়িতে যখনি বড়গোছের পার্টি হয়েছে আমার বাবাকেই তার তত্ত্বাবধান করতে হয়েছে। আর আমাকেও তিনি সেখানে সঙ্গে করে নিয়ে গেছেন। সেই সূত্রে বহু সাহেব মেম ও বিশিষ্ট ভারতীয় অতিথিদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। বার-বার দেখাসাক্ষাতের ফলে আলাপও হয়েছে। বার-বার আলাপের ফলে ঘনিষ্ঠতাও হয়েছে। এখনো যাঁরা বেঁচে আছেন তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য মিস্টার জিনা।"

উপর থেকে দীপক বলে ওঠে, "জিন্না।"

"না, বাবা। জিনা। সাহেবি উচ্চারণ। তুমি এখনো জেগে? যাও, ঘুমোবাবুর দেশে যাও। ওখানে খুব মজা।" যূথিকা তাড়া দেয়।

মানস উৎকর্ণ হয়ে শুনেছিল। আরো শুনতে চায়। যূথিকা শোনায়। "জিনার মধ্যে যে আত্মসম্মানবোধ দেখেছি তা আর কারো মধ্যে নয়। সাহেবদের সঙ্গে তিনি সমানে সাহেব। কারো চেয়ে খাটো নয়। বড়লাটের সঙ্গে তিনিও বড়লাট। নজরুলের ভাষায় বলতে হয়, চির উন্নত মম শির। শির নেহারি আমারি নতশির ওই শিখর হিমাদ্রির। দেখে আনন্দ হয় যে সরকারি বা আধা-সরকারি মহলে এমন একজন ইনডিয়ান আছেন যাঁকে লাটবেলাটরাও সমীহ করেন। গোখলেকে যখন দেখি তখন আমার বয়স বোধহয় পাঁচ। আবছা মনে পড়ে। সাহেব নন, দুর্ধর্ষ স্বদেশী। জিনার বৈশিষ্ট্য হল তিনি সাহেব হয়েও দুর্ধর্ষ। তাঁর চেয়ে আমার আরো ভালো লাগত মিসেস জিনাকে। তিনি কিন্তু মেমসাহেব ছিলেন না, ছিলেন আক্রমণশীল ভারতীয়। বড়লাটকে ছিলে নমস্কার করিয়ে নেন। বলেছি সে কাহিনী। যে কথা বলি নি তা শোনো। আমাকে দেখে তিনি এত খুশি হয়ে-ছিলেন যে বাবাকে জিজ্ঞাসা করেন, ইওর ডটার? বাবা

বলেন, ইয়েস মি লেডি। মাই ওনলি ডটার। যাঁদের স্বামীরা লর্ড বা নাইট নন তেমন কোনো মহিলাকেই বাবা মি লেডী বলতেন না। মিসেস জিনাই ব্যতিক্রম। বাবার বোধহয় বিশ্বাস ছিল যে মিস্টার জিনা শীগগিরই নাইট হতে যাচ্ছেন। ঠিক জানি নে, তবে জিনাকে বার-বার অতি উচ্চ পদ বা সম্মান অফার করা হয়েছিল। তিনি গ্রাহ্য করেন নি। সেটা কিন্তু তিনি অসহযোগী বলে নয়। তাঁর নীতি ছিল আমি আপনারে ছাড়া কারেও করি না কুর্নিশ। সম্রাট বা তাঁর প্রতিনিধির হাত থেকে কিছু নিলে তো নত হতে হয়। যাক, মিসেস জিনার কথাই হোক। সেদিন তিনি আমাকে দেখে বলেন, আমারও যদি এইরকম একটি মেয়ে হত! ঈশ্বর বোধহয় আড়ি পেতে শোনেন। তাঁর মনস্কামনা পূর্ণ করেন। সে কন্যারও নাকি নাম রাখা হয় জ্যাসমিন। তার মানে—"

উপর থেকে আওয়াজ আসে, "যূথিকা বা জুঁই।"

"দুষ্টু ছেলে! এখনো তুমি ঘুমবাবুর দেশে যাও নি।" মিষ্টি করে ধমক দেন তার মা। তারপর বলেন, "আহা বেচারি রতনপ্রিয়া! অকালে মারা যান। জিনার পারিবারিক জীবনে আর কী বাকি রইল! ওই জ্যাস-মিনই তাঁর নয়নের মণি। তাঁর জন্যে আমি বেদনা বোধ করি। কিন্তু বুঝতে পারি নে হাসব না কাঁদব যখন শুনি যে জ্যাসমিন তাঁকে না জানিয়ে বিয়ে করে চলে গেছে বিলেত। বর সার নেস্ ওয়াডিয়ার ছেলে নেভিল। নেভিল কিন্তু ডেভিল নয়। সে তার ধনকুবের পিতার উত্তরাধিকারী। হলে কী হবে, মুসলমান নয়, পারসি খ্রীস্টান। জান নিশ্চয়, জ্যাসমিনের মাও ছিলেন পারসি। রক্তেরও তো একটা টান আছে। আর বিয়ের বয়স হয়ে থাকলে মেয়ের কি স্বাধীন ইচ্ছা বলে কিছু নেই? জিনাকে বোঝায় কে? আগুন হয়ে বাপ বারে বারে দিলেন অভিশাপ। অবিকল আমার বাবার মতো। ভুলে গেলেন যে নিজেও রতনপ্রিয়াকে সার জাহাঙ্গির পেতিতের অমতে বিয়ে করে নিজের রেখেছিলেন। সেই-দিনই আমি উপলব্ধি করি যে জিনা আর সেই সেকুলার ইনডিয়ান বা প্রায় ইউরোপীয়ান নন, গোঁড়া মুসলমান-দের নেতা হতে গিয়ে তিনিও হয়ে উঠেছেন গোঁড়া মুসলমান। সেই জিনা কখনো দেশভাগের কথা কল্পনাও করতেন না। এই জিনা শাইলকের মতো ছুরি আস্ফালন করছেন। এক পাউন্ড মাংস কেটে নেবেন। যেমন দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ পুরুষ তাঁর দাবি তিনি আদায় করে নেবেনই।" যূথিকা সুনিশ্চিত।

মানস আত্মগতভাবে বলে, "তা হলে বাপু আর প্রাণে বাঁচবেন না। অনশনে দেহত্যাগ করবেন। তাতে যদি লীগপন্থীদের অন্তঃপরিবর্তন হয়।"

"বর্ণান্ধ ইংরেজ আর ধর্মান্ধ মুসলমান একই ধাতুতে গড়া। সে ধাতু ইস্পাত। তাদের অন্তঃপরিবর্তন ঘটানো মহাত্মারও সাধ্য নয়। গতবারের অনশনে তো লক্ষ করলে। লর্ড লিনলিথগোর বা মিস্টার জিনার কি বিন্দু-মাত্র সহানুভূতি প্রকাশ পেল? তাঁরা সম্পূর্ণ নির্বিকার এবং নির্মম। জিনা তাঁর সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করে রেখেছেন, বার-বার জেলে গিয়ে অপচয় করেন নি। কংগ্রেস নেতারা যেমন করেছেন। এঁরা শ্রান্ত ক্লান্ত নিঃশেষিত। তিনি একদম তাজা। বড়লাট যদি তাঁর দিকে ঝোঁকেন তা হলে কি আর রক্ষে আছে? একমাত্র ভরসা অ্যাটলি। কিন্তু তাঁর বিপরীত দিকে চার্চিলও তো বিদ্যমান। ব্যাপারটা এমনভাবে জট পাকিয়ে রয়েছে যে হাত দিয়ে জট খুলতে পারা যাবে না। কাঁচি দিয়ে কাটতেই হবে। তার মানে পার্টিশন। তা বলে শুধুমাত্র ভারতের নয়। লীগপন্থীদের সমঝিয়ে দিতে হবে যে পাকজাবের তথা বাঙলারও। তাতে যদি অন্তঃপরিবর্তন হয়। তবে ইংরেজকে তাড়াতেই হবে। যত নষ্টের গোড়া ওদের ডিভাইড অ্যান্ড রুল পলিসি। তার থেকেই এসেছে জিনার ডিভাইড অ্যান্ড কুইট।" যূথিকা নিদ্রার উদ্যোগ করে।

"তা হলে জিন্নাকেই দিল্লীর মসনদে বসিয়ে দিয়ে বড়লাট বিদায় হোন। এই একমাত্র সমাধান। আমরা ঝুঁকি নেব।" ইতি মানস।

"মরি মরি কী চমৎকার সমাধান! মুসলিম শাসনের পর ব্রিটিশ শাসন, ব্রিটিশ শাসনের পর ফের মুসলিম শাসন, ভারতের ভাগ্যে যেন আর কোনো বিকল্প নেই। কিন্তু শিখ বলে এখনো একটা সম্প্রদায় রয়েছে। শিখেরা যখন খেপে গিয়ে যুদ্ধং-টুদ্ধং বাধিয়ে দেবে তখনি হবে সমস্ত তর্কের অবসান।" ইতি যূথিকা।

সকালবেলা স্টীমারযাত্রা। দীপককে তার নতুন জ্যাঠাইমা একজোড়া বাইনোকুলার কিনে দিয়েছেন, তাই চোখে লাগিয়ে সে নদীর দুধারের গ্রামে গঞ্জে কত কী

আবিষ্কার করছে। আর মণিকাকে তিনি কিনে দিয়েছেন একটা মিহি নীল শাড়ি। তাই পরে সে ফুরফুর করে পরীর মতো উড়ে বেড়াচ্ছে। ডেকের উপর পায়চারি করতে-করতে তাদের মা তাদের দুজনের উপর দুই চোখ রেখেছেন।

ওদিকে মানস জমে গেছে সহযাত্রী এক মুসলিম অফিসারের সঙ্গে। তিনি নানা স্থানে টুর করে বেড়াচ্ছেন। মানসের চেয়ে সিনিয়র, কিন্তু অন্য সার-ভিসের। তাঁর কাছে মানস শুনছে, "মফস্বলে আজকাল ইউরোপীয় অফিসার আপনি বিশেষ দেখতে পাবেন না। একধার থেকে বদলি হয়ে চলে যাচ্ছেন কলকাতায়। যাঁদের জায়গায় যাচ্ছেন তাঁরা যাচ্ছেন দিল্লী। নিত্য নতুন পদ সৃষ্টি হচ্ছে তাঁদের খাতিরে। এর পেছনে কী যে রহস্য তা আপনার হয়তো জানা আছে, আমার অজানা। একজন ইনটেলিজেন্স অফিসারের কাছে গোপনে একটা ক্লু পেয়েছি। সাহেবরা আশঙ্কা করছেন যে সিপাহি বিদ্রোহের মতো একটা কিছু ধোঁয়াচ্ছে। আমরা টের পাচ্ছি নে, ওঁরা পাচ্ছেন। যেখানে যত ইংরেজ আছে একরাত্রেই সব কটাকে নিকেশ করবে। সবাই তো আছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। কে কাকে রক্ষে করবে? তাই সাব-ধানের মার নেই। দিল্লী, কলকাতা, বম্বের মতো বড়ো বড়ো শহরে ওরা র‍্যালি করছে। হয় প্লেন ধরবে, নয় জাহাজ ধরবে। যারা পালাবার সুযোগ পাবে না তারা দলবদ্ধ হয়ে লড়বে। তার আগে ক্ষমতাহস্তান্তরের জন্যে কথাবার্তা চালিয়ে যাবে, দেশবাসীদের আশায়-আশায় রাখবে।"

মানস বিস্মিত হয়। "না, আমি তেমন কোনো ক্লু পাই নি। তবে আমিও খবর পেয়েছি যে ওরা পেনসন ও ক্ষতিপূরণের হিসেব কষছে। এর থেকে অনুমান হয় কেন্দ্রে একটা রদবদল হতে যাচ্ছে, নতুন সরকার পুরানো সরকারের দায়দায়িত্ব হাতে তুলে নেবেন। ক্ষমতার হস্তান্তর মানে দায়িত্বের হস্তান্তর, দায়ের হস্তান্তর। তাই যদি হয় তবে ক্ষমতা কেড়ে নেবার জন্যে বিদ্রোহ কেন? আর তার আশঙ্কায় বড়ো-বড়ো শহরে র‍্যালি করা কেন? যারা আপনি যাচ্ছে তাদের তাড়াতে গেলে তারাও তো ঘুরে দাঁড়াতে পারে, আত্মরক্ষার জন্যে, আত্মসম্মানের জন্যে। বিদ্রোহীরা কি মনে করে ইংরেজরা এত দুর্বল হয়ে পড়েছে যে গায়ের জোরে লালকেল্লা দখল করা বা মসনদ দখল করা অতি সহজ?"

"ঠিকই বলেছেন। তবে এটাও ঠিক যে বহু লোকের হাতে বন্দুক, রিভলভার, স্টেনগান ইত্যাদি কী জানি কেমন করে এসেছে। বহু লোক যুদ্ধবিগ্রহের তালিমও পেয়েছে। তাদের ধারণা জন্মেছে তারা না জানি কত বলবান। আগামী জুলাই কি অগস্টে ঘটতে পারে একটা রাইজিং। যেমন আয়ারল্যান্ডের ঈস্টার রাইজিং। সেরকম একটা সম্ভাবনার বিরুদ্ধে প্রস্তুতির অঙ্গ হিসেবে সরকার এখন নানান জায়গায় নতুন নতুন জেলখানা তৈরি করে রাখছেন। কিংবা পুরনো জেলখানার নতুন ওয়ার্ড। বিদ্রোহের আঁচ পেলেই সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের ফাটকে পুরবেন।" ভদ্রলোক ফিসফিস করে বলেন।

"তার মানে ইংরেজরা ডানকার্কের মতো দৌড় দেবে না। আক্রমণের সম্মুখীন হবে। কিন্তু মানে-মানে ক্ষমতার হস্তান্তর যদি হয়ে যায় তার কোনো দরকার হবে না, খান সাহেব। তবে আমি ভাবছি ক্ষমতার হস্তান্তরে পাকিস্তানের দাবি নিয়ে-মুসলিম লীগ বাদ সাধবে না তো? জানি নে আপনি লীগপন্থী কিনা। হয়ে থাকলে মাফ করবেন।" মানস জিব কাটে।

"আজকাল মুসলিম অফিসারদের মধ্যে লীগপন্থী নন কজন? এখন কি কংগ্রেসের বা কৃষকপ্রজাপন্থীদের তেমন প্রভাব আছে? মহাত্মা গান্ধীর উপরেও তেমন ভক্তি নেই। এখন কায়দে আজমের উপরে অগাধ বিশ্বাস। আর পাকিস্তান তো মুসলমানদের কাছে খেলাফতের পরিবর্ত। এতে তাদের ধর্মীয় ইমোশন পরিতৃপ্ত হয়। এটা যুক্তিতর্কের ব্যাপার নয়। কংগ্রেসের পক্ষে যুক্তি-তর্কের কমতি নেই, কিন্তু ধর্মীয় ইমোশন কোথায়? কেন আমরা ভারতরাষ্ট্রে চিরস্থায়ী মাইনরিটি হব, যদি পাকিস্তান রাষ্ট্রে চিরস্থায়ী মেজরিটি হতে পারি। ভারত-মাতা বলতে আপনারা যেমন ভাবাবেগে আপ্লুত হন আমরা তেমন হই নে। তা ছাড়া আরো একটা জিনিস আছে, যেটা আবেগের পর্যায়ে পড়ে না, গণনার পর্যায়ে পড়ে। ইংরেজরা সরে গেলে যত সব উচ্চতর পদ খালি হবে সেসব আপনাদের ভাগেই জুটবে, কেননা আপনারা সিনিয়র। আমরা চাই আমাদের ভাগেও পড়ুক। যদিও আমরা জুনিয়র। পাকিস্তান হলে আমরাও চোখ বুজে তিনভাগের একভাগ পাই। মিলিটারিতে আরো বেশি। এককথায় বলতে পারি, স্বাধীনতা বলতে আপনারা বোঝেন ইংরেজের অধীনতা থেকে মুক্তি আর আমরা বুঝি হিন্দু মেজরিটির অধীনতা থেকে মুক্তি। এর জন্যে আলাদা একটা মুক্তিযুদ্ধের প্রয়োজন নেই। ইংরেজরা যাবার সময় ভাগবাঁটোয়ারা করে দিয়ে যেতে পারে। চাই শুধু কংগ্রেসের সম্মতি।" খানসাহেব নিবেদন করেন।

মানস দুর্মতি হয়ে বলে, "আপনারা যদি ভারতীয় হতে না পারেন আমরাও পাকিস্তানি হতে পারব না। কংগ্রেস কী করে সম্মতি দেবে?"

খানসাহেব মুখ ফিরিয়ে একটু হাসেন। তার পর বললেন, "কংগ্রেস কী করবে তার নজির আমরা দেখেছি। সেই নজির থেকে বলতে পারি কংগ্রেসের নীতি হচ্ছে 'না গ্রহণ ও না বর্জন'। কার্যত গ্রহণ। পার্টিশন সে গ্রহণও করবে না, বর্জনও করবে না। কার্যত গ্রহণ করবে। তামাম বাঙলাদেশ বহে পাকিস্তানের শামিল। আপনার যদি পাকিস্তানে থাকতে আপত্তি থাকে আপনি হিন্দুস্থানে বদলি হয়ে যাবেন। আপনার এমন কী হানি হবে?"

মানস বিশ্বাস করে না যে কংগ্রেস অমন কিছু করবে। কিন্তু ইংরেজদের হাত থেকে ক্ষমতা নেবার সময় যে দরাদরিটা হবে সেটা যে পার্টিশনের ভিত্তিতে হবে না তা কি সে জোর করে বলতে পারে? আর পার্টি-শনের ভিত্তিতে যদি হয় তবে প্রদেশও ভাগ হয়ে যেতে পারে।

"হিন্দু মুসলমান যদি দুই নেশন হয়ে থাকে তা হলে বাঙলাদেশও দুই নেশনের মধ্যে ভাগ হয়ে যেতে পারে, খানসাহেব। তামাম বাঙলাদেশ কি শুধুমাত্র মুসল-মানদেরই হোমল্যান্ড? হিন্দুদেরও নয়? বাঙালি হিন্দুদের হোমল্যান্ড তা হলে কোনখানে? আমার মতো কয়েকজন অফিসার অন্য প্রদেশে বদলি হয়ে যেতে পারেন, কিন্তু বাঙালি হিন্দুরা ঝাড়ে-মূলে বদলি হতে পারে না। তেমন ব্যাপার যদি ঘটে তবে সমানসংখ্যক মুসলমানও উত্তর ভারত থেকে ঝাড়ে-মূলে বদলি হয়ে আসবে। তাতে বাঙালি মুসলমানের আখেরে লাভ হবে না ক্ষতি হবে?" মানস ভদ্রলোককে ভাবনায় ফেলে।

তিনি হাওয়া হয়ে যান।

যূথিকা এসে সুধায়, "ওই অচেনা অজানা মানুষটির সঙ্গে কী এত কথাবার্তা হচ্ছিল? তোমার যা স্বভাব। সবাইকে বিশ্বাস করে পেটের কথা বলবে। আমার তো সন্দেহ উনি গোয়েন্দা বিভাগের কেউকেটা।"

মানস অপ্রতিভ হয়ে বলে, "হতেও পারেন। কিন্তু আমিও এমন কিছু ফাঁস করি নি যা খুবই গোপনীয়।"

এর পরে স্টীমার থেকে ট্রেন। ঘণ্টাখানেক পরে ট্রেন থেকে মোটর। মোটর থেকে জজকুঠি। বার্লো খালি করে দিয়ে গেছেন। একদিন বিশ্রামের পর জজকোর্টে গিয়ে মানস চারজ নেয়, কাজকর্মের মধ্যে ডুবে যায়।

রাত্রে শুতে যাবার সময় একটা কথা তার মনে পড়ে যায়। যূথিকাকে শোনায়। "ওই লোকটির দেওয়া খবর যদি নির্ভরযোগ্য হয় তবে এই বছর জুলাই কি অগস্ট মাসে একটা রাইজিং প্রত্যাশা করা যায়। আয়ারল্যান্ডে যেমন ঈস্টার রাইজিং।"

"ওমা! তাই নাকি?" যূথিকা চমকে ওঠে।

"তখন থেকেই আমি ভাবছি এর পেছনে কে থাকতে পারে? তুমি অনুমান করতে পার?" মানস চোখ টেপে।

"কে? সুভাষচন্দ্র?" যূথিকা আন্দাজে বলে।

"সুভাষচন্দ্র এখন কোথায় কে জানে? ধরা পড়লে ওয়ার ক্রিমিনালস ট্রায়াল। আমার সন্দেহ আরেকজনকে।" মানস রহস্যটাকে ঘোরালো করে।

"বলো না গো, কে?" যূথিকার সবুর সয় না।

"জুলির বান্ধবী মিলি। মধুমালতী মুস্তাফী। ও যে বিলেত থেকে এসেছে সেটা এই উদ্দেশ্য নিয়ে।" মানস সন্দেহ করে।

"মধুমালতী দত্তবিশ্বাস।" যূথিকা সংশোধন করে। "কিন্তু তোমার সন্দেহটা অহেতুক। মিলি মা হয়েছে। অমন অ্যাডভেনচার করবে না।"

এর মাসখানেক বাদে বোম্বাইতে রয়াল ইনডিয়ান নেভিতে মিউটিনি। মানস খবরটা শুনে যূথিকাকে বলে, "হাঁউ মাঁউ খাঁউ। মিলির গন্ধ পাঁউ।"

যূথিকা বলে, "তুমি ভুল ঠাউরেছ। মিলি নয়, অরুণা।"

"মিলি খুব সম্ভব অরুণার দলেই ভিড়েছে। তুমি কলকাতায় বউদিকে চিঠি লিখে মিলির খোঁজ নাও।" মানস পরামর্শ দেয়।

বউদি উত্তর দেন, "মিলির দাদা বোম্বাইতে থাকেন। মহারাষ্ট্রকন্যা বিয়ে করেছেন। একটি বাচ্চাও হয়েছে। মিলি দেখা করতে গেছে।"

মানস বলে, "আমি ঠিকই অনুমান করেছিলুম সে এখন বোম্বাইতে। বাকিটা তর্কসাপেক্ষ।"

কিছুদিন পরে সুকুমারের চিঠি। সে তার বউ আর ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে বিলেত ফিরে যাচ্ছে। এবার জাহাজে। ইতিমধ্যে একটা ফাঁড়া কেটে গেছে। মিলি কী জানি কেমন করে মিউটিনির সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। পুলিশ তাকে ধরে নিয়ে আটক করে। সুকুমার তখন দিল্লীতে। বোম্বাই থেকে মিলির দাদার ট্রাঙ্ক কল পেয়ে বোম্বাই ছুটে যায়, সরাসরি গভর্নরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। মিলি যুদ্ধের সময় ইংলন্ডে ছিল ও নানাভাবে সাহায্য করেছিল। লাটসাহেব তাকে ছেড়ে দেন ও ডেকে পাঠান। বলেন, 'অবোধ বালিকা, এই নেভি আমরা সঙ্গে করে নিয়ে যাব না, তোমাদের হাতেই দিয়ে যাব। তখন তোমরা একে শাসন করবে কী করে, যদি এই রেটিং-দের অবাধ্য হতে শেখাও? আর্মি বা নেভি বা পুলিশ ষ্ট্রেড ইউনিয়ন নয়। এরা যদি অথরিটি অমান্য করে তবে সর্বনাশ।'

"ঠিকই তো।" মানস বলে, "সিপাইদের যারা বিদ্রোহী হতে শেখায় তারা পরে আর তাদের শাসন করতে পারে না। সেই বিদ্রোহীরাই পরে হয় শাসক। মিলিটারি ডিকটেটরশিপ অমনি করেই কায়েম হয়। ব্রিটিশ শাসনের পরিবর্তে মিলিটারি ডিকটেটরশিপ কি কারো কাম্য? যাক, মিলি ফিরে গিয়ে ভালোই করেছে।"

"ভালো ওর সংসারের দিক থেকেও। স্বামী এক দেশে, স্ত্রী আরেক দেশে, ছেলে যে কার কাছে তাও অনিশ্চিত। ওরা ছাড়াছাড়ির অভিমুখেই যাচ্ছিল। হ্যাঁ, ফাঁড়া কেটে গেছে।" যূথিকা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে।

"আমি অতটা জানতুম না।" মানস বলে।

"তুমি কতটাই বা জান? মিলি বেশিদিন এদেশে থাকলে ওর নিজের ঘর তো ভেঙে যেতই, জুলির ঘরও ভেঙে দিত। সৌম্যদাকে ও ভুলতে পারে নি। ওর দৃঢ় ধারণা সৌম্যদা ওরই হত, যদি না জুলি আর সুকুমার হঠাৎ কোন্‌খান থেকে এসে হাজির হত। মানুষের ভাগ্য অমনি করেই উলটোপালটা হয়ে যায়। কিন্তু একবার অদলবদল হয়ে গেলে পরে আর জোড় মেলানো যায় না। সৌম্যদার সঙ্গে মিলির আর সুকুমারের সঙ্গে জুলির আর কোনোদিনই মিলন হবার নয়। জুলির দুর্বুদ্ধি হবে না, মিলির সুবুদ্ধি হলেই বাঁচি। বেশ বোঝা যায় মেয়েটা অবোধ নয়, অসুখী।" যূথিকা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ে।

"মিলিও ভালো, জুলিও ভাবো, বাবলীও ভালো, দীপিকাও ভালো, কিন্তু সবার চাইতে ভালো যে আমার ঘরের আলো—জুই।" মানস ওরে বার বার চুমু খায়।

[ক্রমশ

ইনসমনিয়া

খোন্দকার আশরাফ হোসেন

নিদ্রার গভীরে যাব, হে সময়, তুলে রাখো তীক্ষ্ম তরবারি,
বিষাদের বিষ-ফলা আত্মসম্বরণ করো, আমি
ঘুমের মিহিন সুতো, কারুকাজ-বোনা নম্র পাখির পালক
চুলের হৃদয়ে গেঁথে হেঁটে যাব একা।
নিদ্রার গভীরে যাব, কোষবন্ধ ছুরিকার ঘুম,
রৌদ্রপক্ক আপেলের ঘুম
আমাকে কে এনে দেবে? আমি তাকে জীবনের সুখ
প্রসন্ন প্রহর দেব, নাগরিক পাশবালিশের নম্র তুলোট পালক,
রৌদ্রের আততি-ভরা দুপুরের কর্মব্যস্ত পায়ে-হাঁটা
ঘর-ফেরা ঘর!

মানুষেরা কেমন ঘোরের মধ্যে হাঁটে সারাদিন,
পালানো পাখির খোঁজে মাঠ ঘাট রাজপথ, প্রমত্ত অ্যাভিন্যু
হেঁটে যায়, জীবনের কণ্ঠা ধরে ঝুলে থাকে বাসের যাত্রীরা,
এ-পাড়া ও-পাড়া ঘুরে ক্লান্ত হয় ফেরিঅলা, তার
মুলিবাঁশ-চেরা হাত নেমে আসে বেলুনের সুতো থেকে,
মুখোশের বাঘ
একলাফে খেয়ে নেয় দ্বিপ্রহর স্বপ্নাবলী, কপালের ঘাম।

ঘুমের অন্দরে যাব, চেতনার দৌবারিক পথ ছেড়ে দাও,
পথ ছাড়ো মর্মব্যথা, শিরার চৈত্রের দাহ, সংহারক জন,
ঘুমের সড়ক বেয়ে হেঁটে যাব একা—
ফেলে যাব চুল থেকে খসা ফুল, ঝরা তাঁর নক্ষত্রবীথির,
মেঘের তোরণ থেকে ফুল্ল নারী দোলাবে আঁচল।
নিমগ্ন পথের ঘুম
আমাকে কে এনে দেবে? আমি তাকে দূরত্বের দূরগামী পথ
চেতনার রথ দেব, প্রগাঢ় দুপুর রাত, প্রসন্ন সকাল—
আজ রাতে নিদ্রা দাও, কাল ফের চুমু খাব ঘামের কপাল।

ধাত্রী

দিব্যেন্দু পালিত

ধাত্রী তার স্নেহের আড়ালে
রেখেছিল রক্তমুখী জবা,
যদি ফোটে দিকচক্রবালে
আকাঙ্ক্ষার সজীব। অথবা
যদি শুভক্ষণে পায় দ্যুতি
প্রজ্ঞাপরিমিত সব ছবি।

অস্ফুট রেখার প্রস্তুতি
করেছিল তাকে বিপ্লবী—
প্রতিজ্ঞায় কঠিন, কখনো
ভাঙে নি, যেভাবে ভাঙে শিলা ;
আকস্মিক শব্দে শ্রবণও
হয়ে ওঠে ধনুকের ছিলা।

ধাত্রী তার আজন্ম বয়স
দ্যাখে থামে ক্রমশ সময়ে—
প্রতিদানে প্রাপ্ত বোধ, যশ,
সন্তানের মুখ, স্মৃতি ক্ষয়ে
এখনো সূর্যোদয় নয়—

কখনো সূর্যোদয় নয়।

প্রিয়সখি, মিথ্যা বলেছিলে !

কৃষ্ণ ধর

প্রিয়সখি বেশে তুমি আকাঙ্ক্ষিত সব দেবে বলেছিলে
তবে কেন প্রতিবার কপট প্রণয়ে দগ্ধ কর ?
অনেক সাজানো শব্দ রেখেছিলে ওই ওষ্ঠপুটে
অহেতুক মায়ামন্ত্রে হৃদয় ভোলাতে !

লক্ষ্মীর ঝাঁপিতে তুমি বলেছিলে আছে উজ্জ্বলতা
এখন সেখানে দেখি করোটি কঙ্কাল, ভূতমন্ত্র রাখা
বশীকরণবিদ্যায় ভুলিয়েছ সময় ও মানুষ
সাসী'র মতো তুমি মন্ত্রসিদ্ধ, অপ্রেমে নিপুণা !

তোমার রহস্য বুঝতে কেটে গেছে দীর্ঘতম বসন্তের দিন
শোক বা বিরহে তুমি অবিচল পাথরপ্রতিমা
স্তোকবাক্যে গোঁথে তুমি বানিয়েছ যশস্বী মিনার
তার চূড়োতে ওড়ে মিছিমিছি জয়ের পতাকা।

তোমার চোখেতে জ্বলে মিথ্যার আগুন
তোমার বুকের ভিতর শুনি মিথ্যা ভ্রমরগুঞ্জন
মিথ্যামন্ত্রে তুমি কর মিথ্যা উপাসনা।

প্রিয়সখি, বলেছিলে ভালোবাসা দেবে
মিথ্যার মুখোশ ছিঁড়ে গেলে
জান নাকি
ভালবাসা মিথ্যা হয়ে ঘৃণাকে জড়ায় ?

অন্ধ চিৎকার

ইকবাল আজিজ

অন্ধ চিৎকার ডানা মেলে দিয়েছে চৌদিকে—
মানুষের ভেতর দিয়ে সে উড়ে যায়
উৎসবের আলো-ঝলোমলো স্বপ্ন ডিঙিয়ে
সে উড়ে যায়

তার বেদনার গায়ে কতকাল থেকে কান্নার ধূমায়িত মেঘ।
অন্ধ চিৎকার ডানা মেলে দিয়েছে চৌদিকে—
ভাঙা ডানায় উড়তে-উড়তে সে পাখি
শেষরাতের বস্তির পাশ দিয়ে, রুগ্ন ফুটপাত
ঝিমানো গাছের সারি, বুদ্ধিজীবীদের হিংসা ও মারামারি
প্রভৃতি সবকিছুর গা ঘেঁষে সে উড়তে থাকে

অন্ধ চিৎকার এক ধূমল মেঘের মতো
ভাসতে থাকে, পাগোলের মতো হাওয়ায় হাওয়ায়
ভাসতে থাকে দুঃখজয়ী উন্মাদের মতো
পরম শান্তিতে

অন্ধ চিৎকার ঘুমিয়ে পড়ে, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে মরে যায়
পরম ক্লান্তিতে।

আমাদের সবার আপন

ঢোলগোবিন্দ-র আত্মদর্শন

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

১

কিছুটা তুলনামূলক

সোহেল এসেছিল। সোহেল চলে গেছে।

তার সঙ্গে 'ঢোলগোবিন্দ-র আত্মদর্শনে'র কী সম্পর্ক? রসুন, এখুনি তা জানতে পারবেন।

একই দেশে বাড়ি। ওর কুষ্ঠিয়ায়। আমার নদীয়ায়। মানে, নদীয়ার যেদিকটা কুষ্ঠিয়া হয়ে গেছে। জাতে ও মুসলমান। না, সৈয়দ-টৈয়দ নয়। আমি হিন্দুর ছেলে। ভগ্ন কুলীন বংশ।

ওর পাসপোর্ট বাংলাদেশের। আমারটা ভারতীয়। ও থাকে বাগদাদে। আমি কলকাতায়। ও আমার হাঁটুর বয়সী।

সোহেল ঝড়ের মতো এসে ঝড়ের মতো চলে গেছে।

ও যে এখন কোথায় ঠিক জানা যাচ্ছে না। গীতা ওর শেষ চিঠি পেয়েছিল ব্যাংকক থেকে। সেখানে কোনো মেয়ের পাল্লায় কিংবা কোনো মেয়ে ওর পাল্লায় পড়ে থাকতে পারে।

এখানে যারা ওর এক গেলাসের ইয়ার, তারা টেলেক্স টেলিগ্রাম চিঠি দিয়েও এখনও ওর কোনো হদিশ পায় নি।

এক উঠতি তরুণী ওর দেওয়া পোস্টবক্স নম্বরে চিঠি পাঠিয়েছিল। কী লিখেছিল ভগবান জানেন। তবে এক সমব্যবসায়ীর কাছ থেকে ভারি মিষ্টি একটা উত্তর এসেছে।

তিনি লিখেছেন মাস কয়েক হল ঐ পোস্টবক্স নম্বরের মালিকানা তাঁর। নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে লেখা আরও কয়েকটা নীল খাম তাঁর হস্তগত হয়েছে। অন্য একজনকে লেখা হলেও, চিঠিগুলোতে যে আবেগ-অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে, তা পড়ে, তিনি সমবেদনা না জানিয়ে পারেন নি। তার চেয়েও বড়ো কথা, চিঠি-গুলোতে এমন হিম্মত ছিল যে, তাঁর মতো লোকের পাষাণহৃদয়ও গলাতে পেরেছে।

অথচ এই লেখার জন্যেই সোহেলকে আমার দরকার ছিল।

এটা হল 'তুলনামূলক'-এর যুগ।

ইতিহাসে, ধর্মতত্ত্বে, ভাষাতত্ত্বে তো বটেই, সাহিত্যেও 'তুলনামূলক' এখন খুব চলছে।

আত্মজীবনীতেও আমি এর প্রবর্তন করতে চেয়েছিলাম।

আমার দরকার ছিল এমন একজনকে যার ফেব্রুয়ারিতে জন্ম। না হলেও যে চলত না এমন নয়।

এমন সময় বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়ার মতোই কলকাতায় হঠাৎ উড়ে এসে জুড়ে বসেছিল সোহেল।

যেদিন জানতে পারলাম ফেব্রুয়ারিতে ওর জন্ম, সেদিন যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলাম। তার আরেকটা কারণ, 'ঢোলগোবিন্দর আত্মদর্শন' লিখব বলে ইতিমধ্যেই আমি বরাত নিয়ে ফেলেছি। পেছোবার তেমন উপায় থাকছিল না। লিখে দিন-আনি দিন-খাই করে যাদের চালাতে হয় তাদের এ যে কী ঝকমারি অন্য কাউকে তা বলে বোঝানো যাবে না।

ওকে দেখি আর নিজের সঙ্গে তুলনা করতে থাকি।

শুনলাম এক সময়ে ও নাকি কবিতা লিখত। খুবই সম্ভব। প্রথমত বাঙালি। দ্বিতীয়ত কলকাতায় এসেই ও প্রথম খুঁজে বার করে শক্তির বাড়ি। সেখানে গিয়ে পড়ার ফলেই ওর সঙ্গে আমার আলাপ।

পড়াশুনো করেছে কষ্ট করে। চানাচুর চিনেবাদাম ফেরি করা থেকে শুরু করে বাড়ি-বাড়ি ঘুরে হেয়ারডাই বিক্রি—সব রকমই তাকে করতে হয়েছে। তাতে লাভ হয়েছে এই যে, জিভের আড় ভেঙেছে। কিন্তু বানানে খুব কাঁচা থেকে গেছে।

ওর ফেব্রুয়ারিতে জন্মের ব্যাপারটাতে গোড়ায় আমার একটু সন্দেহ দেখা দেয়, যখন শুনলাম ও কবিতা লিখত। মনে হয়েছিল, ফেব্রুয়ারির কথাটা আমাকে ও খুশি করার জন্যে বলে নি তো? পরে যখন শুনলাম সোহেল এখন আর কবিতা লেখে না তখন আমার ধড়ে প্রাণ এল।

ওর কবিতা লেখা ছাড়ার কারণটাও আমার খুব বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয়। ও বলেছিল, কবিতা লিখে পেট ভরে না। তাই ওসব ছেড়ে টাকা করার লাইনে চলে গেলাম।

তখন আমি আমার সঙ্গে তুলনামূলকভাবে ওকে দেখতে শুরু করে দিলাম।

কিন্তু এমনি আমার কপাল, ও আমাকে তার সময়ই দিল না। একদিন হুট করে চলে গেল সিঙ্গাপুরে।

যাবার সময় যার যার জন্যে যা যা জিনিস ও রেখে গেল, তার মধ্যে ছিল আমার জন্যে একটা দামি সিলকের পানজাবি। আরও একটা জিনিস আমার জন্যে সোহেল রেখে গিয়েছিল। গীতা ক'দিন পরে আমার হাতে দেয়।

ডেল্-এর একটা ছোট্ট ইংরিজি পার্স্‌বুক—'অ্যাকোয়ারিয়াস : রাশিফল।'

বইটার জন্যে সত্যিই আমি কৃতজ্ঞ। কেননা সবার চোখের সামনে এই বই দোকান থেকে কেনার আমার নিজের কোনোদিন হিম্মত হত না।

তাও কী? শুধু এপ্রিল থেকে জুন—এই ক-মাসের প্রাত্যহিক ভবিষ্যদ্বাণী।

বইটার মলাটে যেন ড্যাব-ড্যাব করে তাকিয়ে আছে দুটি শব্দ : 'আপনার বসন্ত।' এই বয়েসে? মরণ আর কী বলে না!

ওর নামের নীচে তারিখ দেখে বুঝলাম কলকাতায় আসার আগেই নিজের জন্যে কোনো এয়ারপোর্টে বইটা ও কিনেছিল। ওরও অ্যাকোয়ারিয়াস। কুম্ভরাশি। ফেব্রুয়ারিতে জন্ম। না, সোহেল ঠকায় নি।

সোহেল আমার হাতের বাইরে চলে যাওয়ায় এবং হাতের কাছে আর কাউকে না পাওয়ায়, ওর পরিত্যক্ত বইটা দিয়েই আমার আত্মদর্শনের সূত্রপাত করে অগত্যা দুধের স্বাদ আমাকে ঘোলে মেটাতে হবে :

রাশিফলে জাতকের যেসব সদ্‌গুণ দেখছি, তাতে যে-কারো চোখ ট্যারা হওয়ার কথা। মগজ খুব উর্বর। সেটা বোঝাই যায়। অমায়িক, দিলদরাজ, আত্মবিশ্বাসী এবং আর কারো মতন নয়। যেটা মনে করে সেটা করে ছাড়ে। বুদ্ধি ধারালো। অনেক কিছু কল্পনা করে নিতে পারে। খুব একটা আবেগবশে চলে না। কারো দিকে টেনে কথা বলে না। কাছের লোকদের তাতে অস্বস্তি হয়। হৃদয়ের বদলে ওর মনটাই বেশি কাজ করে। রুচি মার্জিত। কিন্তু নিজের ওপর বেশি ভরসা করতে গিয়ে এবং একগুঁয়েমির জন্যে মুশকিলেও পড়ে। অবশ্য এর লাভের দিকও আছে—সাফল্য, ক্ষমতা আর সিদ্ধিলাভ হয়। আদর্শের তাড়নায় পরের ভালো করে বেড়ানো, নিঃস্বার্থভাবে সবাইকে ভালোবাসা, শিল্পের দিকে টান, সৃষ্টির ক্ষমতা, পৃথিবীর ওপর মমতা। কোন্ সদগুণটা ওর নেই?

পঞ্চভূতের মধ্যে কুম্ভজাতকের ভাগে পড়েছে মরুৎ। ফলে, মানসজগতে বিচরণ। জীবনে ভাবের আদানপ্রদান, তালিম আর জ্ঞান আহরণের দিকটাই বড়ো। মরুৎচিহ্নের জন্যে মানুষজনদের সঙ্গে ও বড়ো বেশি জড়িয়ে পড়ে। সামাজিক আর ব্যস্ততার জগৎ ওর। ওর মতো লোক জীবনে কেষ্টবিষ্টু হয়। ওর মধ্যে কোনো ধোঁয়াটে ভাব নেই। বাজে কথা বলে না, ফলে অনেক সময় মুখ দিয়ে অপ্রিয় সত্য বেরিয়ে যায়।

যা নেই তা বার করার, সামনের দিকে চাইবার ওর মানসিক ক্ষমতা আছে। বাধা ভাঙতে, পিছুটান কাটাতে এবং নতুন স্রোতে গা ভাসাতে ভালোবাসে। নতুন কথা ভাবতে ওর ভয় নেই, দুম করে বলতেও ছাড়ে না। লোকে সেটা ঠিক নিতে পারে না। কথা শুনে মনে করে, ওর একটু দেমাক বেশি। পেশাগত কাজের দিকে টান। ভালোমন্দ খাওয়া, ভালো থাকা, মানজা দিয়ে চলার দিকে ঝোঁক। চিন্তায় সবার আগে ; সামাজিকভাবে, যেদিকে স্রোত সেইদিকে। একটু ভাসাভাসা ওপরসা ভাব ; মনঃসংযোগের একটু অভাব। ধারণাশক্তি চমৎকার, তবে লক্ষ্যভুলের মাত্রাটা বেশি। ভেতরটা এই ফাটে-এই ফাটে, সামলাতে না পারলেই বিপদ।

বাড়ন্ত কোম্পানির লাগসই এগজিকিউটিভ হতে পারে। অন্যদের সঙ্গে নিয়ে চলা, বলা-কওয়া, পটানোর ক্ষমতা—সবই আছে। দরকার পড়া-লেখা-করা লোকদের সঙ্গ। নইলে সারাদিন যদি চেয়ারে বসে কেবল চার্ট, সংখ্যা আর ডিটেলে ফেঁসে থাকতে হয় তাহলেই তো চিত্তির!

দশজনের মধ্যে একজন হওয়া, হাতে মাথা কাটার ক্ষমতা থাকা—এসব সে চায় এবং চেষ্টা করলে পায়। অনেকগুলো নিশানা মেধার স্তরে থাকলেও, হাতেনাতেও অল্পবিস্তর চাই। গাড়িবাড়ি এইসব। লোকে যাতে তাকিয়ে দেখে। সেটা হস্তগত করার ওর এলেমও আছে। বাইরে থেকে দেখলে ও মানবপ্রেমিক। পরের বেলায় দাঁতকপাটি নয়, তবে নিজের বেলায় অবশ্যই আঁটিশুঁটি। আপ্‌ ভালা তো জগৎ ভালা—কথাটা ও এই অর্থেই বুঝে নিয়েছে।

ওর গোপন সম্বল বলতে একটা আছে খুঁটিয়ে দেখে ভালোমন্দ বাছার ক্ষমতা। এর জোরে অন্যদের ও মেরে দিতে পারে। যত শক্তই হোক, আদাজল খেয়ে লেগে সে কার্যোদ্ধার করতে পারে। সেইসঙ্গে পারে ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে। আর পারে মনটাকে সজাগ রেখে দিলদরাজ হতে।

লাল আর নীলে মেশালে বেগুনি হল ওর যথোপযুক্ত রঙ। একই সঙ্গে চনমনে আর ভাবুক। উষ্ণ আর শীতল। নীল দিকটা মাথা ঠান্ডা রাখবে, লালের দিকে রক্ত টগবগ করে ফুটবে।

ওর দরকার অ্যামেথিস্ট। জামীরা বা রাজাবর্ত মণি। তাতে কপাল খুলবে। ধ্যানস্থ হতে পারবে। সুন্দর-সুন্দর স্বপ্ন দেখবে।

চারপাশে অনেক লেখাপড়াজানা লোক থাকবে। তবে ওর ভালো লাগবে। গতানুগতিকে ওর মন ওঠে না। ভুতুড়ে বাড়ির ওপর ওর টান। ভবঘুরে হয়ে দুনিয়া দেখে বেড়ানোর ওর খুব শখ।

মুখেন মারিতং জগৎ। সদর্থে ওর সম্পর্কে একথাটা খাটে। ধারালো কথার জন্যে বন্ধুমহলে ওর খুব খাতির। অবসর সময়েও বড়ো কিছু তাল করে ঘোরে। কিছুটা অসম্ভবের পেছনে।

মাথায় আইডিয়া গজগজ করছে। কুম্ভরাশির জাতকেরা পৃথিবী আর মানুষকে ভালোবাসে। হরবখত বলে, মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে। সজ্ঞানে কাউকে কষ্ট দেয় না। যারা সবার নীচে, সবার পিছে—তাদের সঙ্গে থাকতে চায়। বিপদ এলে ঝাঁপিয়ে পড়ে, নিজের কথা ভাবে না। তালগোল পাকালে ভালোই লাগে যদি তার কাটান থাকে।

যাবার জন্যে এক পা বাড়িয়েই আছে, অথচ বেরোবার কথা উঠলে সব সময় পেটে ক্ষিধে মুখে লাজ। সঙ্গে কী নেবে না নেবে সাব্যস্ত করতে পারে না। আর ঠিক যেটা দরকার সেটাই নিয়ে যেতে ভুলে যাবে। অজ্ঞানে ইচ্ছে করেই ভোলে। যাতে বিদেশ-বিভুঁইতে জিনিস কেনার ছুতোয় বাজারহাট চষে ফেলতে পারে। পরে ফিরে এসে লোকজনের কাছে গল্পগাছা করতে পারে এই দেখেছি সেই দেখেছি। দূরপাল্লার ভ্রমণটা হয়ে ওঠে ফিরে এসে আড্ডা জমানোর ওর একটা ভালো ফিকির।

ওর আছে ফটো তোলার শখ। আর নিসর্গপ্রেম। দুটোকে এক করতে পারলে বাড়তি দু পয়সা ঘরে আসতে পারে। মজা করে কথা বলতে পারা, যখনকারটা ঠিক তক্ষুনি বলা আর কথা বেচে খাওয়ার ব্যাপার—এসবে ওর জুড়ি নেই। একটা ফলপ্রদ কিছু ভেবে বার

করা, তারপর বিষয়টা নিয়ে একটু তত্ত্বতালাশ করা—ব্যস, তারপর দুর্গা বলে ঝুলে পড়া। তাহলে কেউ আর ঠেকাতে পারবে না।

যা সুন্দর, যা মামুলি নয়—সেইসব জিনিসে ওর ঝোঁক। টাকার ওপর ওর অত টান নেই। টাকা যেসব জিনিস পাইয়ে দেয় তার প্রতিই ওর সমস্ত নজর। আর কিভাবে কিভাবে যেন টাকা ওর হাতে ঠিক এসে যায়। লোকজনদের খাওয়াতে ও ভালোবাসে। জীবনের সেরা জিনিসগুলোই ওর প্রিয়। দরকার হলে অন্য দিকের অনেক খরচ বাঁচাতে কসুর করে না।

কুম্ভরাশির জাতক রুজিরোজগার করে নিজের মনের মতো কাজ করে। স্বাধীনতার পোকা মাথায় নড়ার দরুন সে ফ্রী-লান্স বা ঠিকের লেখার কাজ নেয়। অন্যদিকে আদর্শের ভূত ঘাড়ে চেপে থাকে বলে রাজনীতি, সমাজসেবা, লোকশিক্ষা—এসব দিকেও ঝোঁকে। অনেকে বিজ্ঞান, কারিগরি, ইলেকট্রনিক, ইনজিনিয়ারিং, উদ্ভাবনা—এসব লাইনেও যায়। কুম্ভরাশির জাতকদের সবচেয়ে বড়ো মুশকিল এই যে, এরা প্রচণ্ডরকমের পরমতঅসহিষ্ণু। এদের একটু সরে ব'স বলার জো নেই।

বইটাতে এ ছাড়াও আত্মীয়বন্ধু স্ত্রীপুত্রপরিবার নিয়েও অনেক কথা আছে। জ্যোতির্বিদ্যায় গণ্ডমূর্খ হওয়ায় তাতে আমার দন্তস্ফুট করার ক্ষমতা হয় নি।

আর যে গুরুত্বপূর্ণ একটা পরিচ্ছেদ আছে তাতে রয়েছে এ বছরের বসন্ত ঋতুতে কুম্ভরাশির জাতকের এক রোজওয়ারি ভবিষ্যদ্বাণী।

যখন বইটা হাতে পেলাম তখন বসন্ত বিগত।

ফলে, আমার ভাগ্যে বিলম্বিত হতাশ হওয়ার ব্যাপার। তাই ঐ পৃষ্ঠাগুলো চোখ বুলিয়ে দেখারও আমার ইচ্ছে হয় নি।

'ঢোলগোবিন্দ-র আত্মদর্শন' এই বলে শুরু করে দিলাম। তারপর সোহেল এলে—আমি নই, ওই বরং আমার সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দেখে নিয়ে আমার অসমাপ্ত তুলনামূলক আত্মজীবনী লেখার কাজটা ও নিজের ঘাড়ে তুলে নেবে।

[ক্রমশ

মেওয়া ও কিতাবসকল

অমিয়ভূষণ মজুমদার

খাকি-হলুদ মিলওয়ারের উপর খাকি-হলুদে হাঁটুঝুল পানজাবি ; কপাল, মাথা, এমনকি অনেক সময় চিবুকের নীচের ভাগও, জড়িয়ে কাঁধ বুক ঢেকে লাল দোরুখি। বেশ লম্বা। বেশ পুষ্ট কবজি, বড়ো বড়ো আঙুল। মুখে নাকটা তুলনায় প্রবল। বিশ গজের মধ্যে এলে তবে স্ত্রীলোক বলে ধারণা হতে থাকে।

পিছনের ব্যাকগ্রাউনড হলুদ পাহাড়, বেগনি পাহাড়, নীল পাহাড় ; আর সেসবে দূরন্ত অনুযায়ী বিভিন্ন জাতের বন-সবুজে। রাস্তাটা চত্বর থেকে বেরিয়েই ক্রমশ উপরে উঠেছে রিজে উঠতে। ফলে, এপারের বাস-স্ট্যানড আর ওপারের পাহাড়ের মধ্যে যে নীল জাতের কুয়াশা, তাও ব্যাকগ্রাউনডের অংশ হয়। বাস-স্ট্যানডে অন্তত দু-তিন রঙের বাস।

তারপর সে যখন মেওয়ার ঝুড়ি কয়েকটির পিছনে বসল, তখন তার বসার কায়দা, চকচকে সমান দাঁত, চিবুকের উপরে একটু বাঁ ঘেঁষে কয়েকটা ফুটকির এক ডায়মনড ডিজাইন—যা পকসের ফল, খয়রামণির বড়ো চোখ, দোরুখিতে কিছু গোপন-আকার প্রচুর বুক—এসবে তাকে স্ত্রীলোক বলে অনুভব করার পর, তখন পোশাকটাকে অভিনব বলে মনে হবে, এবং এরকমও মনে হতে পারে—কিছু দিন মনে থাকবে এই লম্বা মেওয়া-ওয়ালি। ঠোঁট রাঙায় না, সুরমা দেয় না চোখে, ঠোঙায় করে মেওয়া তুলে দেয়ার সময়ে নিশ্চয়ই সে হাসে, কিন্তু চোখ দুটো উদাস থাকে। সে সময়ে তার হাতে ফুটকি গর্ত কিছু চোখে পড়তে পারে, যা এক রকমের চোখে ফুলকারি, কিন্তু অন্য রকমের দৃষ্টিতে বসন্তের দাগ হতে পারে। খুব না-চুলকালে তার মাথার পাশ্চুটে চুলের পরিমাণ ধরা পড়বে না।

হয়তো খাকি-হলুদ হালকা জিন আর টুইল তার পছন্দ। যদি বলা হয়, রঙটার গম্ভীরভাবই পছন্দের কারণ, তাহলে বলতে হয়, জীবনে যে অঙ্কর কাকে বলে জানে নি, সে কিছু-কিছু করতে পারে না, কিছু-কিছু বলতে পারে না, আটকায় কোথাও। গল্প হলেও, উপ-রন্তু, এটা সত্য হয় না, সে গত পনেরো বছর একই পোশাক পরে আছে। কাবুলিদের সম্পর্কে গল্প আছে—যৌবনে বানানো পোশাক আমৃত্যু থেকে যায়। কিন্তু তার চেহারাতে, উচ্চতায়, গড়নে, চৌকো চোয়ালে পাঠানি ভাব থাকলেও, সে জাঠ, মিনা বা রাজস্থানী নয়—তাই-বা

কে বলবে? সে যে কখনও সবুজ বা নীল বা সেসবে অন্য রঙের মানানসই ফুটকি-দেওয়া কামিজ পরে নি—তা বলা উচিত হয় না ; হয়তো যোগাযোগের ফলে কোনো টুরিসটের মনে ছাপটা থাকিরই থেকে যেতে পারে।

আর তার—যার কোনো নামই আবিষ্কার হয় নি—নাম, জাতি, ধর্ম, ভাষা, তার পোশাক সম্বন্ধেই বলার বা কী আছে! যদি কেউ কখনও মেওয়া বলে তাতে বোধহয় প্রমাণ হয় না সেটা তার নাম, যদিও—আগে তো বেশ বেশি—এখন এই চল্লিশের কাছে এসেও শীত পড়তে তার উঁচু গণ্ড লালচে হয়। এটাও সম্ভব যে তার ঝুড়িগুলিতে সাজানো আপেল, নাসপাতি, কমলা ইত্যাদি—এক কথায় মেওয়া থেকে তাকে সেরকম ডাকা হয়, যেমন চিনাবাদামওয়ালাকে 'চিনাবাদাম'।

তার ঝুড়িগুলোর সংখ্যা, ঝুড়িতে মেওয়ার সংখ্যা, আকৃতি, রঙ, গুণ সব সময়ে একরকম থাকে না, পনেরো বছর ধরে তা থাকেও না। ফলের সুলভতা, তীর্থযাত্রী-টুরিসটদের আগ্রহ, তাদের সংখ্যা, এমন-কি তার নিজের উৎসাহ-অনুৎসাহের উপরে মেওয়ার সংখ্যা, পরিমাণ ইত্যাদি নির্ভর করতে থাকে। রক্ত তো লালই আমাদের, তার প্রবাহে সন্ধ্যার মতো কিংবা রাত্রির মতো ধূসর, কালো একটা ফাঁকা ভাব কল্পনা করা বৈজ্ঞানিক হয় না, কিন্তু সেরকম ঘটছে ; হঠাৎ কেউ নিজের রক্তে তেমন অনুভব করতে পারে, যখন আমরা বলি তা অহেতুক এমন অনির্দিষ্ট ক্লান্তি। সে বোবা-হেন অল্পভাষী না হলে বলত—দিমাগ বুঢ়া হ্যায়।

দোকান যে তা বলা যায় না, আর সেখানে যাকে দোকান বলে, তা হয়ও না। পাহাড়ে এই বাস-স্ট্যানড, সেখান থেকে ব্রিজ পর্যন্ত সড়ক, সড়ক-শেষে ব্রিজ—এসব করতে পাহাড়ের অনেক ভাঙচুর করতে হয়েছিল : ছোটোখাটো প্রলয়, বড়ো-বড়ো পাথর চৌচির, পাহাড়ের গা-ও ফাটিফাটা, মানুষের তৈরি ল্যানডস্লাইড ইত্যাদির পরে বিঘা দেড়-দুই এই সমতল আদায় করার পর, সেখানে দাঁড়ালে পাহাড়ি উচ্চাবচতা ছিল। নীচে থেকে গেঁথে সিমেনট-বাঁধানো ধার এই পিচ-বাঁধানো চত্বরের, যার উপরে ট্যাকসিগুলো উপরে চড়ে নীচে নামে, ব্যাক করে, পজিশন নেয় ; যাত্রীরা, টুরিসটরা—বিশেষ সীজনে—ছুটোছুটি করে। চত্বরটার একেবারে উত্তর-পূর্ব ধারে গিয়ে দাঁড়ালে পাহাড়টার কী-রকম ঢাল ছিল আন্দাজ হয় এখনও। সেদিকে এখানে-সেখানে ধসনামা ঢেউয়ে ভাঙা পাহাড়ের গা নদী পর্যন্ত নেমেছে, কোনো জায়গায় পাথরের স্তূপ যেন শূন্যে ঝুলছে। এরকম শূন্যে-ঝোলা এক স্তূপের উপরে একটা নিঃসঙ্গ গাছ খাড়া উঠেছে। সব রকম গাছ চেনা না-থাকায় বলা যাচ্ছে না—নীল লিকেন-লাগা বাদামি-হলুদ কাণ্ডের কী সেই গাছ। ধসের ফলে সে জাতের বনের অবশেষ, কিংবা সেই গাছটার শিকড়গুলোই পাহাড়ের সেই জায়গাটায় অনিবার্য ধস আটকে রাখছে—তা বলা যায় না।

সেই দিকটাতেই চত্বরের কিনারা ঘেঁষে যেখানে বাড়তি পাথর-টাথরের স্তূপ, মজুরকুলি-টাইমকীপারদের ডেরা ছিল, সেখানে কয়েকটা দোকান। তার মধ্যে একটা অখবর-কিতাব-বইপুথির। দোকানগুলোর পণ্য আলাদা হলেও চেহারা এক—পুরনো টিন, বাঁশ, কাঠ : একই উপাদান। রঙটঙ দেয়ায় দূর থেকে অন্যরকম মনে হলেও, কাছে এলে সন্দেহ হয়, জায়গাটা বেওয়ারিশ, উপাদানগুলোও সেইসব টাইমকীপারদের ফেলে-যাওয়া ছাউনি-টাউনি থেকে সংগ্রহ। বইয়ের দোকানটার আবার একহাত-উঁচু সিমেনট-বাঁধানো ভিত, ছাদের টিনে সবুজ রঙ ছিল, একটা রঙচটা সাইনবোর্ডে দোকানের নাম : কিতাব-মহল। কাউনটারে খবরের কাগজ কিছু, কিছু পত্রিকা, ভিতরে র‍্যাকে সস্তা এডিশনের কিছু বই—তাদের কিছু বয়সে মলিন, আউট-অব-ফ্যাশন, কোনো দিনই আর বিক্রি হবে না।

এই বইয়ের সামনে খোলা চত্বরে, যতদূর পিচ-বাঁধানো তার বাইরে কয়েকটা ঝুড়িতে মেওয়া নিয়ে বসাকে যদি দোকান বলা যায়! ঝুড়িগুলোর চারদিকে চারটি লোহার শিক পুঁতে তার উপরে কাপড় দিয়ে ছোটো একটা সামিয়ানার ভাব কালক্রমে হয়েছে বটে।

কারো কারো ডিটেইলস সম্বন্ধে খুব ঝোঁক থাকে। যেমন আমাদের মুখুজ্জেমশায়। এই বাস-স্ট্যানডে অন্তত চার-পাঁচ বছর পর-পর মুখুজ্জেমশায়ের যাওয়া-আসা আছেই—হিমালয়ে ওঠার পথই তো। গোড়ায় নাকি ডিসপোজালের-খাকি-ট্রাউজারস-পরা মেওয়া ঝোলায় ঠোঙাবাঁধা মুমফুলি, ঝুড়িতে অমরুদ নিয়ে বাসের পাশে ফিরি করতে শুরু করে। তাহলে তা এই বাস-স্ট্যানড হওয়ার এক বছরের মধ্যেই। এখন তো বাস-

স্ট্যানডের বয়স পনেরো বছর। দ্বিতীয় বারে, বছর দশেক আগে, মুখুজ্জেমশায় মেওয়াকে কয়েকটা ঝুড়ি নিয়ে কিতাবমহলের সামনে বসতে দেখেছিল। তখনও সামিয়ানা হয় নি। অর্থাৎ ততখানি পাকাপাকি বসে নি এখনকার মতো। আর সেই দ্বিতীয় বারেই, বছর দশেক আগে, কিতাবমহলের কিতাবকে আবিষ্কার করেছিল মুখুজ্জেমশায়।

সেই বছর দশেক আগে, তখন ফিরি-করা ছেড়ে ঝুড়ি সাজিয়ে কিতাবমহলের কাছে বসা বছর চার-পাঁচ হয়েছে মেওয়ার, এরকম ঘটনা ঘটেছিল। সময়টা সেইরকমই হবে, মেওয়া যখন কিছু দিন সবজে কামিজ আর নীল চাদর ব্যবহার করছিল। বিশেষ অবস্থানের ফলে ঝোড়ো বৃষ্টির ছাঁট বইয়ের দোকানের ভিতরে যাচ্ছিল না বলে তার সামনের পাল্লাগুলো খোলা ছিল। কিতাব তার কাউনটারের উপর দুহাত ছড়িয়ে যেন অবাক হয়ে ঝড়-বৃষ্টি দেখছিল। মেওয়া প্রথমে দোকান ঘেঁষে, পরে একটু সাহস করে দোকানের মেঝেতে উঠে দাঁড়িয়েছিল। প্রায় দু ঘণ্টা সেই দোকানে মাথা বাঁচাল মেওয়া। তখন এরকম কথা হয়েছিল।

—বহোত জল।

—জি, বহোত পানি।

—জি, হাঁ।

বৃষ্টিতে-ভেজা নীল চাদর নামিয়ে চিপে নিয়েছিল মেওয়া ; জলে ভিজে খুব চুলকাতে শুরু করলে পাঁশুটে-খয়রা অনেক চুল পিঠে নেমেছিল।

দেখেছি, মানুষ সাধারণত কথা বলতে ভালোবাসে। দু ঘণ্টা ধরে এই কথা না-বলা? যেন উচ্চারণক্ষমতার কিছু দুর্বলতা থাকা, বোবা না হলেও। বোবা কেন? মেওয়া গাহাকদের সঙ্গে দামদর নিয়ে কথা বলে। কিতাবসাহাবও তাই।

কথা-বলাটা কি চেষ্টাসাপেক্ষ? তোতলামির মতো কিছু? একজনের দোকান আর-এক জনের তিন হাতের মধ্যে হলেও চার-পাঁচ বছরে এই যখন প্রথম কথা হল, তখন দু ঘণ্টায় আর কী বেশি কথা হবে?

তবে একবার কথা হলে পরে কথা-বলার সুবিধা হয়। আগে যে আলাপটা হয়েছিল, তার বছর খানেক পরে, তখন তো ফলের ঝুড়িগুলোর চারপাশে শিক পুঁতে কাপড়ের সামিয়ানা হয়েছে। তা অবশ্য এমন উঁচু নয় যে বইয়ের দোকানের পারসপেকটিব নষ্ট করবে। গ্রীষ্মে বর্ষায় শীতে মেওয়া তার ঝুড়িগুলোর পিছনে—সেগুলোতে আপেল লাল, নারাঙি কমলা, অমরুদ সবুজ। মেওয়া একটা নীচু জলচৌকিতে দু-পা তুলে বসে তার দোকানে, এক হাঁটু উঁচু, অন্যটি পাতা সেই আকাশি-নীল মিলওয়ারের উপর। কিন্তু তখনই লক্ষ্যে আসবে পাথর-মেশানো কর্কশ মাটিতে চলার ফলে সেই পায়ের ধারে ফাটল।

তো, ভয়ংকর সেই রোদ এমন যে কাপড়ের সামিয়ানার নীচে মেওয়া অতিষ্ঠ। কিতাবখানায় উঠে দাঁড়িয়েছিল। তখন সেই কথা হয়েছিল আবার।

—বহোত ধুপ।

—জি, কড়া ধুপ।

—জি, হাঁ।

এমন হতে পারে, মেওয়া নিরক্ষর—সেজন্য সংকুচিত। কিন্তু কিতাব? তাহলে কি সে তোতলা? তা না হলে, এমন হতে পারে কি যে, মনে আবেগ জন্মালে আমাদের যে স্নায়ুগুলো শব্দ উচ্চারণের পেশীকেও সচল করে কোনো আকস্মিক আঘাতে, শেল-শকের মতোই বা—এখন অকেজো! এমন নয় যে গাহাকরা অবিরত এসে ব্যস্ত রাখছে, বরং কিছুদিন থেকে তো তারা কমই। স্টেশনে ঝকঝকে কিতাব আর মেওয়ার সারি-সারি দোকান এখন যেখানে যাত্রীরা সাধারণত ভিড় করে। হালকা চেহারা, কালচে প্যানট আর সাদা জাতের জামা, চোখে চশমা, মাথার চুল হালকা, চল্লিশের, সেরকমই বয়স তখন—কিতাব কাউনটারে হাত ছড়িয়ে, মাথাটা কখনও কাউনটারে নোয়ানো, কখনও পিছনে হেলানো। কেউ কেউ আজন্ম কথা কম বলে থাকে, কিন্তু কিতাবের—সে কিতাবলাল কিংবা কিতাবউদ্দীন হোক—এই নিঃশব্দ, নিঃসঙ্গ চাল থেকে কেমন একটা সন্দেহ হতে থাকেই। মেওয়ার সঙ্গে—তখন তো তার ত্রিশই—অনেকেরই কথা বলার আগ্রহ। এরকম ধারণা আছে—চত্বরের অন্য দোকানগুলোর কাছে বসলে মেওয়ার সঙ্গে বেশি কথা বলার চেষ্টা করে বলেই সে কিতাব-মহলের কাছে বসে।

তা সত্ত্বেও, চার-পাঁচ বছরে জমা দু-বারের এই ডায়ালোগ? নিজের পরিচয়—অন্য কথায়, অতীতকে গোপন করার চেষ্টা কি? মারাত্মক না হোক, কিছু গোপন পাপ বা অপরাধ?

এখানেই মুখুজ্জেমশায়ের গল্পটা আসে। সে নাকি প্রথম বারে কিতাবকে দেখা-মাত্রই চিনতে পেরেছিল। কিন্তু (নামটা নাই বললাম) তা বলে ডাকলেও কিতাব নাকি এমনভাবে চেয়েছিল যেন শুনতে পায় নি। বরং বলেছিল—জি, সাব, বাঙলা কিতাব ভি আছে। মুখুজ্জের ধারণা, কিতাবকে সে অন্য নামে চিনত। আর যাকে সে চিনত সে নাকি কোনো এক গ্রাম্য কলেজের, হোক বা ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা দ্বিতীয় শ্রেণীর, লেকচারার ছিল। আর সে বিষয়ে একটা প্রমাণ নাকি এই যে, সে অন্য উপজীবিকা না নিয়ে বইয়ের দোকান করেছে। মানুষ ছিমমূল হলে নিঃসহায় ভেসে চলতে-চলতে নতুন মাটির ধারণা পেলে পুরনো শিকড় দিয়েই নতুন মাটিকে ছুঁতে চায়। মুখুজ্জেমশায়ের এই তত্ত্ব সত্য হলে, মেওয়া সম্বন্ধে যে গুজে—তাকেও প্রমাণিত মনে হতে পারে। এখান থেকে রেলে চেপে যে প্রথম জংশন স্টেশন, সেখানকার লাহোরি খান মেওয়াওলাদের একজন সে, যে এদিকে অনিচ্ছায় আটকে গিয়েছে, আর সকলে লাহোরে গেলেও —আর সেজন্যই নিঃসঙ্গ, নিঃসহায় হওয়া সত্ত্বেও বাঁচার কথা মনে হতেই মেওয়াকে ছুঁয়েছে।

কিন্তু মুখুজ্জেমশায়ের তত্ত্বকে অপ্রমাণিত করার ঘটনাও আছে। কিতাবের আপনার বলতে একটি ছেলে যার নাম বাওলা বা বাওরা। এই চত্বর হওয়ার পর এই পনেরো বছরে তার বয়েস কুড়ি-বাইশ হল। কিন্তু সে পথে-পথে ঘুরে মানুষ। বইকিতাব-ইস্কুলের মুখ কখনও দেখেছে কি? যখন খবরের কাগজ হকারি না করে, বাস-ট্রাকের ক্লীনার ছোকরাদের সঙ্গে, চায়ের দোকানের ছোকরাদের সঙ্গেই তাকে দেখা যাবে। তাদের সঙ্গেই ওঠা বসা খেলা। মা-মরা বা মা-হারানো ছেলে বলে শাসন নেই? কোথায় গেল তবে কলেজ-লেকচারারের শিক্ষাপ্রীতি? এরকম ক্ষেত্রে কি ছেলের মধ্যে নিজেদের হারানো অতীতের ক্ষতিপূরণ দেখতে ইচ্ছা হয় না? যেন ছেলে কঠিন, শক্ত, মজবুত হলেই হল, ক্লীনারদের সঙ্গে বাস-ট্রাক চালাতে শিখলে, কিংবা পিঠে একমন বোঝা তুলে ট্রেরিসটদের সঙ্গে পাহাড়ে যেতে পারলেই হল! সেরকম জীবনে যে অনুভূতির সূক্ষ্মতা ক্রমশ ভোঁতা হয়, তাতে যে দর্শনের ছোঁয়াচ লাগতে পায় না, তাতে কিছুমাত্র লজ্জা নেই, যা মুখুজ্জেমশায়ের তত্ত্ব অনুসারে থাকা উচিত ছিল। তার তো দোকান আছে, সে তো মা-হারানো ছেলেটাকে (মুখুজ্জেমশায়ের গল্পে সেই হারানোটা মৃত্যুর চাইতে বেশি হাহাকার করে) শখের জিনিস কিনেও দেয়, তাকে কি সে একটা স্কুলেও দিতে পারত না? মুখুজ্জেমশায়ের কথা একমাত্র এই-ভাবেই যথার্থতা পায় যে কিতাব মানুষের সব শিক্ষা-দীক্ষা-ন্যায়নীতিকে মূল্যহীন মনে করে। তাহলে বলতে হয়, তার সেই নীরবতার কারণ শব্দ-উচ্চারণের স্নায়ুগুলোর মরে যাওয়াই।

কিন্তু মুখুজ্জেমশায়ের গল্প বেশ ভালো হলেও আমাদের গল্প নয়। কিতাবমহলে ডাকে এবং রেল-পারশেলে পত্র-পত্রিকা-বই-পুঁথি আসে। সেসব প্যাকেটে পারশেলে পুলিনদায় এরকম চিঠকা থাকে : কিতাব সাহাব, কিতাব-মহল, বাস-স্ট্যানড। যদি ডাকবিভাগের এবং রেলওয়ের পক্ষে এই ঠিকানা যথেষ্ট হয়, বিবেচনা করি, আমাদের গল্পেও তাকে কিতাব—বড়ো জোর কিতাব সাহাব বলাই যথেষ্ট।

তখন বাস-স্ট্যানডের বয়স বছর বারো হবে, এখন থেকে বছর তিনেক আগে। মেওয়ার মেয়ে কাঁদতে-কাঁদতে এসে বাস-স্ট্যানডে কিতাবের ছেলে বাওলাকে খুঁজে বার করল। তেমনি কাঁদতে-কাঁদতেই বলল, মাইয়া, মেরী মাইয়া, মর গয়ী। সময়টা ঠিকই আছে। কারণ মেওয়ার মেয়ে চিনকারি, চিপ্পারি বা চিররির বয়েস তখন পনেরো হবে, বাওলা বিশে। বুদ্ধি নেওয়ার জন্যে বাওলা চিপ্পারিকে নিয়ে কিতাবকে সব বললে। কিতাব অবাক। তখন তো বেশ বেলা—দশটা হবে। কিতাব সেই প্রথম নিজের দোকানের ভিতরে চোখ এনে যেন অবাক হল। ফলের ঝুড়িগুলো তার দোকানের ভিতরেই বটে। আজ মেওয়ার দোকানটা বসেই নি—এই খেয়ালটা হল। (এটাও সময়ের আর-একটা নির্দেশক : এই সময়ে দিনের শেষে ফলের ঝুড়িগুলোকে মাথায় করে নিজের বস্তিতে নিয়ে না-গিয়ে মেওয়া কিতাব-মহলের একপাশে রেখে যেতে শুরু করেছিল। অনুমতি দেয়া-নেয়া নিঃশব্দে হয়ে থাকবে।) কিতাব অবাক হয়ে ভাবল : তা মরে কী করে? তিশ-পঁয়ত্রিশের সুস্থ সবল একজন মানুষ, যে কিছুদিন আগেও একমন ওজনের ফলের ঝুড়িগুলোকে একটার উপর একটাকে বসিয়ে নীচু বস্তিতে নিয়ে যেত নিয়ে আসত, সে কী করে তেমন হবে? সে দোকান

বন্ধ করে বাওলা আর চিপ্পারিকে নিয়ে তখনই মেওয়ার বাসার দিকে রওনা হল।

এটা বিস্ময়ের বা রহস্যের নয় যে মেওয়ার বাসা কিতাবের জানা ছিল। মেওয়া কথা না বলতে পারে, চিপ্পারি নিশ্চয়ই বকবক করে। সে তো দুপুরে কিছুক্ষণ বসেই মেওয়ার দোকানে তখন। কখনও কখনও কাগজের হকারি শেষ করে বাওলাও আসে বইয়ের দোকানে বসতে, তখন চিপ্পারি তার সঙ্গে আলাপও করে। ফলে, নীচু বস্তির কোন গলি দিয়ে কী ভাবে গেলে চিপ্পারিদের বাড়ি যাওয়া যায়, বাড়িটা কী-রকম, বাড়ির সামনে কী গাছ আছে, কিতাব দেখলে মনে-মনে, এসবই সে জানে, যদিও সে জানছে এতটা ক্রমশ, তা সে খেয়াল করে নি।

মেওয়া মরে নি। পকসের জ্বরে বেহুঁশ ছিল। কিতাব বাওলাকে দিয়ে ডাকতার ডাকালে। ডাকতার দেখে মত দিলে, পানিবসন্ত বটে। টাইপটা ভালো নয়—মিশ্রিত। তা ছাড়া, বুকে সর্দি। তখন কিতাব এই ব্যবস্থা করলে যে, চিপ্পারি সে বাড়িতে আর মুহূর্তের জন্যও থাকবে না, বাওলা ওষুধ নিয়ে ফিরলে তার সঙ্গে কিতাবের বাড়িতে চলে যাবে, সেখানেই থাকবে মেওয়া সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত। কিতাব একাই থাকবে মেওয়ার কাছে। এই রাক্ষুসী রোগ থেকে চিপ্পারি আর বাওলাকে বাঁচানো দরকার।

সেই ব্যবস্থাই হয়েছিল। বাওলা আর চিপ্পারি কিতাবের বাড়িতে থাকত, বাওলা ওষুধ-পথ্য দিয়ে যেত কিনে, চিপ্পারি তার সঙ্গে এসে একবার মাকে দেখে যেত। অন্য সময় তো তাকে রান্না করতে হত নিজের আর বাওলার জন্যে, ফলের দোকানে বসতে হত, যেমন বাওলা বসত কিতাব-মহলে।

হুঁশ হলে মেওয়া ভয়ে বিছানার অন্য পাশে সরে যেতে চেষ্টা করলে কিতাব ঝুঁকে পড়ে বলেছিল—সে এসে গেছে। ডাকতার দেখে গেছে। ভয় নেই। তখন সেসব আশ্বাস শুনতে-শুনতে হঠাৎ কান্না পেয়েছিল মেওয়ার। সে হাত বাড়িয়ে কিতাবের হাত ধরে সঙ্গে-সঙ্গে ছেড়ে দিয়েছিল—আমার এই অসুখে আপনাকে ছোঁয়া ভালো হল না। কিতাব বললে, কিছু ত্রুটি নয়। বলে, টুল টেনে নিয়ে বিছানার পাশে বসে পাঙখা দিয়ে বাতাস করতে শুরু করল।

বুকের দোষের জন্যই সারতে পুরো তিন সপ্তাহ লেগে গিয়েছিল। দিন পনেরো পরেই মেওয়া বলেছিল, তখন সে নিজেই বিছানা কামিজ-পাজামা বদলাতে পারে। কিন্তু তা করতে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। কাজেই সব আগের মতো হতে পুরো এক মাস।

কিন্তু সবই কি সহজে আগের মতো হয়? দোকানে বসলেও মেওয়াকে ডাংদারের পরামর্শে দাওয়াই বড়ি-উড়ি খেতে হচ্ছে, মেওয়া খেতে হচ্ছে। দুপুরের রোদ মোটেই সহ্য হচ্ছে না। ডাংদার বলেছে, শীতের আগে শরীর আগের মতো হবে না। মেওয়া দুপুরের সূচনাতে, বাদলার সূচনাতেও কিতাবখানায় উঠে বসে। কিতাব দিমাগের খোঁজ নেয়।

—বহোত ধুপ। এই বলে মেওয়া হাসে এখন।

—জি, হাঁ, বৈঠিয়ে। কিতাব এই বলে মেওয়ার মুখের দিকে তাকায়। পকসের কিছু কিছু দাগ তখনও তামার বোতামের মতো চিবুকে, কপালে, হাতের পিঠে।

তখন শীত এসেছে। কিতাব একদিন বলল, নীচু বস্তির নীচে অল্প-অল্প জমি বিক্রি হচ্ছে।

—তা হচ্ছে, জি, লেকিন জমি যদি কেনা যায়, বাড়ি করার টাকা থাকে না।

—জি, হাঁ।

আর-একদিন দুপুরে, মেওয়া কিতাব-মহলে উঠলে কিতাব বললে, একজন জমি কিনল, আর-একজন বাড়ি করল—এরকম হলে হয়।

মেওয়া দু-তিন দিন ভেবে একদিন বললে, একটা জমি কিনে আধাআধি ভাগে দুখানা সমান মাপের বাড়ি করলে হয়—এ-ভাগে দুখানা ঘর, ও-ভাগে দুখানা।

তখন খুব শীত পড়েছে। মেওয়ার দোকানে সকালেই চিপ্পারি বসল, বাওলা স্টেশনে আখবার-ফিরি শেষ করেই কিতাব-মহলের পাল্লা সরিয়ে দোকান খুলল। মেওয়া আর কিতাব জমি দেখতে গেল।

পাশাপাশি দুটো বাড়ি একটুকরো জমিতে, টিন আর কাঠে তৈরি। বাইরে থেকে দেখতে ইংরেজি 'ই' অক্ষরের মতো একটা বাড়ি বটে। 'ই'-র সেই সংযোজক বাহুতে পাশাপাশি দুখানা ঘর দু-বাড়ির, মাঝে একটা দেয়াল। বাড়ি শেষ হলে কিতাবসাহাব আর মেওয়া বাড়ি দেখতে গিয়েছিল। এত দিন কিতাব একাই দেখত। মেওয়া দেখেশুনে বলেছিল, খুব ভালো। তখন 'ই'-র সেই সংযোজক বাহুর ঘর দুখানা দেখছিল তারা। কিতাব-

সাহাব বললে, এই দেয়ালটা দুই বাড়িরই, আর এই দরোয়াজা খুললে দুটো ঘর এক হয়ে যায়, দরজা দিলে দু বাড়ি আলাইদা।

তখন মাস ছয়েক হয়েছে তাদের এক বাড়িতে থাকা। 'ই'-র বিচ্ছিন্ন বাহু দুটিতে দুখানা ঘর। সেদিকে পুব, আলো বেশি, হাওয়া বেশি। বাওলা আর চিঙ্গারি থাকে। সংযোজক বাহুর পাশাপাশি ঘর দুটো আকারে বড়ো। সে দুটিই কিতাব আর মেওয়ার পছন্দ।

একদিন—তখন রাত দুটো হবে—ঘর দুখানার মাঝের দরজাটা খুলে গেল। কিতাবসাহাব মেওয়ার ঘরে ঢুকতেই, মেওয়ার সাদা বেড়ালটা তার বুকের মধ্যে থেকে উঠে পালাল। তাতেই মেওয়ার ঘুম ভেঙে গেল। মেওয়া উঠে বসতে যাচ্ছিল, কিতাব বললে, ঠিক আছে, ঠিক আছে। মেওয়া কিতাবকে বসতে বলে মেহমানের জন্য কী করবে জানতে চাইল। তখন কিতাব বলেছিল, মেওয়া তাকে এক-কাপ চা কিংবা এক-গ্লাস শরবত খাওয়াতে পারে কিনা। তখন মেওয়াকে উঠতে হল, চা করে আনতে হল। রাত দুটোয় সেই চা খেয়ে কিতাব যখন শুতে গেল আবার, তখন ভোর হচ্ছে।

মাস দুয়েক পরে, কিতাবসাহাব তখনও জেগে, তার তো দোকানে বসা থেকে বইপড়া অভ্যাসও, মেওয়া দুই ঘরের মধ্যেকার দরজা খুলল। মেঝেটা হেঁটে-হেঁটে পার হতে পারল। কিতাব কিছু বলার আগেই বললে, কেমন যেন ফাঁকা, দেয়াল নেই—এমন সব বোধ হচ্ছিল। ধুপ কড়া হলে মেওয়া যেমন কিতাব-মহলে উঠে বসে, তেমন একটা টুল টেনে এনে বসল। বসে থাকল ঘণ্টা দুয়েক। পরে হাসিমুখে বললে, দেয়াল তিনটে ফিরেছে মনে হয়।

এসবের দিন চার-পাঁচ পরে কিতাবসাহাব বাওলাকে দোকানে পাঠিয়ে মেওয়ার বাড়িতে গিয়ে বললে, তাদের ডাংদারের কাছে যাওয়া উচিত বোধ হয়।

ডাংদার তো তাদের পরিচিতই ছিল। দুজনে তার সামনে বসলে কিতাব বললে, রক্তটা পরীক্ষা করাতে চায় সে। দুজনেরই। ডাক্তার জানতে চাইল কী তাদের অসুবিধা, কী রোগ, কেন মিথ্যা পয়সা নষ্ট করবে। মেওয়াকে তো বরং আগের চাইতে ভালোই দেখায়। ভিটামিন যদি খেতে চায় তারা তবে তা খেতে পারে, সেরকম শখও থাকে বটে। বিনা কারণে রক্তপরীক্ষা কেন?

তখন কিতাবসাহাব বললে, সে তার পাশের জেনানাকে সাধি করতে চায়। কিন্তু নিকাহ্ করতে পরস্পরকে অনেক দূর সময় থেকে চিনতে হয়। তার সুযোগ নেই।

ডাংদার হেসে ফেলতে গিয়ে সামলে নিয়ে বলেছিল, সাধির আগে এরকম রক্তপরীক্ষা এদেশে হয় না। কেন সেই পরীক্ষা, তাতে রক্তের কী দোষগুণ দেখা হয়, দুই রক্ত মিশলে কী অবস্থায় পরস্পরের ক্ষতি করে—তা তার জানা নেই। তার জন্য তারা দিল্লী যেতে পারে বরং। সে বরং সেখানকার ডাকতারকে লিখে দিতে পারে।

ডাংদারের চেমবার থেকে বেরিয়ে চলতে-চলতে কিতাবসাহাব থামলে মেওয়া তার পাশে এল। চাদরে মাথা আর মুখের অনেকটা সে ঢেকে নিয়েছিল, তা সত্ত্বেও অবাক হচ্ছে, তার গাল থেকে-থেকে লাল হচ্ছে। কিতাব তখন বলেছিল, তা হলে, প্রথম সুযোগে, মেওয়ার মত হলে, সে দিল্লী যেতে পারে। মেওয়ার কি মত আছে? মেওয়া মুখ লাল করে ভাবতে লাগল। তখন কিতাব জিজ্ঞাসা করলে, দিল্লী কি যাওয়া হবে? মেওয়া আরও কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে বললে, দিন পনেরো দেরি হতে পারে। দিল্লী যেতে নতুন কামিজ বানাতে হয়।

খাকি-হলুদ মিলওয়ার, তেমনি কামিজ, আর লাল দোরুখি। ঝুড়িগুলোতে সেই নানা রঙের ফল, আর তার পিছনে মেওয়া। গালে হাত দিয়ে সে ভাবছে। কাল থেকে বাস চলছে না। কী হবে চলে? ব্রিজ পেরিয়ে দশ মাইল উঠে আর সড়ক নেই। শীতকাল। কিন্তু এমন ঝড়বৃষ্টি কি হয় যা কাল সারারাত হয়েছে? জল নয়—শিলা, বরফ। এখানে হয়তো শিলা, আরও উপরে বরফ—যা বিশ বছরে একবার পড়ে। অন্তত এই বাস-স্ট্যানড তৈরি হওয়ার পর এই পনেরো বছরে এই প্রথম। এখন রোদ, সুন্দর রোদ এখানে। কিন্তু বেগনি পাহাড় আধাআধি, নীল পাহাড় তো মোটেই দেখা যাচ্ছে না। মেঘ কিংবা বরফ কিংবা জলের স্রোত সেখানে। গালে হাত দিয়েই মেওয়াকে ভাবতে হচ্ছে।

সেবার দিল্লী যেতে লেবু-হলুদ কামিজ, সাদা-সফেদ মিলওয়ার আর কাঁচঘাসে সোনালি বোতাম-ছাপা চুর্কারির মতো চাদর করেছিল মেওয়া। কী বড়ো সেই দিল্লী শহর। তিন দিন লেগেছিল কিতাবসাহেবের সেই রক্তপরীক্ষার কাগজপত্র আদায় করতে। সেই বড়ো শহর! সেই গলায় ঘুনটি ঝনঝন বাজে এমন বড়ো-বড়ো ঘোড়ার পিছনে সেই টাঙগা—যাতে মানুষ যেন দোলনার মতো দুলতে থাকে, আর জোরেও ছোটে এমন যে ভয়-ভয় করে। কিতাবসাহাব তো খুশিই। মেওয়া গলা নীচু করে, সংকোচ করে হলেও বলেছিল—তারা তখন তো ফেরার পথে ট্রেনে—একজনের এই পেনট ঢোল্লা-ঢোল্লা, টুরিসটরা সেরকম পরে না, একজনের জামায় অনেক সময় ইসত্রি থাকে না, এখন মেওয়া যদি রান্না করে দুই বাড়ির, তাহলে হয় কিনা। কথা কয়টি বলতে ঘণ্টাখানেক সময় নিয়েছিল। সেই প্রথম একজনের পেনট ঢোল্লা-ঢোল্লা বলতে গিয়ে মেওয়া হেসে ফেলতে পেরেছিল। দিল্লীর ডাংদার সার্টিফিকেট দিতে পুরো একশ নিয়েছিল। ভাবতে মেওয়ার এই ছত্রিশ-সাঁইত্রিশের উঁচু গালও আপেলগুলোর মতো হয়। ডাংদার বলেছিল, সাধির জন্য তেমন রক্তপরীক্ষা দিল্লীতেও বছরে দু-একটাই হয়। ভালো। আগে বাড়ো।

রোদটা যে ঝকঝকে তাতে সন্দেহ নেই। বাস-স্ট্যানডের পিচ-চত্বর শুকিয়ে উঠবে হয়তো, কিন্তু যেমন হয়, শীত দুগুণ হয়েছে।

কিন্তু যে বিকেলে তারা দিল্লী থেকে ফিরেছিল, তারই প্রথম রাতের শেষে মেওয়া এবং কিতাব যার-যার ঘরের জানলা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে দাঁড়াতে গিয়েছিল। বাড়িটার সংযোজক বাহুতে সেই পাশাপাশি জানলা দুটো। ডানদিক আর বাঁদিকের বাহুতে যে দুখানা ঘর, যে ঘর দুটোর মধ্যে ছোটো ঝোপ দু-একটা, কিছু থাম, একটা কুলগাছ যা আগে থেকেই ছিল, যা তারা কাটে নি, সেই ঘর দুখানার বাঁয়েরটিতে চিঙ্গারি আর ডানেরটিতে বাওলা ঘুমোয়। কুলগাছটা বরং চিঙ্গারির ঘরের দিকে ঝুঁকে। কুয়াশা নামতে শুরু করেছে, আর তার মধ্যে হলে যেমন ভিজে-ভিজে আর অনুজ্জ্বল হয়, তেমন চাঁদ-আলো, আর কুলগাছটা যেখানে ছায়া-ছায়া, সেখানে বাওলা আর চিঙ্গারিকে দেখা গেল। তাদের হয়তো মনে ছিল না চারদিন পরে দিল্লী থেকে মেওয়া আর কিতাবসাহাব ফিরেছে। বাওলা চিঙ্গারিকে নিজের বুকে সাপটে নিয়েছে, চিঙ্গারির লম্বা গড়নের রোগা-রোগা হাত দুখানাকে বাওলার পিঠে দেখে বোঝা যায়, সে বাওলাকে সাহায্য করছে।

দু-তিন দিন পরে মেওয়া দোকান থেকে উঠে কিতাবখানায় দাঁড়িয়ে ছিল। তখন দুপুর হবে। ধুপ কড়া। কিতাব বলেছিল, বাওলা আর চিঙ্গারির সাধি দেয়া উচিত।

—জি, হাঁ।

সেদিন কিংবা তার পরদিন বিকালে মেওয়া যখন ঝুড়িগুলিকে কিতাবখানায় তুলছে, দেখতে পেয়েছিল—কিতাব ভাবছে। মেওয়া বলেছিল, কিতাবসাহাব, এত ভাবছ কেন? আবার কি ডাংদারসাহেবের সঙ্গে কথা বলা দরকার?

সমস্যাটা কথা বলার মতোই। কিতাব যদি মেওয়াকে সাধি করে নেয়, বাওলা-চিঙ্গারির সাধি হয় না। মেওয়ার সাধির পরে চিঙ্গারি বাওলার বোন হয়ে যায় না?

দিন পনেরো কি একমাসই ভাবতে গেল। এক সকালে বাস-স্ট্যানডে যাওয়ার সময় হলে মেওয়া দুই-ঘরের ভিতরের দরজা খুলে চা নিয়ে এল। বললে, সেদিন বাওলা আর চিঙ্গারির দোকানে যাওয়া ভালো হবে, কারণ মেওয়া আর কিতাবের ডাংদারের সঙ্গে পরামর্শ করতে যেতে হয়। সেজন্যই সেই অসময়ে চা ছিল।

ডাংদার সব শুনে হেসে ফেলেছিল।

মেওয়া উঠল জলচৌকি থেকে, ফলের ঝুড়িগুলোতে সাদা প্লাসটিকের চাদর ঢাকা দিয়ে সে কিতাবখানায় গেল। গায়ের চাদর খুলে ফেললে। সে হাসল, কিন্তু বরং গম্ভীরই হল তার মুখ। হঠাৎ গরম লাগলে যেমন হাঁ করে নিঃশ্বাস নেওয়া হয় তেমন করলে সে। দোরুখি তাড়াতাড়ি মাথা মাথা থেকে নামাতে চুল খুলে পিঠে পড়েছিল। চুলে এখানে ওখানে বলের মতো ঢিপলি, অযত্নের জট হবে। যদিও অনেক চুলই এখনও।

ডাংদার শুনে বলেছিল, ছেলেমেয়ের সাধি আগে দিয়ে দিলে মিটে যায়। আর অন্য ব্যাপারটা কিছু নয়। একই বাড়িতেই তো থাকে তারা, যদিও দুটো বাড়ি বলা হয়। বড়ি লিখে দেবে সে। কয়েকদিন বাদ দিয়ে মেওয়া তা খেতে থাকলে কোনো গোল থাকবে না। প্রেসক্রিপশানটা ছিল। মাসখানেক বাদে বড়ি কিনে এনেছিল একবোতল। মেওয়া তো জানতই কী সে বড়ি, ডাংদার কখনও বলতে বাকি রাখে না।

আরও মাসখানেক বাদে মেওয়া দুঘরের মাঝের দরজা খুলে কিতাবের ঘরে গিয়ে তার ঘুম ভাঙিয়েছিল। তখন

মাঝরাত। কিতাব বলেছিল উঠে বসে, বড়ি? ওই সেই বড়ি! কয়েকদিন আগে ফেলে দিয়েছি জাহান্নমে।

—জাহান্নমে?

—জি, হাঁ।

—তা হলে?

কিতাব বলেছিল, বাড়ি বানানোর সময়ে যে ভোকিল-সাহেবের সঙ্গে পরামর্শ করেছিল তারা, তার সঙ্গেই পরামর্শ করা যাবে। তাই ভালো হয়। আইনের পরামর্শ। মেওয়ার কি আপত্তি আছে ভোকিলের বাড়ি যেতে তার সঙ্গে?

—জি, নেহি।

মেওয়া কিতাবখানায় দাঁড়িয়ে হাঁপাতে লাগল। হাঁপাতে সে পারেই, তার উঁচু গণ্ডও তো এখনও লাল। আজ আবার খুব ঝগড়া হয়েছে চিণ্গারির সঙ্গে। খুবই, লোকজমানোর মতো ব্যাপার। ভাগ্যে বাস-স্টানডে তখনও লোক কম। মেওয়া বলেছিল, চিণ্গারি যে মেওয়া সাজিয়ে বসেছে, কে কিনবে আজ মেওয়া? তার চাইতে ব্রিজ পর্যন্ত গিয়ে খবর নিলে ভালো ছিল, উপর থেকে যে বাসগুলোর নামার কথা, সেগুলোর কী হয়েছে। কাল বিকেল থেকেই তো ঝড়-জল। উপরে নিশ্চয় তুষার-বরফও পড়েছে। চিণ্গারিও কম যায় না। সেও অকারণে ধমক খেয়ে রাগের মাথায় বলেছিল, মেওয়ার (যাকে কিনা সে মাইয়াই বলছে তখনও) আজকাল বুণ্ধি কমে যাচ্ছে। ভোর সকালেই তো খবর নেয়া হয়েছে ব্রিজের মাইল দশেক উপরে ধসে সড়ক বন্ধ। কোনো বাস আসছে না, কোনো মানুষ আসছে না, কী নতুন খবর পাওয়া যাবে? আর সহ্য করতে না-পেরে মেওয়া চিৎকার করে বলে-ছিল, ছাড় আমার দোকান, ছাড়। কে তোকে বসতে বলেছে ওখানে! তোর জন্য জীবনের সব সুখ ছাড়লাম, আর তুই বলিস বুণ্ধি নাই! শরম নেহি আতী? যারা ব্রিজের উপরে ওই পাহাড়ের পথে তাদের জন্য দুর্ভাবনা করিস না? বেশরমি!

চিণ্গারি উঠে ব্রিজের দিকে চলে গিয়েছে। তা আধ-ঘণ্টা হবে।

তো ভোকিল সব শুনে বলেছিল, কিতাবসাহাবের বুণ্ধিতে ভুল নেই। আগে বাওলা-চিণ্গারির সাথি দিয়ে দিলে, পরে সে অনায়াসে মেওয়াকে সাথি করে নিতে পারে। তাতে কিছু বেআইনি হবে না। এরকম কোনো মামলায় কোনো হাইকোর্টের নাকচ করার নজির নেই।

মেওয়ার এক হাত কিতাবের কাউনটারে ছিল। অন্য হাতে সে সেই কাউনটারকেই চাপড়ালে। যেন হঠাৎ সে অন্ধ হচ্ছে আবার, যেমন তার সেই অসুখের সময়ে হঠাৎ সে আর কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না। সে খাকি পানজাবি কামিজের হাতায় চোখ মুছে নিল।

ভোকিলসাহেবের পরামর্শের কথা মাস তিনেক পরে এক দুপুরে মেওয়া মনে করিয়ে দিয়েছিল। সেদিন প্রথম কিতাব যেন বুড়োদের মতো করে তাকিয়েছিল। পাপ-পুণ্যের কথা সাধুসন্তরাই জানে, দিন কয়েক পরে এরকম বলেছিল কিতাব। জিজ্ঞাসা করেছিল—তাদের সেই সমস্যা নিয়ে ব্রিজের ওপারে যেসব সন্ত-সাধু-সন্ন্যাসী থাকে তাদের কাছে যাওয়া যায়? কিতাব যেতে পারে যদি মেওয়া রাজি হয়।

সেরকম যাওয়া হয়েছিল। এক কুঠিয়ায় তারা এক সন্ন্যাসীকেও পেয়েছিল। সব বলেছিল কিতাব আর শুনে সন্ন্যাসী বলেছিল, মায়ী, তোমার চাদর খোলো। আমি তোমার বেটা। মেওয়া তো আলাপের বিষয়টা পুরোপুরি জানে, শুনছিল, তার মুখ তো লাল হয়ে উঠছে থেকে-থেকে। তো সন্ন্যাসী বলেছিল, ভালো করে দেখো শেষবার আমার মায়ীকে। তুমি তো মহব্বত চাও? প্রেমী আছ তো? তো দেখো। যাকে মহব্বত কর তাকে কেউ পায় না। তার এমন চোখ নেই যেমন মায়ীর; তার এমন কেশ নেই যেমন মায়ীর। কাকে মহব্বত করবে, বেটা? যে কারো মহব্বত মানে না, সে জেনানী নয়।

দু-তিন মাসে কেমন হয়ে গেল কিতাবসাহাব। তার মধ্যে বাওলা আর চিণ্গারির সাথি হয়ে গেল।

আরও দু সাল হয়ে গেল। মেওয়া উপরের ঠোঁট দিয়ে নীচের ঠোঁট সম্পূর্ণ ঢেকে নেয়াতে শব্দ বন্ধ হল, কিন্তু বুক বা পিঠ কিছু একটা ফেটে যাবে এমন দেখাচ্ছে। বাওলার সঙ্গে, চিণ্গারিকেও নিয়ে সে ব্রিজ পার হয়ে এ-কুঠিয়া সে-কুঠিয়ায় খোঁজ করতে-করতে সেই সন্ন্যাসীর প্রায়-ভেঙেপড়া ঝুপড়িতে কিতাবসাহাবকে পেয়েছিল। কিন্তু একবারও কিতাবসাহাব মেওয়ার চোখে চোখ রাখে নি, একবারও মুখের দিকে চায় নি। এখন যদি বাওলা থাকত! কোথায় বাওলার বাস আটকেছে কে জানে? তাকে পাঠানো যেত খোঁজ আনতে। কতদূরে

আর ব্রিজ ছাড়িয়ে, মাইল সাত-আট দূরে। সে নিজে যেতে পারে না, এ তো মেওয়া বোঝেই। সে আবার গেলে হয়তো আরও উপরে চলে যাবে। আর সেজন্যই তো খোঁজখবর নিতে সে চিণ্গারিকে বলেছে। সে খোঁজ নিচ্ছে এটা না জানাই ভালো।

কিন্তু আবার অন্ধকার হল, আবার জল। এ দেখো, আবার এখানেও বরফ-তুলা পড়ছে। মেওয়া বাইরে এল। বাতাসের ঝাপটা আর তাতে ভেসে-আসা বরফ।

চিণ্গারি দৌড়াতে-দৌড়াতে ফিরছে। দারুণ অদ্ভুত একটা শব্দ যা এখন এখানে কেউ আশা করে না।

সে কী করবে ভেবে পেল না। এ কি একটা বাস নাকি? বাসই। দরজা-জানলা বন্ধ, ছাদ থেকে আধগলা তুষার নামছে গা বেয়ে। বাসটা তাদের দোকানের কাছা-কাছি থামল। বরফে-ঢাকা গায়ে বাসের রঙ পর্যন্ত ধরা যায় না।

তারপর ড্রাইভারের দিকের দরজা খুলে লাফিয়ে নামল বাওলা। আর তাকে দেখে চিনতে পেরে জল, শিলা, বরফ—এসব অগ্রাহ্য করে, বাস থেকে যেসব যাত্রী নামছে তাদের অগ্রাহ্য করে, চিণ্গারি তার পুরুষকে দুহাতে বুকে জড়িয়ে ধরল। জড়িয়ে ধরে দাঁড়িয়েই আছে।

মেওয়া হেসে ফেলল। কিন্তু তাকে সরে যেতে হয় না? অপরিচিত যাত্রীদের অগ্রাহ্য করতে পারে, সে দাঁড়িয়ে থাকলে চিণ্গারি লজ্জা পায় না!

মেওয়া কিতাব-দোকানে ঢুকে পড়ল। সে তো তখনও ভালো করে নিঃশ্বাস নিচ্ছে না, কাছে এলে লোকে বুঝবে, সে নিঃশ্বাস নিচ্ছে, বুকটা কাঁপছেই। সে হাসল। মনে-মনে বলল, তোমার দয়া, তোমার দয়া! তা না হলে ও পাগলটা কখনও ধস পার করে ওই বরফঢাকা বাসটাকে চালিয়ে আনতে পারত। নিশ্চয় সে বলতে পারে যেখানে ধস নেমেছে সেখানেই হয়তো বরফঝড়, আর চিণ্গারিকে বলার মতো গল্প তৈরি করতেই পাগলটা সেই পিছলে ধসে ভাঙা পথে এই ভারি বাসটাকে এই ঝড়ে চালিয়ে এনেছে। তোমার দয়া আমার ছেলেমেয়ের উপরে, তাই ওরা নিরাপদ।

কিন্তু কাকে বলবে সে? কিতাবসাহেবের একটা ফোটোও যদি থাকত! তার চোখে জল আসছিল আবার। কিন্তু সে হাসল শব্দ না করে। শব্দ না করে বললে, কেউ বোঝে না কী কষ্ট হতে পারে একজনের। তুমি তো মহা-পুরুষ, সাধু, সন্ত না, আমাদের মতো রক্তমাংসের। বরফে গা ঢেকে গেলে কী কষ্ট, কী কষ্ট!

বস্তুরহস্য এবং জীবনদর্শন

অসীম রায়

তিরিশ দশকের গোড়াতেই বৈজ্ঞানিক মহলে এ প্রশ্ন জেগেছিল যে, পদার্থবিজ্ঞানের জয়যাত্রা কি মানুষকে ভাববাদের দিকে নিয়ে যাচ্ছে? এ প্রশ্ন ওঠবার মূল কারণ : গ্যালিলিও-নিউটনের জগৎ থেকে আইনস্টাইনের রিলেটিভিটির তত্ত্ব এবং কোয়ানটাম মেকানিকসের যে জগৎ, তার মাঝখানে রয়েছে গুণগত পার্থক্য। প্রাক-গ্যালিলিও যুগ থেকেই বিজ্ঞান মানুষের জীবনদর্শনকে প্রভাবিত করেছে। আদিযুগে, কি পাশ্চাত্যে কি প্রাচ্যে, যে বিজ্ঞান এবং জীবনদর্শন মানুষের চিন্তাধারার নানাদিক সমৃদ্ধ করেছে তার মূল নির্ভরভূমি ছিল মানব-অস্তিত্বসঞ্চারী বা অ্যানথ্রোপোমরফিক, অথবা দৃশ্যমান জগৎ ছিল এক অদৃশ্য শক্তি বা আত্মার প্রতীক। বেদে উপনিষদে অগ্নির স্তোত্র, বনস্পতিবন্দনা, পবনদেব-বরুণদেবের স্তুতি শুধু পরবর্তী মধ্যযুগেই সীমাবদ্ধ নয়, শুধু শাস্ত্রীয় জীবাত্মা এবং পরমাত্মার অভিন্নতার আলোচনাতেই নিহিত নয়, মানুষ এবং বস্তুজগতের এই অভিন্নতা গ্রীক কিংবদন্তীর গল্প থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেও কবিদের মনে প্লাবিত ; ওয়ার্ডসওয়ার্থ আর শেলীর ওয়েস্ট উইন্ড বন্দনা, কবির সঙ্গে পশ্চিমা হাওয়ার একাত্মতা ; আমাদের বাঙলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের অজস্র গানে কবিতায় মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির এই ঐক্য-সমন্বয়ের চেষ্টার নির্ভরভূমি এই মানব-অস্তিত্বসঞ্চারী জীবনদর্শন —যা ভাববাদের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য। অর্থাৎ, বস্তুজগতে আমরা যা-কিছু দেখছি তাই সব-কিছু নয়, এমনকি তা আসল চেহারাও নয়—আসল চেহারা বস্তুর ভেতরে যে পরম বস্তু আছে, তার সন্ধান।

প্রাক-নিউটনীয় যুগের এই ভাববাদ পরবর্তী কালে চুরমার হয়ে গিয়েছে বস্তুজগতে প্রকৃতির নিয়মের নতুন নতুন আবিষ্কারে, নান্দনিক ক্ষেত্রে তার গুরুত্ব কিন্তু অসামান্য। মানুষ এবং প্রকৃতির ঐক্য-সমন্বয়ের সাধনা পরম টেকনলজিকাল জগতেও নানাভাবে শিল্পকলায় বিকশিত। কখনও তা অত্যন্ত তির্যকভাবেও দেখা গিয়েছে, যেমন ফ্রানসের শিল্পকলায় পরা-বাস্তববাদী বা সুররিয়ালিস্ত সালভাদর দালির চিত্রকলায় বা, ধরা যাক, আধুনিক জীবনানন্দ দাশের কোনো কোনো কবিতায়। এইসব লেখক-শিল্পী বা চিন্তানায়কেরা যে সব সময়ই অদৃশ্য অব্যক্ত শক্তিকে জারমান ভাববাদের উদ্গাতা কান্ট কিংবা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো লেখক সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের সমার্থক ভেবেছেন, তা নয়। কিন্তু এটা স্পষ্ট, তাঁরা প্রকৃতির নিয়ম এবং মানুষের জীবনের নিয়মের মাঝখানে তাঁদের কল্পনার ঐশ্বর্যে এক সেতু বাঁধবার চেষ্টা করেছেন।

নিউটনের জগৎ থেকে আইনস্টাইন এবং কোয়ানটাম মেকানিকসের জগতে পদার্থবিজ্ঞানের জয়যাত্রায় বস্তুজগৎ সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান যেমন বিরাট দিগন্তে বিস্তৃত হয়, তেমনি বস্তুরহস্য এমনভাবে ঘনীভূত হয়ে ওঠে বিজ্ঞানের জগতে যে, তিরিশ দশকের গোড়ায় অনেক মনীষী নতুনভাবে বিজ্ঞানের দর্শন সম্পর্কে চিন্তা শুরু করেন। পদার্থবিজ্ঞানের জয়যাত্রা মানুষকে এক নতুন ভাববাদ বা অধ্যাত্মবাদের দিকে পথ দেখাচ্ছে—এরকম চিন্তার সূত্রপাত হয় এই সময় থেকেই। জেমস জীনস এবং আরথার স্ট্যানলি এডিংটনের লেখা যেভাবে এই বস্তুরহস্যের ব্যাখ্যা দেয়, পরবর্তী পদার্থবিদদের অনেকে সে ব্যাখ্যার সঙ্গে একমত না হলেও, এটা স্পষ্ট যে, কার্যকারণে আবদ্ধ যান্ত্রিক জগতের নিয়মে দৃশ্যমান সমস্ত বস্তুর ব্যাখ্যা প্রায় স্বতঃসিদ্ধ বলে চিহ্নিত ছিল —যেখানে অঘটন ঘটবার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নেই, যে নিউটনীয় বস্তুবাদের নিয়মের নিগড়ে বাঁধা ভুবনে ইনজিনিয়ারিঙ এবং টেকনলজির জগতে বিপ্লব সাধিত হল, সেই নিয়মের ভুবনের পাশাপাশি—ঠিক ভেঙে নয়, —আর-এক নিয়মের ভুবন তৈরি হল।

এই যান্ত্রিক এবং অযান্ত্রিক (মেকানিকাল এবং নন-মেকানিকাল)—দুই জগতের পার্থক্য সংক্ষেপে দাঁড়ায় এইরকম : নিউটনীয় জগতে আমরা দৈনন্দিন জগতের দৃশ্যমান বস্তুর গতিনির্ণয়ে অভ্যস্ত—যতক্ষণ আমরা আমাদের প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতায় সেইসব চলমান বস্তুর ভেলসিটি বা দ্রুত সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। এইসব বস্তুর সঙ্গে একাত্ম হাতুড়ি সাঁড়াশি প্রভৃতি সাধারণ টুল বা যন্ত্রপাতি, এবং স্টীম ইনজিন, মোটরগাড়ি, এরোপ্লেন ইত্যাদি ব্যবহারিক জগতের নানাপ্রকার যানবাহন তথা অন্যান্য মেশিন। নিউটনীয় জগতে এই আশা পোষণ করা হত যে, কালক্রমে এই একই যান্ত্রিক নিয়মের ইকুয়েশন বা সমীকরণে জানা সম্ভব হবে ক্ষুদ্রতম পরমাণু অথবা আয়নের কিংবা সৌরজগতের গ্রহনক্ষত্রের গতিপ্রকৃতি—যাদের দ্রুতি বা ভেলসিটি স্বেচ্ছাচারী কিংবা যান্ত্রিক নিয়মের বাইরে। অর্থাৎ, এই বিশ্বাস ছিল, প্রকৃতির ক্ষুদ্রতম এবং বৃহত্তম সমস্ত বস্তুরই গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে সেই আইনই খাটবে যে আইনের দ্বারা পরিচালিত গড়পরতা সাধারণ ভেলসিটি-বা দ্রুতি-সম্পন্ন বস্তু (বডিজ অব অ্যাভারেজ সাইজ উইথ মডারেট ভেলসিটিজ)। এই বিশ্বাস প্রবলভাবে চোট খায় বিংশ শতাব্দীর পদার্থবিজ্ঞানের অগ্রগতিতে। এখন আমরা জানি যে, আলোর ভেলসিটির সমতুল্য যেসব বস্তুর ভেলসিটি, তাদের কেবল আইনস্টাইনের রিলেটিভিটি থিয়োরি মারফত জানা সম্ভব, যেমন জানা সম্ভব পরমাণুর গতিপ্রকৃতি কোয়ানটাম এবং ওয়েভ (তরংগ) মেকানিকসের সহায়তায়।

এইসব ব্যাখ্যার ভিত্তি দৈনন্দিন অভিজ্ঞতাপ্রসূত বা এমপিরিকাল নয়, এগুলি বেশির-ভাগ ক্ষেত্রেই বিমূর্ত হয়েছে অঙ্কভাবনা থেকে, অঙ্কের সিমবলে এই দুর্নিরীক্ষ্য জগৎ ধরা পড়েছে, যা সবচেয়ে শক্তিশালী মাইক্রোস্কোপেও ধরা পড়ে না। এই অঙ্কভাবনা বিজ্ঞানের ফলিত রূপের চেয়ে এক স্বতন্ত্র বিশিষ্ট মর্যাদা লাভ করে। এর চমৎকার ব্যাখ্যা পাওয়া যায় জেমস জীনসের ১৯৩০ সালে প্রকাশিত বইতে :

Today there is a wide measure of agreement which on the physical side of science approaches almost to unanimity, that the stream of knowledge is heading towards a non-mechanical reality; the universe begins to look like a great thought than like a great machine. Mind does not appear to be an accidental intruder into the realm of matter.

তাহলে কি আমরা এক নতুন ভাববাদের দিকে ধাবিত হচ্ছি? অন্তত এই বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী তথা পদার্থবিদের এই চিন্তাই মাথায় এসেছিল। তাঁর মতে, কাছাকাছি যেসব পূর্বসূরী, তাঁদের ইনজিনীয়রিঙ পদ্ধতিতে প্রকৃতিব্যাখ্যা একেবারেই অপ্রতুল, অন্যদিকে 'শুদ্ধ অঙ্ক' বা পিয়ের ম্যাথামেটিকস দিয়ে প্রকৃতিব্যাখ্যা 'রিলিয়ানটলি সাকসেসফুল'। জীনস এখানেই থামেন না। নিউটনীয় মেকানিকসের বদলে পদার্থবিজ্ঞানীদের নতুন অঙ্কভাবনায় তিনি আধ্যাত্মিক পথের সন্ধান পান। সৃষ্টি যদি এই অঙ্কভাবনাদ্বারা পরিচালিত তথা নিয়ন্ত্রিত, তবে এই সৃষ্টির যিনি কর্তা, তিনিও নিশ্চয়

এক মহান গণিতজ্ঞ, যাঁর কাজের ফলে এই সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে।

আরথার স্ট্যানলি এডিংটনের বই 'দ্য নেচার অব দ্য ফিজিক্যাল ওয়ার্ল্ড' এই পথ নির্দেশ করে। জীনসের মতোই এডিংটন বিশ্বাস করেন যে, এই নতুন পথের নির্দেশ প্রমাণসাপেক্ষ নয়, তর্কের ব্যাপার নয়, বিশ্বাসের ব্যাপার। এই ভাববাদী চিন্তাধারা, তাঁদের মতে (যেখানে সৃষ্টিকর্তাই এক মহান গণিতজ্ঞ), প্রমাণ করা সম্ভব নয়।

হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান এবং দর্শনের অধ্যাপক ফিলিপ ফ্রাঙ্ক জীনস-এডিংটনের এই প্রতিপাদ্যের প্রবল বিরোধিতা করেন তাঁর 'মডারন সায়েন্স অ্যান্ড ইটস ফিলসফি' গ্রন্থে। এই প্রবল যুক্তিবাদী লেখকের মতে, মেকানিকাল এবং নন-মেকানিকালের পার্থক্য এত স্পষ্ট নির্দিষ্ট করা যায় না। নিউটনীয় পদার্থবিজ্ঞান সমস্ত ঘটনাই নির্ধারণ করে বস্তুমাত্রার গতির সমীকরণে ; আইনস্টাইনের মেকানিকস কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই সমীকরণ পালটে দেয় অত্যন্ত উচ্চ দ্রুতি বা ভেলসিটির ক্ষেত্রে এমনভাবে যাতে প্রমাণিত যে এই সমীকরণের গাণিতিক রূপ এবং ভূগোলকের কার্ভড স্পেসের নন-ইউক্লিডিয়ান গাণিতিক রূপ এক। অর্থাৎ ফ্রাঙ্কের মতে, এক সমীকরণপ্রণালী বা সিসটেমের বদলে আর-এক সমীকরণপ্রণালীর প্রবর্তন, তাহলে একটা প্রণালীকে মেকানিকাল বা মেকানিস্টিক এবং আর-একটা প্রণালীকে ম্যাথমেটিকাল বা নন-মেকানিকাল আখ্যা দেওয়া কি সম্ভব? নিউটনীয় অঙ্কভাবনার বদলে এসেছে আইনস্টাইনের রিলেটিভিটি এবং কোয়ানটাম থিয়োরির অঙ্কভাবনা। কাজেই, নিউটনীয় পদার্থবিজ্ঞান মেকানিস্টিক ও বস্তুবাদী, এবং আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান আঙ্কিক, নন-মেকানিকাল, ও ভাববাদী—এই দুটি স্পষ্ট জগৎ ছকে দেওয়া যায় না।

এ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকদের যাত্রাপথ প্রদর্শিত করলে এ কথাটা ক্রমশ স্পষ্ট হতে থাকে—যত নতুনভাবে বস্তুর আবরণ উন্মোচন করেন বৈজ্ঞানিক, যতবার বস্তুরহস্য ভেদ করে নতুন প্রস্তাবনা এবং সিদ্ধান্তে আসেন, ততই রহস্য হয় আরও ঘনীভূত, এক আবরণ উন্মোচনের পরে দেখা যায় আরও আবরণ। রোমাঞ্চকাহিনীর মতো রোমাঞ্চের মূলসূত্র উদ্ঘাটিত হবার পরও আবার নতুন রোমাঞ্চ এসে পথরোধ করে দাঁড়ায়।

কার্যকারণের সূত্রে বাঁধা নিউটনীয় জগৎ—সেখানে সবকিছু এক্সপেরিমেনট দ্বারা অব্যর্থভাবে প্রমাণিত ; সেই নির্দিষ্ট জগৎ থেকে অনির্দিষ্ট রহস্যঘনীভূত অঙ্কের জগতে সর্বপ্রথম পদক্ষেপ সম্ভবত ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে মাকস প্লাঙ্কের কোয়ানটাম থিয়োরিতে। গত শতাব্দী থেকেই চেষ্টা চলেছিল প্রদীপ্ত এনারজির বিচ্ছুরণের বা র‍্যাডিয়েশনের গতিপথ নির্ণয়। প্লাঙ্ক তাঁর ইকুয়েশান বা সমীকরণের মারফত প্রমাণ করলেন যে, প্রদীপ্ত এনারজির গতিপথ অবিরল নয়, তা বিচ্ছিন্ন বিভক্ত অংশে বা কোয়ানটায় বিচ্ছুরিত। তখনও, এবং এখনও, এই এনারজি-বিচ্ছুরণ বা র‍্যাডিয়েশনের কার্যকারণ বা মেকানিজম দুর্জ্ঞেয়। কিন্তু প্লাঙ্ক এই সমীকরণে নির্দিষ্ট করলেন প্রত্যেক কোয়ানটা বা এনারজি বিচ্ছুরণের অংশ অর্থাৎ E=hv যেখানে v স্পন্দনের দ্রুততা বা ফ্রিকোয়েনসি এবং h হল প্লাঙ্ক-আবিষ্কৃত ধ্রুব বা কনস্ট্যানট। দেখা গেছে, প্রত্যেক র‍্যাডিয়েশন বা বিচ্ছুরণে বিচ্ছুরিত এনারজিকে স্পন্দনের দ্রুততা বা ফ্রিকোয়েনসি দিয়ে ভাগ করলেই পাওয়া যাবে এই অতি ক্ষুদ্র কিন্তু অপরিবর্তনীয় সংখ্যাটি, অর্থাৎ সেই h বা প্লাঙ্কের কনস্ট্যানট। সারা বিংশ শতাব্দী ধরে আণবিক গবেষণা নির্দেশিত হয়েছে প্লাঙ্কের এই কনস্ট্যানটের সাহায্যে, কিন্তু এর মাত্রার ব্যাখ্যা আজও সম্ভব নয়—যেমন আলোর গতিমাত্রার ব্যাখ্যাও অসম্ভব। আরথার এডিংটনের মতে, যা সত্যই প্রকৃতির নিয়ম তা যুক্তিচালিত মানুষের কাছে অযৌক্তিক বা ইর‍্যাশানাল। প্লাঙ্কের h তেমনি এক সত্য প্রাকৃতিক নিয়ম যা ব্যাখ্যার অতীত।

প্লাঙ্কের এই আন্দাজ কত সুদূরপ্রসারী, পাঁচ বছর যেতে না-যেতেই টের পাওয়া গেল। ১৯০৫ সালে তাঁর ফোটো-ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে ব্যবহার করলেন এই কোয়ানটাম তত্ত্ব অ্যালবার্ট আইনস্টাইন। ধাতব প্লেটে যখন আলো পড়ে, তখন ইলেকট্রনের ঝরনা বিচ্ছুরিত হয়। এই ঘটনার ব্যাখ্যা মেলে না সাবেকি আলোকের তরঙ্গ-তত্ত্বে। আইনস্টাইন বললেন, আলো অবিরল ধারায় প্রবাহিত এনারজি নয়, তা তৈরি হয়েছে বিচ্ছিন্ন বিশিষ্ট কণার কুণ্ডলী দিয়ে ; এই কণার কুণ্ডলীর নাম ফোটন।

যখন ইলেকট্রন আঘাত করে তখনই এই ঝরনা বয়ে যায়। এই ফোটো-ইলেকট্রিক নিয়ম থেকেই পরবর্তী কালে টেলিভিশনের জন্ম।

এই ফোটো-ইলেকট্রিক তত্ত্বের কয়েকটি ধারাবাহিক আঙ্কিক সমীকরণ—যার জন্য আইনস্টাইন নোবেল প্রাইজ পান—তার ফলে কিন্তু রহস্য আরো ঘনীভূত হয়। এখন আর অবিশ্বাস্য নয় যে, ম্যাটার বা বস্তু শেষ পর্যন্ত অণু বা অ্যাটমে তৈরি যে-অ্যাটমের ইট কাঠ হল ইলেকট্রন নিউট্রন প্রোটন। কিন্তু আইনস্টাইনের তত্ত্বে প্রমাণিত যে, আলোও বিশ্লিষ্ট বিচ্ছিন্ন কণার সমষ্টি, তা ধাক্কা দেয় প্রচলিত তরঙ্গতত্ত্বকে যার মতে আলো কেবল তরঙ্গের সমষ্টি। আলো কি তরঙ্গ, না কণা—এর উত্তর আমরা পেয়ে যাই—তারা দুই-ই। আলোর এই দ্বৈতরূপ সৃষ্টিরহস্য আবার নতুন করে প্রমাণিত করে।

তরঙ্গ আর কণার যে দ্বৈত বস্তুসত্তা, তার আর-এক রূপ আমরা পাই ১৯২৫-এ ফরাসি পদার্থবিজ্ঞানী লুই দ্য ব্রগলির তত্ত্বে, যার ফলে ইলেকট্রন বিশ্লিষ্ট কণার সমষ্টি নয়, তা এক তরঙ্গের সিসটেম ; বস্তুতরঙ্গে বা ম্যাটার ওয়েভসে বিশ্ব দুলছে, কারণ ইলেকট্রনকে তার বিশ্লিষ্ট কণা-রূপে চিহ্নিত করা মুশকিল—তার মাপ, তার অবস্থান, তার গতির নিয়মকানুন অনির্দিষ্ট, ধামখেয়ালি। জেমস জীনসের ভাষায়, 'ইলেকট্রন কতখানি স্থান জুড়ে আছে একথা বলা অর্থহীন—যেমন অর্থহীন বলা আমাদের ভয়, উদ্বেগ বা অনিশ্চিতি কতখানি স্থান জুড়ে আছে।'

ব্রগলির পরে এই জগজ্জীবকে আরও সমৃদ্ধ করে তোলেন ভিয়েনার তরুণ পদার্থবিজ্ঞানী শ্রয়ডিনজার যিনি কোয়ানটামের সাহায্যে প্রোটন ইলেকট্রনে তরঙ্গের গতিপ্রকৃতির এক নির্দিষ্ট গাণিতিক রূপ দিতে সমর্থ—

তরঙ্গদৈর্ঘ্য বা লামডা=h/mv

এখানে v ইলেকট্রন ভেলসিটি, m ম্যাস এবং h প্লাঙ্ক কনস্ট্যানট। সুতরাং ক্লাক ম্যাক্সওয়েল অণু-পরমাণুকে যে অজর অমর সৃষ্টির ভিত্তিপ্রস্তর-রূপে বর্ণনা করেছিলেন সে ধারণার বদলে অণু-পরমাণুর চেহারা এখন দুলন্ত বৈদ্যুতিক তরঙ্গ ; এক ভাসমত তরঙ্গের বিশ্বে আমরা বাস করি।

এবার বস্তুরহস্যের আবরণ উন্মোচন করলেন জারমান পদার্থবিদ ভেরনার হাইজেনবার্গ। মাকস বর্ণের সাহায্যে তিনি যে গাণিতিক রূপ তৈরি করলেন তা দিয়ে বস্তু বা ম্যাটারকে তরঙ্গ কিংবা কণা দুভাবেই ব্যাখ্যা করা সম্ভব। তাঁরা বললেন, একটি বিশেষ ইলেকট্রনের অবস্থান নিয়ে মাথা ঘামানো মুশকিল, ল্যাবরেটরিতে বৈজ্ঞানিক নিরূপন ইলেকট্রনের ঝরনায়—এক-একটি ঝরনা কোটি কোটি ইলেকট্রন, কাজেই তাদের ম্যাসের গতিপ্রকৃতির যে 'সম্ভাবনাতত্ত্ব' বা লজ অব প্রবেবিলিটি, তাই বিচার্য। সূক্ষ্ম কণিকার গতিপ্রকৃতি কতগুলো সম্ভাব্য রাস্তা ধরে কতগুলো সম্ভাব্য জায়গায় এসে পৌঁছয়। কাজেই এখন বস্তুতরঙ্গ সম্ভাবনাতরঙ্গে রূপান্তরিত—যা প্লাঙ্কের কনস্ট্যানটে ধরা পড়ে।

গত মহাযুদ্ধের আগে পুরো একটি দশক হাইজেনবার্গ বৈজ্ঞানিক জগতে আলোড়ন তোলেন। ১৯২৭ সালে তাঁর পদার্থবিজ্ঞানের বিখ্যাত সূত্র অনির্দিষ্টতাতত্ত্ব বা 'প্রিন্সিপল অব আনসার্টনটি' প্রমাণ করে যে, এই আণবিক জগতে সমস্ত ঘটনার পেছনেই আছে এই অনির্দিষ্টতা যার রহস্য মানুষের সূক্ষ্মতম যন্ত্রের সাহায্যেও উদ্ঘাটন অসম্ভব। ইলেকট্রন-তরঙ্গে একটি বিশেষ ইলেকট্রনের অবস্থান-নির্ণয় অসম্ভব। একঝাঁক ইলেকট্রনের গতিপ্রকৃতি বিচার করে শুধু বলা যায় বিশেষ ইলেকট্রনটির সম্ভাব্য অবস্থান। এই অনির্দিষ্টতাতত্ত্বের ফলে এখন বলা অসম্ভব—কোনো একটি বিশেষ ইলেকট্রন নির্দিষ্টভাবে কোথায় আছে এবং তার গতি কী। সুতরাং তরঙ্গ এবং কণার দ্বৈশাগত কনসেপট নেই ; অঙ্কের বিমূর্ত ভাষায় বৈজ্ঞানিক শুধু বলতে পারেন—বস্তু বা ম্যাটারের গতিপ্রকৃতি কী রকম, কিন্তু তারা কী তা তিনি জানেন না, জানার চেষ্টারও কোনো মানে নেই।

বিজ্ঞান এবং বাস্তবের মাঝখানে যে এই ফারাক তা অনেক বৈজ্ঞানিকের কাছেই চ্যালেনজ হিসেবে আসে। তাঁরা কেউ কেউ মনে করেন, কোয়ানটাম পদার্থবিজ্ঞানের যে গাণিতিক প্রণালী তা সাময়িক, তা পালটাবে। আইনস্টাইন এ প্রসঙ্গে বলেন, 'আমি বিশ্বাস করি না ঈশ্বর পৃথিবী নিয়ে দাবা খেলছেন' (আই ডু নট বিলীভ দ্যাট গড প্লেইজ ডাইস উইথ দি ওয়ার্ল্ড)। বিজ্ঞান শুধু রিপোর্ট করতে পারে যা সে দেখেছে সেটুকু—এই পজিটিভিস্ট দর্শন তিনি মানেন না। তিনি এমন এক বিশ্বে বিশ্বাসী যেখানে সংগতি বা হারমনি আছে, অর্ডার বা

নিয়ম আছে। সেই নিয়ম খুঁজতে তিনি যেমন অণু-পরমাণু সন্ধান করছেন, তেমনি গ্রহনক্ষত্র-সৌরজগতের দিকে দৃষ্টি মেলেছেন—সেখানে স্থানকালের রহস্য আবার আলাদা।

আইনস্টাইনের আত্মিক সংকট এইখানে। তিনি হারমনিতে বিশ্বাস করেন, অণু-পরমাণু থেকে সৌর-জগৎ এক নির্দিষ্ট প্রকৃতির নিয়মে বাঁধা পড়েছে, এবং সেই যোগসূত্র খুঁজবার জন্যে তাঁর আজীবন চেষ্টা। কিন্তু তাঁর কর্মের ফল বেশির-ভাগ ক্ষেত্রেই একেবারে আলাদা। তা যেমন অণু-পরমাণুর প্রকৃতি আরও রহস্যময় করে তোলে, তেমনি সাধারণ পঞ্চেন্দ্রিয়ের নিগড়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা মানুষকে স্থানকাল সম্পর্কে তার দৃশ্যমান জগতের উপলব্ধিকে একেবারে উলটে-পালটে দেয় তার স্পেশাল ও জেনারেল রিলেটিভিটি বা আপেক্ষিক তত্ত্ব। মহান মন্ত্রের মতো, এক দিব্য সংগীতের মতো তাঁর ইকোয়েশান $E=mc^2$ ম্যাটার কিংবা বস্তু সম্পর্কে এক নতুন উপলব্ধি সঞ্চার করে। এনারজি এবং ম্যাটার সমার্থক হয়ে দাঁড়ায়, যার ফলে ম্যাটার বা বস্তুর অসীম অনন্ত প্রাণশক্তি নির্ণয় যেমন তাঁরই সূত্র ধরে অ্যাটম বোমা আর হাইড্রোজেন বোমায় রূপান্তরিত হয়, তেমনি দার্শনিক ক্ষেত্রে বস্তুরহস্যের এই নতুন রূপ বস্তুবাদ (তা ধ্রুপদী ইয়োরোপীয় বা পরবর্তী কালে মার্কসীয় হোক) এবং ভাববাদ আর অধ্যাত্মবাদের সংঘর্ষে (তা বৈদান্তিক-প্লেটনিক হোক বা কানটীয় হোক) নতুন আলোকপাত করে। নবলব্ধ বৈজ্ঞানিক সূত্রগুলি সরা-সরি জীবনদর্শনের সূত্র বলে মানা নিশ্চয়ই সম্ভব নয়, নতুন পজিটিভিস্ট বৈজ্ঞানিকেরাও তা মোটেই বলেন না, অথবা এই সূত্র থেকে ঈশ্বরে বিশ্বাস অথবা নিরীশ্বর-বাদ—এই দুই শিবিরে দার্শনিক জগৎকেও ভাগ করা যায় না। তবে এটা নিশ্চিতভাবে বলা যেতে পারে—পদার্থ-বিজ্ঞানের নবলব্ধ জ্ঞান অ্যাটম বোমা আবিষ্কারেই বা আরও নতুন টেকনলজিজগতের যন্ত্রপাতি তৈরি করতেই সাহায্য করে নি, তা আমাদের জীবনবোধকেও অনেকখানি সমৃদ্ধ করেছে। মানুষকে তা অনেক নতুন ভাবনায় ভাবায়।

অণু-পরমাণুর জগৎ থেকে আমরা যখন সৌরজগতে আসি, তখন আধুনিক বিজ্ঞানের সৌরপরিক্রমা বুঝতে ১৮৮১ সালে অনুষ্ঠিত মিচেলসন-মরলের গবেষণা সব-চেয়ে সাহায্য করে। এর আগে সৌরজগৎ সম্বন্ধে যা ধারণা ছিল, তা ছিল নিউটনীয় অনড় স্পেসের ওপর প্রতিষ্ঠিত। গ্রহনক্ষত্রের সমস্ত গতি এই অনড় স্পেসের সম্পর্কে বা ফ্রেম অব রেফারেন্সে নির্ধারিত হত। স্পেসের দৃঢ় বাস্তবতা ছিল নিউটনের চিন্তায়। বৈজ্ঞানিক যুক্তিতে নয়, ধর্মীয় উপলব্ধিতে তিনি এই দৃঢ় বাস্তব স্পেস কল্পনা করেছেন যেখানে ঈশ্বর বিরাজ করেন। পরবর্তী দু-শো বছর ধরে বৈজ্ঞানিকরা এক কাল্পনিক ঈথারসমুদ্রে সমস্ত স্পেস আবৃত বলে চিন্তা করতেন। ফ্যারাডে একটি বিশিষ্ট ঈথার-তত্ত্ব প্রমাণ করেন যা বিদ্যুৎ এবং চৌম্বক শক্তির বাহক, এবং ম্যাকসওয়েল প্রমাণ করলেন—ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক আলোড়নই আলো।

তাহলে গ্রহনক্ষত্রের মাঝখানে এক অদৃশ্য বস্তু, যার মাঝখান দিয়ে আলোর তরঙ্গ প্রবাহিত—এই নিউটনীয় সৌরজগৎ এখনও অটুট। কিন্তু এই অদৃশ্য ঈথার আছে কিনা, তাই এখন মিচেলসন-মরলের প্রতিপাদ্য। নিউটন যেমন নিস্তরঙ্গ সমুদ্রে জাহাজের গতি মেপেছিলেন, সেইভাবে তাঁরা ঈথার-তরঙ্গে আলোর ফলক ফেলে, তাঁদের সূক্ষ্ম যন্ত্রের সাহায্যে প্রমাণ করলেন—ঈথার-তরঙ্গে প্রতিহত হয়ে কিংবা একই দিকে গা ভাসিয়ে আলোর ভেলোসিটি (সেকেনডে ১,৮৬,২৮৪ মাইল) কমছেও না, বাড়ছেও না। তাহলে পৃথিবীর ভেলোসিট কি শূন্য?

বিজ্ঞানের এই সংকটে পথ দেখালেন আইনস্টাইন। তাঁর যুক্তি—পৃথিবীর গতি যা-ই হোক না কেন, আলোর ভেলোসিটি যদি ধ্রুব বা কনস্ট্যান্ট হয়, তাহলে সৌর-জগতের সর্বত্র সূর্যচন্দ্রগ্রহনক্ষত্রের ক্ষেত্রেও আলোর ভেলোসিটি কনস্ট্যান্ট। অর্থাৎ, প্রাকৃতিক নিয়ম সমস্ত চলন্ত বস্তুর ক্ষেত্রেই এক। এই বক্তব্য থেকেই তাঁর সূত্র: ধারাবাহিক গতিতে চলন্ত সমস্ত বস্তুর ক্ষেত্রেই প্রকৃতির নিয়ম এক। এ তত্ত্ব গ্যালিলিওতেও ছিল—যেখানে প্রকৃতির নিয়মের বদলে ছিল যান্ত্রিক নিয়ম বা মেকা-নিকাল লজ। এখন শুধু যান্ত্রিক নিয়মই নয়—যে নিয়মে আলো এবং অন্যান্য ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক শক্তি পরি-চালিত, তাও আইনস্টাইনের বিস্তৃত সূত্রে বাঁধা পড়ল। গ্রহনক্ষত্রসমন্বিত এই সৌরজগৎ প্রচণ্ড অস্থির, কিন্তু তাদের গতি কেবল তাদের পরস্পরের সম্পর্কেই নির্ধারণ করা যায়, কারণ মহাশূন্যে বা স্পেসে কোনো দিক নেই,

সীমানা নেই, কোনো নির্দিষ্ট ফ্রেম অব রেফারেন্স নেই। সাধারণ মানুষকে তাঁর রিলেটিভিটি থিয়োরি বোঝাবার জন্যে সাধারণ অনেক ঘটনা, ট্রেন এবং আলোর ভেল-সিটি, একই সঙ্গে পৃথিবীর নানা অংশে ঘড়ির ব্যবহার, আলোকবর্ষের তাৎপর্য এবং গ্রহনক্ষত্রের আপেক্ষিক গতি-নির্ণয়-দ্বারা তিনি এক চতুর্মাত্রিক স্থানকালসন্ততির (স্পেস-টাইম-কনটিনিউয়াম) প্রস্তাবনা রাখেন—যেখানে ত্রিমাত্রিক স্পেসে আর-একটি মাত্রা যুক্ত হয়, যার নাম কাল। কারণ, ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান সম্বন্ধে মানুষের যা ধারণা, তা তার ইন্দ্রিয়শৃঙ্খলিত ধারণা। এই ঘূর্ণমান দুলন্ত কাল ধরা পড়ে না এই ধারণায়; তা কেবল ধরা সম্ভব অঙ্কের বিমূর্ত রূপে। সেই বিমূর্ত রূপের দ্বারা সেইসব অদৃশ্য শক্তির ব্যাখ্যা সম্ভব, যা এই দ্যুলোক ভূলোক ধরে রাখে, এবং নিয়ন্ত্রণ করে তার প্রকৃতি, তার গতি।

আইনস্টাইন শেষ জীবনে ইউনিভারসাল ফিলড থিয়োরি বা মারফত বিভিন্ন ফিলড বা শক্তিগুলিকে এক সার্বিক সূত্রে গাঁথবার চেষ্টা করেছিলেন, যার ফলে গ্রহ-নক্ষত্র থেকে অণু-পরমাণুর গতি একই আঙ্কিক সমী-করণে বা সূত্রে ধরা পড়ে। তাঁর অসম্পূর্ণ কাজ নিয়ে এখনও নানা দেশের বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে চলেছেন। কিন্তু থিয়োরি-উদ্ঘাটন যদি সম্ভবও হয়, তাহলেও সম্ভবত আগামী শতাব্দীতে আবার নতুনভাবে বস্তু-রহস্যের আবরণ উন্মোচনের চ্যালেনজ গ্রহণ করবেন বিজ্ঞানীরা।

দুই

বস্তুরহস্য যেভাবে গত শতাব্দীর শেষ থেকে উন্মোচিত হয়েছে ধাপে ধাপে, যেসব সূত্র এই রহস্যের চাবিকাঠি খুলেছে, সেগুলি কি শুধু বৈজ্ঞানিক সত্য, তার সঙ্গে কি জীবনসত্যের কোনো যোগাযোগ নেই? অথবা, আরও স্পষ্টভাবে প্রশ্ন তোলা যেতে পারে—বিজ্ঞানের এই দর্শনের সঙ্গে কি জীবনদর্শনের কোনো যোগাযোগ নেই?

বৈজ্ঞানিক আর দার্শনিক তাঁদের নিজস্ব জগতের যুক্তিতে এইরকম স্পষ্ট যোগসূত্র স্থাপনে নিশ্চয় আপত্তি করবেন। সাধারণভাবে অবৈজ্ঞানিকের কাছেও যে কথাটা স্পষ্ট তা হল—ল্যাবরেটরিতে নিমগ্ন বৈজ্ঞানিকের তন্নিষ্ঠ সাধনা জীবনের ক্ষেত্রে অসম্ভব, তার সময়ও অপ্রতুল। জীবনের চারপাশের চাপে তাকে তার 'কমন সেনস' অনুযায়ী ঝটপট সিদ্ধান্ত নিতে হয়; নইলে জীবন আটকে থাকে। তা ছাড়া, ল্যাবরেটরিতে পূর্ব-সূরীদের যে গবেষণার পরম্পরা, সেই বিস্তৃত ক্যান-ভাসের বদলে সাধারণ মানুষের কাছে আরও স্পষ্ট চার-পাশের মানুষের জীবনযাত্রার প্রচলিত ছক—যে ছকটা তার নিজস্ব জীবনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে প্রয়োজ্য, সে সেইটাই গ্রহণ করে। দার্শনিকরাও বিভিন্ন স্কুলে বিভক্ত, এবং তাঁদের জগতের ভাষা এত সূক্ষ্ম, এত স্বয়ং-সম্পূর্ণভাবে তাত্ত্বিক যে চলমান জগতের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সঙ্গে তার আত্মীয়তা অনেক সময়ে অসম্ভব। দার্শনিক জগতের ভাষা সম্পর্কে বিখ্যাত ভাষাতাত্ত্বিক হিব্রুগেনস্টাইনের ট্যাকটেটাসের সমালোচনা ভাষার অপ্রতুলতা সম্পর্কে একদা নতুন আলোকপাত করেছিল। শুধু দর্শনেই নয়, বিজ্ঞানেও ভাষার অসম্পৃক্ততা সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকেরা সচেতন। যেমন, 'অ্যাপারেনট' এবং 'রিয়ল' ধাবিত ইলেকট্রনের অবস্থান সম্পর্কে এ ব্যাখ্যা বৈজ্ঞানিকের কাছে একেবারেই অচল।

এই-সমস্ত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও বস্তুরহস্যের আবরণ-উন্মোচন অবৈজ্ঞানিক মানুষকেও রোমাঞ্চিত করে। বোঝা যায়, আমেরিকায় রিলেটিভিটির ব্যাখ্যা শোনার জন্যে আইনস্টাইনের সভায় কেন সাধারণ মানুষের এত প্রবল মাতামাতি—সেইসব সভায় পাদরিরাও ভিড় করত। অবশ্য, ১৯৪৫ সালে আইনস্টাইনের সূত্র ধরে ইউরে-নিয়ম ভেঙে আণবিক বোমা আবিষ্কার, এবং জাপানে তার ব্যবহারের পর, আণবিক বিজ্ঞানের যে দানবীয় রূপ, সে সম্পর্কে আজ সাধারণ মানুষও সচেতন। বস্তুত, গত প্রায় এক শতাব্দী ধরে বস্তুরহস্য-উন্মোচনের যে রোমাঞ্চকর অভিযান—যে অভিযানে জ্ঞানতপস্বীরা তাঁদের জীবন উৎসর্গ করেছেন, গামা-রশ্মির প্রস্রবণে জর্জরিত মাদাম কুরীর লিউকোমিয়ায় মৃত্যু, এসবই অনাবশ্যক, এমনকি মনুষ্যসভ্যতাবিরোধী বলেও ভাবা যেতে পারে। বিজ্ঞানে সবচেয়ে অগ্রসর দেশগুলিতে বৈজ্ঞানিকেরা কী-রকম কোণঠাসা, সে কথা কোয়ানটাম মেকানিকসে অনির্দিষ্টতাতত্ত্বের জনক ভেরনার হাইজেন-বারগ বলেছেন তাঁর 'ফিজিকস অ্যান্ড ফিলসফি—দা

রেভোলিউশন ইন মডারন সায়েন্স' গ্রন্থে। বৈজ্ঞানিকেরা যদি এই দানবীয় জগৎ থেকে সরে থাকেন, তাহলে তাঁরা নির্বাসিত মানুষের মতো বাস করবেন। ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক, এই আণবিক অস্ত্রের প্রতিযোগিতায় তাঁদের যোগদান অবশ্যম্ভাবী ; যাঁরা তা না করেন, তাঁরাও তাঁদের নিষ্ক্রিয়তার দ্বারা প্রকারান্তরে এই প্রতিযোগিতা জোরদার করেন। যখন সামরিক ক্ষমতাই শক্তির মাপ-কাঠি, তখন কোন দেশ শক্তিশালী তার মাপকাঠি সে আণবিক অস্ত্রাগার গড়েছে কিনা। যারা তা গড়ে নি, তারাও কোনো না কোনো বৃহৎ শক্তির ছত্রছায়ায় নিজেদের রক্ষায় কৃতসংকল্প।

১৯৫৯ সালে লেখা এই গ্রন্থে হাইজেনবার্গ এই আশা প্রকাশ করেন যে, আগামী দু-তিন দশকের মধ্যে হয়তো আণবিক যন্ত্রের করাল ভবিতব্য থেকে মানুষের মুক্তি ঘটতে পারে। কিন্তু এ আশা বাস্তবে রূপ পায় নি। দু দশক পরে সেই করাল ভবিতব্যের ছায়া আরও ঘনীভূত হয়েছে। কোনো কোনো রাজনৈতিক নেতা এখন মনে করেন, বিংশ শতাব্দীই সম্ভবত মনুষ্যসভ্যতার শেষ শতাব্দী ; পশ্চিমের জনৈক সাংবাদিক-গণতকার বই লিখেছেন—আশির দশকই মানুষের শেষ দশক। এই প্রলয়ের ইঙ্গিত একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না যখন দেখি শুধু চীন নয়, পাকিস্তান-ইজরায়েলের মতো ছোটো ছোটো দেশও এই বিধ্বংসী প্রতিযোগিতায় অনেকখানি অগ্রসর। একদিকে সারা দুনিয়ায়, বিশেষ করে সাম্প্রতিক পশ্চিম ইউরোপে অকমিউনিস্ট-কমিউনিস্ট সমস্ত মানুষকেই যেমন উত্তাল করেছে শান্তি আন্দোলন, তেমনি বৃহৎ শক্তিবর্গের আণবিক ধ্বংস-ভাণ্ডার প্রতি বছর আরও সমৃদ্ধ হচ্ছে। তবে, এ আশাও অমূলক নয় যে, পরস্পরের প্রতি প্রেমে নয়, আত্মরক্ষার তাগিদেই আণবিক অস্ত্র জাদুঘরেই সজ্জিত থাকবে, এবং গত এক শতাব্দী জুড়ে বস্তুরহস্য-উন্মোচনের যে নব-নব প্রয়াস, তা মানুষের জীবনদর্শনে আরও প্রতিষ্ঠিত হবে।

হাইজেনবারগ-ভাবিত বিজ্ঞান তথা টেকনলজির জয়যাত্রা ইউরোপ-আমেরিকায় ধারাবাহিকভাবে মানুষের দৈনন্দিন জীবনকে প্রভাবিত এবং সমৃদ্ধ করেছে, কিন্তু এশিয়া-আফ্রিকা-লাতিন আমেরিকার ক্ষেত্রে এই জয়যাত্রা মানুষকে এবং তাদের প্রাচীন ধর্মীয় জীবনযাত্রাকে বড়ো বেশি ওলটপালট করে দিয়েছে। একথা সত্য হলেও সম্ভবত আংশিক সত্য ; গোরুর গাড়ি থেকে জেটপ্লেনের যুগে বস্তু ঘোঁষাঘোঁষি, কিন্তু আমাদের ধারণা—জেটপ্লেন-রকেট বিজ্ঞানের একমাত্র পরিচয় নয়। আধুনিক বস্তু-রহস্য-উদ্ঘাটনপ্রক্রিয়ায় এমন কতগুলো সত্য মানুষের সামনে এসেছে যা বৈজ্ঞানিকভাবে অগ্রসর বা অনগ্রসর সমস্ত মানুষের ক্ষেত্রেই সমানভাবে সত্য।

আধুনিক বিজ্ঞানের, বিশেষ করে আধুনিক পদার্থ-বিজ্ঞানের এই জয়যাত্রা প্রসঙ্গে একটা কথা মনে রাখা দরকার—এখনও বেশির-ভাগ দৃশ্যমান বস্তুর গতি-প্রকৃতিই নিউটনীয় সূত্র অবলম্বনে চালিত। পরবর্তী বিজ্ঞানের ধারা তার উত্তরাধিকারকে স্বীকার করেই এগিয়েছে। জেট-বিমান থেকে মহাকাশে রকেট উৎক্ষেপণের টেকনলজি নিউটনীয় গতির তৃতীয় সূত্র বা থার্ড ল অব মোশন দ্বারা চালিত। আণবিক এবং সৌর-জগতে আলোর ভেলসিটির সমতুল্য বস্তুর গতিপ্রকৃতি নির্ণয়েই কোয়ানটাম মেকানিকস এবং আইনস্টাইনের রিলেটিভিটি-সূত্র।

এই অনির্দিষ্ট দুর্নিরীক্ষ্য বস্তুজগৎ—যা ইন্দ্রিয়-শাসিত মানুষের উপলব্ধির বাইরে, যা কেবল বিমূর্ত অঙ্কভাবনায় ধরা পড়ে, যেখানে কী কোথায় বোঝা অসম্ভব, কেবল তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের ব্যাখ্যাই সম্ভব ; সেখানে ইলেকট্রনের মতো পরমাণুর কোনো ধারাবাহিক গতি নেই, তা কেবল সম্ভাব্য তরঙ্গ, তার উৎক্ষেপে ক্রমিকতা নেই, তার কোনো বিশিষ্টতা নেই, তার অবস্থান কেবল কোয়ানটা বা এক-একটা গুচ্ছেই ধরা পড়ে, সেখানে পদার্থের অবস্থান আর তার গতিপ্রকৃতির কোনো নির্দিষ্টতা নেই, কার্যকারণের সূত্র বা ল অব কজালিটি অচল—সেই দুর্নিরীক্ষ্য, অনির্দিষ্ট এবং সম্ভাবনাপূর্ণ পদার্থের অন্তিত্ব ফিজিকস আর মেটা-ফিজিকসের মাঝখানের পাঁচিল ভেঙে দিয়েছে। একথা অকাট্য যে, বস্তুবাদ-ভাববাদের দ্বন্দ্বের যে বিরাট ইতিহাস শতাব্দীর পর শতাব্দী মানুষকে আলোড়িত করেছে, বিজ্ঞানের নবলব্ধ জ্ঞান তাকে চ্যালেঞ্জ করে। ভাববাদ এবং বস্তুবাদ বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অবিভাজ্য—এ যুক্তির অকাট্যতাও এখন অনস্বীকার্য।

ক্লাসিকাল ভাববাদ আর বস্তুবাদের তাই পুনর্মূল্যায়নের অবকাশ আছে। আদিকালের ভাববাদ, প্লেটো, ভারতীয় বেদান্ত বা আধুনিক কালের কানটে একটি সত্য সার্বিক বলে প্রতিভাত : আমরা যা দেখছি সেই দৃশ্যমান জগৎই আসল বস্তু নয়, তার আড়ালে যে জগৎ তা-ই আসল। এই আসলের ব্যাখ্যায় কেউ বলেছেন মন, কেউ বলেছেন ঈশ্বর। বেদান্তের মায়াবাদ বলে—কারণই আসল, কার্য নাম-মাত্র, এবং এই যুক্তিতে ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা। পদার্থবিদ্যার নবলব্ধ জ্ঞান নিশ্চয় এই বিশ্বকে মায়াপ্রপঞ্চ আখ্যা দিয়ে ব্রহ্মই যে একমাত্র সত্য, তা বলে না। ফিলিপ ফ্রাঙ্কের মতো লজিকাল পজিটিভিস্টদের মতে, নিউটনীয় কার্যকারণের জগৎ মোটেই খারিজ হয় না পদার্থবিজ্ঞানের নবলব্ধ জ্ঞানে। নিউটনীয় জগৎ মেকানিসটিক এবং নতুন পদার্থবিদ্যার জগৎ আঙ্কিক—এ তাঁরা মানেন না। নিউটনীয় জগতের অঙ্ক এখনও শাসন করে মানুষের বেশির-ভাগ দৃশ্যমান বস্তুর গতিপ্রকৃতি —রেলগাড়ি জাহাজ থেকে মহাকাশে উৎক্ষিপ্ত রকেট পর্যন্ত। এঁদের কথা থেকে দুটো কথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত—দুটো জগৎ পাশাপাশিভাবে প্রবাহিত—দুটি সমান্তরাল সূত্রের ধারা যা একসঙ্গে গ্রহণ না করলে বস্তুরহস্যের ব্যাখ্যা অসম্ভব।

এই ভাববাদী এবং বস্তুবাদী ভাবধারার সঙ্গে-সঙ্গে আমরা লক্ষ করি কোনো কোনো দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক আর রাষ্ট্রিক কাঠামোর মিল। ভারতীয় প্রাচীন মায়াবাদের ঐতিহ্যের সঙ্গে তৎকালীন জীবনযাত্রার অবিচ্ছেদ্য রূপ নানাভাবে প্রতীয়মান। পশ্চিম ইউরোপে আর আমেরিকায় নিপট টেকনলজিকাল বস্তুবাদের বিরুদ্ধে ভাববাদী প্রতিবাদ কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিশেষ লক্ষণীয়। রাশিয়ায়, পূর্ব ইউরোপে, চীনে—যেখানে সমাজবাদ প্রতিষ্ঠিত, সেখানে, বলা যেতে পারে, বস্তু-বাদের একটি বিশেষ রূপ—ডায়ালেকটিকাল মেটিরিয়া-লিজম সরকারিভাবে স্বীকৃত এবং আদৃত।

১৯১০ সাল নাগাদ যখন লেনিনের 'মেটিরিয়ালিজম অ্যানড এমপিরিও-ক্রিটিসিজম' লেখা হয়, তখন পদার্থ-বিজ্ঞানের জয়যাত্রার প্রথম অধ্যায় মাত্র রচিত হয়েছে। হেগেল মানুষের চিন্তাধারার তিনটি সূত্র উপস্থাপন করেন, এবং তাঁর মতে যেহেতু সমস্ত বিশ্বই চিন্তা-উদ্ভূত, তাই সচল এবং অচল বিশ্বের সমস্ত বস্তুর ক্ষেত্রেই তিনি এই তিনটি সূত্র প্রয়োগ করেন—বিপরীতের ঐক্য, সংখ্যাগত থেকে গুণগত অবস্থায় উত্তরণ, এবং না-কে না করা (দি ইউনিটি অব অপোজিটস, দ্য ট্র্যান-জিশন ফ্রম কোয়ানটিটি টু কোয়ালিটি, দ্য নেগেশন অব দ্য নেগেশন)। বলা হয়, হেগেল মানুষকে মাথা দিয়ে হাঁটাচ্ছিলেন ; মার্কস-এঙ্গেলস হেগেলকে উলটিয়ে দেন, মানুষকে পা দিয়ে হাঁটান। অর্থাৎ, মার্কস-এঙ্গেলস বস্তু-বাদের এই তিনটি ডায়লেকটিকসের সূত্রকে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করেন—মন থেকে বিশ্ব উদ্ভূত নয়, বিশ্ব উদ্ভূত বস্তু থেকে।

আর্নস্ট মাক তখন ছিলেন লেনিনের প্রতিদ্বন্দ্বী। মাক বিজ্ঞানের থিয়োরির অসারতা প্রমাণে সচেষ্ট ছিলেন। তাঁর মতে, বিজ্ঞানের থিয়োরি হল ঝরা পাতা—গাছকে সাময়িকভাবে নিঃশ্বাস নিতে সাহায্য করে অবলুপ্ত হয়। মাকের বক্তব্যে লেনিন বুর্জোয়া জগতের অবক্ষয় লক্ষ করেন। লেনিন কেন—মার্কস প্লাঙ্কের মতো বৈজ্ঞানিকেরাও সে যুগে মাক-বিরোধী ছিলেন। কিন্তু পর-বর্তী দু-তিন দশকে বস্তুরহস্যের একটার পর একটা দরজা যখন খুলে যেতে থাকে—কোয়ানটাম থিয়োরি, রিলেটিভিটি থিয়োরির ফলে মানুষের ভাবনার দিগন্ত, বিশেষ করে বিজ্ঞানের দর্শন বহু দিকে প্রসারিত হয়—তখনও রুশ তাত্ত্বিকমহলে বিজ্ঞানের দর্শন প্রসঙ্গে লেনিনের প্রতিধ্বনিই শোনা যেতে থাকে। এই প্রসঙ্গে হাইজেনবারগের উক্তি বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করে :

We cannot possibly expect those thinkers who a century ago introduced dialectic materialism to have foreseen the development of quantum theory. Their concepts of matter and reality could not possibly be adapted to the results of the refined experimental technique of our days.

(Physics and Philosophy)

হেগেলীয় ডায়লেকটিকসের মধ্যে অনেকখানি স্থিতিস্থাপকতা আছে ; কোনো নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে সীমাবদ্ধ না থেকে, বিজ্ঞানের পরবর্তী অধ্যায়ের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নতুন পরিকল্পনা বা সে তৈরি করে, তা অভিজ্ঞতাপ্রসূত যুক্তিবাদ বা লজিকাল এমপিরিসিজমের ক্ষেত্রে আজও প্রযোজ্য। কিন্তু ডায়লেকটিক মেটিরিয়া-লিজমে বিজ্ঞানের নবলব্ধ সূত্রগুলির সঙ্গে খাপ খাওয়ার বদলে অকারণ বিতণ্ডা বা পলেমিক ; 'করুণীট', 'অবজেকটিভ'—এই ধরনের কতকগুলি শব্দে আশ্রয়

খোঁজার চেষ্টায় বস্তুরহস্যের অনির্দিষ্টতা-তত্ত্ব ইত্যাদি নবলব্ধ জ্ঞান খণ্ডন করার যুক্তি যথেষ্ট জোরালো নয়। সোভিয়েত রাশিয়া পদার্থবিজ্ঞানে, রসায়নে, জীববিদ্যায় অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে, কিন্তু বিজ্ঞানের দর্শন-ব্যাখ্যায় তাঁরা আঁকড়ে ধরে এক প্রাচীন দর্শন।

বিজ্ঞানের নবলব্ধ জ্ঞান বস্তুবাদ আর ভাববাদের এক ডায়লেকটিক সমন্বয়ের দিকে ইঙ্গিত করে ; পশ্চিম, ইউরোপে আমেরিকায় তার প্রভাব কি খুব পড়েছে? সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রায়, আচরণে কিংবা বিশ্বাসে এই জীবনদর্শনের প্রভাব বিশেষ পড়ে নি—তা ল্যাবরেটরিতেই সীমাবদ্ধ। যার প্রভাব পড়েছে তা হল বিজ্ঞানের বহিরঙ্গ—এক ধরনের যান্ত্রিক প্র্যাগমাটিজম। আইনস্টাইনের স্থানকালসন্ততির চতুর্মাত্রিক জগৎ থেকে নির্বাসিত, ক্যালিফোরনিয়ার অধ্যাপক মারকুস-বর্ণিত একমাত্রিক গ্যাজেটসর্বস্ব এই পশ্চিমা মানুষের আত্মিক হাহাকার আজ নানাভাবে—কখনও তীক্ষ্ণ কখনও তির্যক রূপে—সাহিত্য-শিল্পে জীবনযাত্রায় প্রতিধ্বনিত। প্রতিফলিত অনগ্রসর দেশগুলির গোরুর গাড়ি থেকে জেটপ্লেনে যাবার উল্লম্ফনে। আমরা অনগ্রসর দেশের মানুষ এই অগ্রসর দেশের কাণ্ডকারখানা দেখে হতচকিত। যেমন, এগজিসটেনশিয়ালিস্ট দর্শনে বিশ্বাসী ঔপন্যাসিক আলবেয়ার কামুর 'আউটসাইডার' গ্রন্থে নায়কের যেহেতু কোনো মন নেই, উপলব্ধি নেই, কাজেই খুন করা তার শারীরিক ব্যায়াম মাত্র ; অত্যন্ত শক্তিশালী আমেরিকান লেখক সল বেলোর নায়ক পরিশীলিত মার্জিত উল্লুক—তার কাছে নারী আর টাকা ছাড়া জীবনের কোনো মূল্য নেই। এই যান্ত্রিক প্রাগম্যাটিক বস্তুবাদের তাড়নায় মানুষ আজ কোথায় চলেছে? এ জিজ্ঞাসা আজ অসংগত নয়।

পদার্থবিজ্ঞানের জয়যাত্রা যেমন আমাদের বস্তুবাদ আর ভাববাদের পুনর্মূল্যায়ন সম্বন্ধে ভাবায়, কোয়ানটাম মেকানিকসের অনির্দিষ্টতাতত্ত্ব আর সম্ভাবনাতত্ত্ব, আইনস্টাইনের ম্যাটার আর এনারজির সমার্থ, তাঁর স্থানকাল-সন্ততির চতুর্মাত্রিক কল্পনা যেমন আমাদের বুদ্ধি এবং বোধকে রোমাঞ্চিত করে, তেমনি বিজ্ঞান এবং মানববিদ্যার মাঝখানে যে পাঁচিল ক্রমশ দুর্লঙ্ঘ্য হয়ে উঠছে, আমাদের আধুনিক জীবনের দিগন্ত তার টেকনলজিকাল বৈভব সত্ত্বেও ক্রমশ যেভাবে সংকুচিত করে আনছে—তার একটা সমাধানের পথ দেখাতে পারে।

শিল্প-সাহিত্যের নান্দনিক জগৎ যুগে-যুগেই বস্তুবাদ আর ভাববাদে সমৃদ্ধ হয়েছে। যেমন, সাধারণভাবে ইংরেজি সাহিত্যের আলোচনায় আমরা লক্ষ করি—ঠিক মায়াবাদী অর্থে নয়, কিন্তু দৃশ্যের পেছনেও যা অদৃশ্য, রোমানটিক ভাবনাকে তা সমৃদ্ধ করেছে (শেলীর বহুপ্রচলিত 'দ্য ডিজায়ার অব দ্য মথ ফর দ্য স্টার/অ্যানড ফর দ্য মরো') ; আবার চারপাশের জগৎকে বিশ্লেষণ করার যে জীবনদর্শন, সেই বস্তুবাদের সঞ্চারণ দেখি জিওফ্রে চসারের 'ক্যানটারবেরি টেলস'-এ। বস্তুবাদ আর ভাববাদ কখনও বেণীর মতো একই গ্রন্থে জড়িত—শেকসপিয়রের 'হ্যামলেট' নাটকে কবরখানার দৃশ্যে আর হ্যামলেটের স্বগতোক্তিতে। রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ জীবনে এই দুটোই পাশাপাশি বয়ে চলেছে তাঁর অগণিত কবিতায় গানে এবং গল্পে উপন্যাসে। অর্থাৎ, দৃশ্যমান জগতের পেছনেও অদৃশ্যের অনুধাবন, এবং সঙ্গে-সঙ্গে দৃশ্যমান জগৎকেও খুঁটিয়ে দেখা-বোঝা—এই দুই বিরোধী দৃষ্টিকোণের কখনও সহাবস্থান, কখনও অবিভাজ্য মিলন আমরা বারবার লক্ষ করি।

আমাদের আশা, কিছু রাজনৈতিক নেতা আর সাংবাদিক-গনতকারদের গণনা ব্যর্থ করে, শেষ পর্যন্ত মানুষের শুভবুদ্ধি জয়ী হবে ; ছোটোখাটো যুদ্ধবিগ্রহ সত্ত্বেও বিংশ শতাব্দী একবিংশতিতে শুধু পা-ই রাখবে না ; চিন্তা এবং কর্মের নব নব রূপে সমৃদ্ধ হয়ে অগ্রসর হবে, এবং মানুষের এই জয়যাত্রায় ভাববাদ এবং বস্তুবাদের পুনর্বিন্যাস ঘটবে জীবনদর্শনে। মায়াবাদ আর অদৃষ্টবাদের বেড়াজাল ভেঙে প্রাচীন সভ্যতার বংশধরেরা যেমন বস্তুজগতের কর্তৃত্ব অর্জন করবে বিজ্ঞান-টেকনলজির হাত ধরে, তেমনি যান্ত্রিক প্র্যাগম্যাটিক বস্তুবাদের বিভীষিকা থেকেও মুক্ত হয়ে বস্তুজগতের অনির্দিষ্ট অপার রহস্য সম্পর্কে চেতনায় নতুন শ্রদ্ধা অর্জন করবে পশ্চিমের মানুষ এই আশ্চর্য গ্রহের বস্তুজগৎ সম্পর্কে। বিজ্ঞানের নবলব্ধ জ্ঞানের অঙ্গুলিনির্দেশ এই সমৃদ্ধ জীবনদর্শনের দিকে।

শহর সংস্করণ

শংকর বসু

মাতাডোর দুটিতে মালপত্র তুলে দেওয়ার ব্যাপারে নাদু মিত্তির আর তার ছেলেও বেশ সাহায্য করেছে। আর মালপত্তর তোলার পর হঠাৎ অমল কিছুটা অবকাশ পেয়ে যায়, যখন তার কিছুই করার নেই, যখন সে ভাবছিল : এবার কী করা।

এরপর সে অর্থে ঘটনা তেমন কিছু নেই, অমলের ভাসমান অবস্থার সঙ্গে নিরাপত্তার অভাবের একটি সম্পর্ক ছিল, এতদিনে সেসব ঘুচল। এখন যা সম্ভব তার সবটাই আভ্যন্তর চিত্র, যে আভ্যন্তর থেকে কোনোদিন হয়তো আবার একটি নিষ্ক্রমণও ঘটতে পারে। যেহেতু ওই ব্যাপারে স্পষ্ট কোনো ধারণা নেই, তাই সামনে যা ছিল তা প্রশস্ত অবসর। আর, একজন মানুষ, একটি পরিবার নিজেদের চেষ্টায়, তাদের প্রতিদিনের অস্তিত্বকে অন্তত কিছুটা সমস্যামুক্ত করতে পেরেছে, তা তো একরকম সাফল্যই। হয়তো একদিন, তবু আমাদের এই সাধারণ মানুষটি অনুভব করল : না, এ কোনো সাফল্য নয়, এসবে তার ভূমিকা খুবই নগণ্য। ততদিনে হয়তো ক শহরটি তাকে ছুঁড়ে দিয়েছে অভুক্ত মানুষদের পাঁচিল ডিঙিয়ে শহরের অন্যপ্রান্তে। পরিবারটি হয়েছে সুস্থিত, নিয়মানুগ আর শান্ত। কোনো কোলাহল নেই। অবসর আছে। দ্বিতীয় অংশটি বাহ্যত এই অবসরের কাহিনী, যখন ঘটনা জন্মগ্রহণ করছে অমলের মস্তিষ্কে।

এক

১৯৮২ সালের ১৫ই অগস্ট উইয়ের ঢিপি ভেঙে তারা মুক্ত হয়েছিল। প্রাচীন প্রত্নতাত্ত্বিক কলকাতা থেকে, পরিবারটি হালকাভাবে, চাকায় ভর দিয়ে, উড়ে, বা গড়িয়ে চলেছিল লবণহ্রদের এক কলকাতার দিকে।

ছ জনের ছোট্ট ইউনিটটি চলেছে ফুরফুরে আবহাওয়ায়। গত দু-দিন বৃষ্টি এতটাই ধামসে গিয়েছে যে আজ সত্যি এক মনোরম সকাল। হাওয়ায় হাওয়ায় ভেসে যাওয়া। নরম রোদ, বালক-বালিকার প্যারেড, ড্রাম আর বিউগলের শব্দ, বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, এসব রচনা করে রেখেছে এক উৎসব।

ঊর্মিলা সুভদ্রাকে বলল, 'টুবাইর কিছুই মনে থাকবে না।' অর্থাৎ টুবাইর শৈশবের নিসর্গ আর ভূগোল হয়ে যাবে লবণহ্রদে গড়ে-ওঠা একটি আনকোরা শহর। কিন্তু শরীর ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পরেও যেমন সম্বন্ধ থেকে যায়, যেমন ঊর্মিলা ভুলতে পারে না তার পিতৃবিয়োগ, তেমনি ঊর্মিলা, সুভদ্রা বা অমল কে,

এস. স্ট্রীটের একটি সংকীর্ণ গলি, ভয়ংকর কালীপুজো কোনোদিন ভুলতে পারবে কি?

মাতাডোর সেখানে আর এগোতে পারছিল না, নারকেলডাঙা নর্থ রোডের সেই মুখে ডানহাতি সার-সার লোহালক্করের কারখানা, টিলা বা ঢিপির মতো বস্তি আর কাঁচা নর্দমার দুর্গন্ধ পেরিয়ে, একটি রেলব্রিজ পেরিয়ে পাওয়া যাবে অলৌকিক প্রশস্ত পথ। বাড়ি-বদলের মধ্যে নিবিড় স্বপ্ন কিছু ছিল, কিন্তু যেভাবে এক পরিবর্তনের সূচক বলে ঘটনাটিকে ধরে নেওয়া সম্ভব ছিল, যেহেতু সেই পরিবর্তনে প্রায় কোনো আকস্মিকতা নেই, তাই উৎসবের মেজাজটি বেশ আরোপিত। কেননা, অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম, লটারি, লোনের দরখাস্ত ইত্যাদি ঘিরে একটি দপ্তরে এত বার যেতে হয়েছে, এত কথা ভাবতে হয়েছে, সইসাবুদের এত দীর্ঘ পর্ব ছিল, যে তাদের মধ্যে সংশয় থাকা স্বাভাবিক যে জিনিসটি যেমন আকস্মিক নয়, তেমনি তারা তা সযত্নে গড়ে তোলে নি তিল-তিল করে। ফলে কোনো রোমাঞ্চ নেই। একথা ঠিক—তাদের অর্থ, উৎসাহ আর শ্রম কিছুটা শুষে নিতে পেরেছিল নতুন ইট-সিমেন্ট-কংক্রীট, শেষ পর্যন্ত যা তাদের উপহার দিচ্ছে একটি জ্যামিতিক নকশা। তবু এর পিছনে অফিস আর দপ্তরের ভূমিকাই মুখ্য, এমন কি দপ্তরের ব্লু প্রিন্টে তারা হয়তো কবেই এখানে স্থানান্তরিত হয়েছে, একটি ক্রমিক সংখ্যায় চিহ্নিত হয়েছে।

দুটি মাতাডোরে মালপত্র সমেত পরিবারটি দ্বিখণ্ডিত হয়ে ছিল। প্রথমটিতে যদি খাট, বিছানা, সোফা, চেয়ার, ড্রেসিং টেবিল থেকে থাকে, তো দ্বিতীয়টিতে আছে গ্যাস, ফ্রীজ, কুকার, হাঁড়িকুড়ি, ট্রাঙ্ক, ওয়াড্রব। এইসব মালপত্র লক্ষ করলে একটি বিবর্তন ধরা পড়ে। খুব সাদামাটা গ্রাম্য জীবনযাপনের কিছু চিহ্ন (মাদুর, দু-পুরুষের ট্রাঙ্ক, তালপাতার পাখা ইত্যাদি) আজও তারা বহন করে চলেছে। গ্যাস এবং ফ্রীজ এসেছে মাত্র এক সপ্তাহ আগে। এখন সল্টলেকে তাদের জীবন এই যন্ত্র-দুটির সাহায্যে বেশ সহজ হয়ে উঠবে। সাদা থেকে গাঢ় বাদামি রঙে আরশোলার ক্রমবিবর্তনের ক্ষেত্র হবে না তাদের পরিচ্ছন্ন রান্নাঘরটি। বিধুবালা এ প্রসঙ্গে কেমন ঘাবড়ে গিয়েছিল, 'দু-মিনিটে রান্না হয়ে যাবে, তারপর করবটা কী!! সারাটা দিন!'

ছ-টি প্রাণীকে ঘিরে, কথা, গল্প আর অনুভূতিমালা যদি এরপরও কিছু থেকে থাকে, তাহলে তা দেওয়াল-তোলা কিছু জ্যামিতিক পরিসরেই আছে। বিশেষত, বিধুবালা আর বিমলবাবুর প্রতিদিন, প্রতিমুহূর্ত তো কেটে যাবে এখানেই, যদিও অনুমান করে নেওয়া যায় যে বিমলবাবুর সান্ধ্য-ভ্রমণ আছে। আর, এখানে পরিসর আছে বলেই, তারা প্রত্যেকে আরেকটু স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারে, ভাষা আর ভাবনার অবসরের মধ্যে যে গভীর স্বাধীনতার অস্তিত্ব, সেসবই এখন তাদের নাগালের মধ্যে এসেছে। এইসব কারণে ফ্ল্যাটটি ধরা যাক একটি নিসর্গ, গৃহহীনরা এখানে এসেছে। এই নিসর্গের বর্ণনার কাজটি নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করতে পারত একটি মানচিত্র। যার পর ফ্ল্যাটটি সম্পর্কে বর্ণনার একঘেয়েমির হাত থেকেও নিস্তার পাওয়া যেত, যদিও এই নিসর্গটি অমলদের ক্ষেত্রে স্থায়ী বলে, তাদের কোনো নিস্তার নেই। সে যাই হোক, মানচিত্রটি ভাষায় বিবৃত করলে মোটামুটি এরকম দাঁড়াবে :

সিঁড়ির ডানহাতি দরজা, দরজার বাঁহাতি পরপর দুটি ঘর, মাঝখানে পরিসর রেখে দরজার উলটো দিকে বাথরুম, বাথরুমের পাশে কিচেন। বাঁহাতি দ্বিতীয় ঘরটি থেকে বেরিয়েছে লম্বাধাঁচের আর-একটি ঘর। প্রথম ঘরটি থেকে ওইরকম কোনো ঘর না বেরোলেও প্রশস্ত ব্যালকনি সেই শূন্যস্থান পূরণ করেছে।

মাঝখানে প্রবেশপথ রেখে চারতলা বাড়িটিকে দুটি টুকরো করা হয়েছে। চারতলা পর্যন্ত দুটি টুকরোর দুটি দিক মিলিয়ে মোট ফ্ল্যাটের সংখ্যা চার-চার আটটি। এখানকার পাঁচ হাজার ফ্ল্যাটের ভিতরটি হুবহু অমলদের ফ্ল্যাটের মতো, এও কম আশ্চর্য নয়। মাতাডোর, বিশাল ঝকঝকে রাস্তায়, কৃত্রিম বনের (যেখানে কয়েকটি হরিণ চরছিল) পাশ কাটিয়ে, বাড়িটির সামনে থামলে, প্রথমেই যা নজরে আসে তা হল এখানে দীর্ঘ, টানা দেওয়াল নেই। বাড়িটিতে যে-কটি পরিবারের আসার কথা, তাদের অনেকেই এখনও পর্যন্ত এসে পৌঁছয় নি। গাড়ির ইনজিন বন্ধ হওয়া, আরোহীদের নেমে আসা আর মাল নামানো শুরু হওয়ার পরও, পিচের রাস্তাটিতে কোনো কৌতূহলী মুখ দেখা গেল না, এমনকি একটি শিশুও নয়।

দুই

দু-চার মাসের মধ্যে অমল অনুভব করল আর্থিক-ভারসাম্যে-পৌঁছে-যাওয়া তার পরিচিত বন্ধুজনের মতোই, ঘটনার আকাল তাকেও তাড়া করছে। এবারের ঘটনাহীনতা সংবাদপত্রের বিষয় নয়, ততটা দেশকালের বিষয়ও নয়, বরং তা অনেকখানিই ব্যক্তিজীবনের বিষয়। কফি হাউসের একটি কোনায় অবশ্য জড়ো হচ্ছিল কয়েকজন মানুষ, তারা এমন কিছু বিষয় নিয়ে আলাপ চালাচ্ছে যে বিপ্লবীদের পুনরুজ্জীবন ঘটতে চলেছে এই মর্মে একটি সংবাদ ছিল তার কাছে। যেমন তারা বলছে, 'শুধুই ভেবে-ভেবে যেমন কাজ ভণ্ডুল করে দেওয়া যেতে পারে, তেমনি প্রতিমুহূর্তে কাজের দৃষ্টান্ত দিয়েও কোনো লাভ নেই', 'ক শহরের রাজনীতি আর সাহিত্য নিয়ে এত ভুল গর্ব আছে যে বলার নয়', 'এখানকার বিদ্রোহীরা বাস্তবতা থেকে আগেই পালিয়েছে, গণতন্ত্রী আর শিল্পীরা মহান করে তুলতে চায় প্রতিদিনের কদর্য জীবনকে', 'মৃতের জীবন ছাড়া কিছুই নেই এ শহরে'...

দৃষ্টান্ত বাড়িয়ে লাভ নেই। তবে সমালোচনার ধার সব সময়ই অনেক বেশি থাকে, গভীরতা থাক বা না থাক। এর-তার নাম ধরে নিন্দেমন্দ আড্ডাও বেশিদিন ভালো লাগে না বলে একটু বড়ো পরিপ্রেক্ষিত টানতেই থাকে। অমল এই আড্ডায় তবু যে শেষ পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না, তার কারণ সে কিছু সদর্থক কথা শুনতে আর ভাবতেই আগ্রহ বোধ করছিল। অনেকটা অবসর পেয়ে তার কিছু করতে ইচ্ছে করছে। আর তখন অনুভব করল ওই ঘটনাহীনতা।

বিপ্লবীদের পুনরুজ্জীবনের ঘটনা মফস্বল সহ গ্রামের দিকে ঘটছে বলেই প্রথম-প্রথম শোনা গেল, পরে তা শহরমুখী হতে শুরু করে। যদিও অতীতের মতো এবার তারা শহর আক্রমণের কথা ভাবে নি। সম্ভবত তারা ক শহরের জীর্ণতায় শিউরে উঠেছিল, বিপুল রক্তপাতের সামনে এমন জীর্ণ একটি শহরকে স্বপ্ন হিসাবে উপস্থিত করা যায় না। অন্যদিকে ক্ষমতা দখলের পর শহরটি তাদের কাছে একটি বোঝা হয়ে উঠতে পারে, যেজন্য অতীতচারিতা থেকে বিপ্লবীদের সরে আসতে হচ্ছে।

এইসব গুজব, কল্পনা আর অতিকল্পনার সঙ্গে অমলের এক তো কোনো সম্পর্ক নেই, দ্বিতীয়ত শহরটিতে অনাহার, বঞ্চনা গভীরভাবে থাকায় সর্বদাই বিপ্লবের প্রস্তাব অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। এরকম অনেক কিছুরই এক প্রাসঙ্গিকতা আছে, ফলে ক শহরের যে-কোনো মানুষের বুক হয়ে উঠতে পারে একটি সাদা পরদা যেখানে এইসব ছবির প্রতিফলন ঘটতেই পারে। তবে এ বিষয়ে পরদাটির ভূমিকা যৎসামান্য।

নিজের দিক থেকে সে ভেবে দেখেছে—বাবা-মা-বোনকে নিয়ে পরিবারটির বেঁচে-থাকাকে সুনিশ্চিত করার জন্য তার কিছু ভূমিকা ছিল। একটি পর্যায় পর্যন্ত সে সেই ভূমিকা পালনও করে, তারপর ঊর্মিলা আর সুভদ্রা যোগ দেয়। ক শহরের কিছু পরিকল্পনা সব মিলে পৌঁছে যেতে পারে নিরাপত্তার আশ্রয়ে। তবু এই প্রক্রিয়ার সামগ্রিকতায় অমল ঠিক সেভাবে কিছু সৃষ্টি করে নি। আর এখন তার সামনে, প্রায় অপ্রস্তুত অবস্থায় স্বাধীনতা এতখানি এসে পড়েছে যে অমল এই অপরিচিত ভূখণ্ডে সূক্ষ্ম ভয়কে দেখতে পেল বেশ সক্রিয় অবস্থায়।

পরবর্তী ঘটনা-বিবরণে সেই ভয়ের কিছু-কিছু ছবি নিশ্চিত থাকবে, তবু দু-চার কথায় তার সারমর্ম প্রকাশ করা যেতে পারে।

এক. আর বেশি টাকাকড়ির কোনো প্রয়োজন সে অনুভব করছে না। দুই. অনেক দিনের কিছু-কিছু স্মৃতির ভিত্তিতে যে দু-একটি বন্ধুত্ব প্রবাহিত ছিল, অমলের দিক থেকে তা ক্রমেই শুকিয়ে আসতে থাকে। পুরনো স্কুলের একটি কর্দমাক্ত মাঠ, বাথরুমের দেওয়ালে দু-একটি অশ্লীল কথা, সিগারেট খেতে শেখা, গেজেট দেখা, প্রথম মদ-খাওয়া আর নারী-শরীর সম্পর্কে দু-চার কথার বিনিময়ে এই যে বন্ধুত্ব তা আসলে অমলেরই একটি বাহ্যিক আত্মচরিত মাত্র। এসব ক্ষেত্রে অন্যের উপস্থিতি মুছে ফেলে, ভাঙা স্কুলবাড়ি, রেস্তোরাঁ, মাঠ আর অফিস অনেক বেশি জেগে ওঠে। সে একা হয়ে যায়, যেমন ওই দু-চারজন বন্ধুও একা হয়ে যেতে পারে। পরস্পরের কাছে প্রকাশ না করলেও, তারা জানে যে এভাবে নিঃসঙ্গতাকে ছলনা করা হয়। অমল এখন এই ছলনার ব্যাপারটি সম্পর্কে প্রতিমুহূর্তে দুঃসহভাবে সজাগ, এই যা পার্থক্য। তিন হল তার পারিবারিক অবস্থান। যেহেতু তিন-নমবর ব্যাপারটির

মধ্যে এক আর দুই গাঢ়ভাবে মিশে আছে, তাই আলাদা করে তার উল্লেখের কোনো প্রয়োজন নেই, একমাত্র 'ভালোবাসা' ছাড়া, এরকম একটি ধারণা আর বিশ্বাস তো ক শহরে খুবই প্রচলিত। মানুষ তার সন্তান আর স্ত্রীকে ভালোবাসে, বা স্বামী-স্ত্রী-সন্তান এবং আবার স্বামী-স্ত্রী-সন্তান পর্যন্ত প্রবাহিত হচ্ছে এক চিরায়ত ভালোবাসা—পরিবার তার কাঠামো মাত্র।

বেঁচে-থাকার চেষ্টা করতে-করতে, ভালোবাসার এক-টুকরো জমিকে সুরক্ষিত করার চেষ্টা করতে-করতে এক-দিন সে মরে যাবে, এবং অমল এমন একজন মানুষ যে মৃত্যু-অতিক্রান্ত কোনো জগতের কল্পনা করতে পারে না। যেমন সে মনে করে না তার এই ভালোবাসা এ পৃথিবীতে অত্যন্ত মৌলিক ব্যাপার।

বাইরে ছিল ঝড়বাদলের একটি দুর্দান্ত রাত, অমলের সামনে স্পষ্টই গ্রিলের জানলা, থেকে-থেকে বিদ্যুৎ চমকে জানলাটির ফ্রেম, গ্রিলের নকশা স্পষ্ট হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে ঝলসে উঠছিল কালো আকাশ। সে আকাশের দিকে তাকাতে ভয় পাচ্ছে। আবার চোখ ফিরিয়ে নিতে পারছে না।

ইলোপ করে বিয়ে করাটও বিয়ে করাই, সে রাতে অমলের ঠিক পিছনেই ছিল ওই বিবাহশয্যা। তুলনা-মূলকভাবে আজ সারাদিন একটু বেশি ছুটোছুটি গিয়েছে, তারপর ছিল মৃত এক সুবিশাল অজগরের মতোই দীর্ঘ জ্যাম। ওই জ্যামের কবরে থাকার সময়েই প্রাথমিক অধৈর্য আর বিরক্তি সরিয়ে সে চেষ্টা করেছিল নিজের মনটিকে একটু সক্রিয় করে তুলতে। তার ফল তো হাতে-হাতে পেয়েছে। এখন সে অন্ধকারে ডুবে আছে। জেগে আছে। অনুভব করছে বেঁচে থাকার অন্তিম প্রান্ত—সে বস্তুত অন্তিম প্রান্তে পৌঁছে গিয়েছে যেন। লবণহ্রদের এই বাড়িটি, তার স্ত্রী-পুত্র-মাতাপিতা আর সুভদ্রাকে ছেড়ে সে চলে যাচ্ছে, শেষ হয়ে আসছে। আগামীকাল তার শরীরের উপর থেকে চাদরটি সরানো মাত্র তারা আঁতকে উঠতে পারে, কিন্তু তাতে অকর্মণ্য অমলের কী-ই বা এসে যায়।

সংহত, ভীত, বাচাল আর অন্যমনস্ক একজন মানুষকে, প্রতিদিন একটি-একটি করে কোষের বিনাশের জন্য অপেক্ষা করতে হয়, সে জানে। জানে যে এইভাবে শরীর-মন অসংলগ্ন, বিচ্ছিন্ন হতে-হতে, গলে গিয়ে যে অস্বাভাবিক মৃত্যু, তাকে পৌঁছে যেতে হবে সেই মৃত্যু পর্যন্ত, বা প্রাকৃতিকতাই সেক্ষেত্রে অমলের নিয়তি। তার জাগরণেও এখন যে ঝিমুনির অনুপ্রবেশ ঘটেছে, এই যে ঘুম-ঘুম ভাব, এই অস্পষ্টতা, এসবই মৃত্যুদূত। রাত্রি-কালীন আবহাওয়া কিছুক্ষণ পরই ঝড়বাদল-মুক্ত হল, রাস্তার আলো জ্বলে উঠল বলে উঁচু জায়গাটি থেকে অমল অনেক রাস্তা দেখতে পেল, কয়েকটি বাঁক-সহ রাস্তার পর রাস্তা মিলে মোটা করে আঁকা একটি নকশাও স্পষ্ট এখন। ঝিমুনি ফিরে পেয়েছে অনেক বেশি জোর, অমল নিজে শুরুতে যতখানি সক্রিয় হতে চাইছিল, ভাব-ছিল কিছু একটা করার কথা, তা আর এখন নেই। সে দু-টি পা ফাঁক করে বেশ মজবুতভাবেই দাঁড়িয়ে ছিল, হয়তো একটি পা-ও তুলেছিল, এমন সময় ঝিমুনি তাকে চিত করে দিল। চোট হয়তো লেগেছিল, কিন্তু অসাড় থাকার জন্য অনুভব করতে পারে নি। এখন বুঝল কিছু করতে ভয় শুধু নয়, তেমন গাঢ় আগ্রহও তার নেই। এবং নিজের সম্পর্কে স্বস্তিকর অর্থ তার প্রয়ো-জন ছিল বলেই, সে 'মাঝারি' শব্দটি নাড়াচাড়া করতে লাগল। 'সাধারণ' এই কথাটিকে খুবই কাব্যিক বোধ হল। বেঁচে-থাকার অভিজ্ঞতাকে নিঃশেষিত করে ফেলেছে ভাবতে-ভাবতে উর্মিলার দিকে এগিয়ে গেল। উর্মিলাকে স্পর্শ করল। উর্মিলা ঘুমোচ্ছে, টুবাই ঘুমোচ্ছে। এখন যদি উর্মিলা জেগে থাকত অমল কি খুব কথা বলত, উর্মিলার প্রশংসা করত?—'সত্যি, তুমি না থাকলে', 'উর্মিলা!', 'উর্মিলা!' বলে সে তখন কাকে ডাকত? এই যে মেয়েটি শুয়ে আছে, যার বুকের কাছে একটি শিশু, যা একটি চিত্র, সুন্দর, কিন্তু চিত্র তো বটেই...

তিন

কোনো একটি শহরের কয়েকজন সভ্য মানুষ একটি অনাবিষ্কৃত পাহাড়ি ঝরনার উদ্দেশে রোমাঞ্চকর অভি-যান শুরু করে। ধরে নেওয়া যাক ঝরনাটিতে বা তার উৎসে ছিল দুর্লভ একটি ধাতুর খনি, বা ওইরকম কিছু, এমন কিছু যার জন্য জীবনের ঝুঁকি প্রায় কিছুই নয়। তারপর, চলতে-চলতে, তুষারপাত, ধস আর হিংস্র জন্তুর আক্রমণের মতো কিছু ভয়াবহ ঘটনা ছিল। ইতিমধ্যে তাদের রসদ ফুরিয়ে এসেছে, ভূ-বিদ্যাবিশারদ অভি-যাত্রীটি আর চলতে পারছিলেন না, তিনি ভেঙে পড়েন, অন্যরা ক্ষুধায় জ্বলছে। এরকম কয়েকটি ঘটনায় তারা পরস্পরকে খেতে শুরু করে, এক সময় সম্পূর্ণ দলটি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল, কিন্তু একজন, সব থেকে ধূর্ত, পরি-শ্রমী এবং ততদিনে উন্মাদ, একজনমাত্র মানুষ বেঁচে আছে।

রোমাঞ্চকর অভিযানের এরকম কত ঘটনা গল্প-উপন্যাসই না মানুষ পড়েছে। আজও পড়ে চলেছে। এর মধ্যে ধূর্ত পশুর হিংস্রতা যেন ওত পেতে আছে। এ কি ধারাবাহিকতা থেকে সরে যাওয়ার এক তীব্র, ঝাঁঝালো নেশা নয়? যদিও ধারাবাহিকতা যে কী, কেন, এইসব প্রশ্নও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। আবার আসলে, এ তো ভালো-মন্দের কথা নয়, মানুষের মধ্যে কোনো প্রাচীন বুনো ব্যাপার লুকিয়ে আছে—এরকম এক ধরনের চিরা-য়ত সত্যেরও কথা নয়।

তাহলে কী?

ডালনেস।

আর হিংসার ব্যাপারটা?

এক ধরনের পাগলামি।

সেদিনটি ছিল বড়োই মেঘলা, দূরের রাস্তা, চ্যাপটা গাড়ি আর দ্রুত-সরে-যাওয়া মানুষজনের শরীরেও যেন মেঘ লেগে ছিল। শীতকালীন সন্ধ্যায় অমল একটি রেস্তোরাঁর গোল টেবিলের পাশে বসে, মৃদু আলোয় ভুলে যেতে পেরেছিল মেঘাবৃত শহরটি। রেস্তোরাঁর মৃদু আলো রচনা করে রেখেছে স্বপ্নের পরিবেশ, তার কলিগের নিশ্চিত স্বাধীনতা আছে যে-কোনো বিষয় নিয়ে কথা বলার। তবু তাকে ভাবতে হল এই বিষয়টি প্রধান, না-কি মিতা সরখেলের জীবনেই হিংস্রতার একটি বেদনার্ত পর্যায় আছে, যেমন তাকে একথাও ভাবতে হয়েছে হঠাৎ কেন, মিতা কেন এইসব প্রসঙ্গ আনছে।

মিতাকে দেখতে বেশ, সে বসে ছিল কোমল উদা-সীনতায়, নীল আলো তাকে ফালা করে চলে গেছে। টেবিলের উপর মিতার পশমের ব্যাগটি ছিল কিছুটা যেন পরিত্যক্ত অবস্থায়। মিতা ব্যাগটির কথা শুধু ভুলে গেছে তাই নয়, রেস্তোরাঁর বেতের চেয়ারগুলির দিকে এমনভাবে তাকিয়ে ছিল যেন তন্ময়ভাবে কোনো প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখছে সে। সূর্যাস্ত বা একটি পূর্ণিমার রাতের কথাই মনে হওয়া সম্ভব মিতার প্রায়-অবলুপ্ত-হয়ে-যাওয়া লক্ষ করলে।

আমরা এখানে মাত্র চার বছর হল এসেছি।

এই প্রবাসে?

বলতে পারেন।

হুঁ।

হায়দ্রাবাদে গেছেন কখনও।

না। হায়দ্রাবাদ, না, অমল যায় নি। সে আশা করছিল এরপর মিতা ভিন্ন এক শহরের রূপকথা শোনাবে। জানা যাবে সেখানে দারিদ্র্য নেই, সচ্ছল ও একা মানুষরা ঘুরে বেড়ায় সমদ্রুতীরের বাঁধানো রাস্তায়, যেখানে চুম্বনের দৃশ্যও মিশে যায় প্রাকৃতিকতায়, গোটা শহরটিতে আছে মাদকতা, ইন্দ্রিয়ময়তা। 'জানেন, তবু কী যে বিষণ্ণ লাগত!' মিতা সরখেল এরকম কোনো উপসংহার না-টানলেও, অমলের মনে হচ্ছিল ওই শহরেও এক গভীর বিষণ্ণতা আছে। শহরমাত্রে আছে এই প্রাকৃতিক জীবন, যেখানে পরিবার এবং বন্ধুজন এক সময় জট খুলে, কাচ-পাত্রের মতো ভেঙে, গড়িয়ে, এত টুকরো-টুকরো হয়ে যায় যে দূরের নক্ষত্ররাজির মতোই তাদের সংবন্ধ দেখালেও, আসলে তা এক গভীর ব্যবধান।

কলকাতা বড়ো রক্ষণশীল।

জানেন, বাঙালী শিখতে আমার কী কষ্ট হয়েছে।

সবথেকে অসুবিধে বাঙ্গবীদের প্রশ্নে—

অমলের কিছুই করার নেই, প্রায় কোনো ভূমিকা নেই, যা বলার মিতা সরখেলই বলবে। কিছুক্ষণ ভিন্ন-তার একটা মেজাজ তাকে আকর্ষণ করেছিল, এখন নানা-রকম মন্তব্য, বিচার, মতামত আর বর্ণনা শুনে যেতে হবে তাকে। মিতা সকলের সঙ্গে ক শহরের ভাষায় কথা বলার চেষ্টা করতে গিয়ে খুবই অসুবিধেয় পড়েছিল, শহরটির নাগরিকরা তার সামনে নিজেদের মধ্যে দূরহ বাঙলায় কথা বলেছে, আর মিতার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছে ইংরেজিতে। বাঙালি, আধুনিক মেয়েরাও তার খোলা-মেলা চলাফেরা নিয়ে তির্যক মন্তব্য করেছে। যদিও এখন, এতদিনে সে নিজেকে অভ্যস্ত করে ফেলেছে। এখন আর তেমন সঙ্গকামনা নেই, যেমন কাউকে জিজ্ঞেস করতে হয় না। 'দাদা লাউডন স্ট্রীটে যাব, কত নম্বর?'

বড্ডো বেশি ভিখিরি না?

হ্যাঁ, দারিদ্র্য প্রায় এখানকার নিসর্গ।

কুচ্ছিত, সহ্য করা যায় না।

হুঁ।

আমি সুকান্তর কবিতা পড়েছি।

আচ্ছা।

নাটক দেখেন?

অবশ্যই।

অমৃত বসু অসাধারণ না।

সর্বকালে কলকাতায় এরকম একজন না একজন অসাধারণ অভিনেতা ছিলেন।

তাই।

যেমন ধরুন গিরিশ ঘোষ।

হ্যাঁ, শুনেছি।

এরকম কথা হচ্ছিল, সংস্কৃতি-সমাজ-সংবাদপত্র, নানা মাধ্যমে মিতা আর অমল চেষ্টা করছিল পরস্পরকে সঙ্গ দেওয়ার। অমলের শুরুর দিককার সেই অপ্রস্তুত ভাবটা আর নেই। বরং অনেকক্ষণ কোনো ব্যক্তিগত প্রসঙ্গের অবতারণা না-করে মিতা এই যে কেবল ক শহরটি নিয়েই থেমে-থেমে কথা বলছে, কফিতে চুমুক দিচ্ছে, অমলের দিকে স্পষ্টভাবে তাকাচ্ছে আর এক ধরনের ভালো লাগার প্রতিফলন ঘটতে দিচ্ছিল, সেসবের কেমন জাদুকরি প্রভাব ছিল।

এখানে একা থাকতে বেশ অসুবিধে হয়।

হায়দ্রাবাদে হত না?

না।

কেন?

মিতা কী একটা উত্তর দিয়ে চলল, তাতে অমল হায়দ্রাবাদের কোন বর্ণনা পেল না, এমনকি তার সেখানে একা না-থাকার পেছনে শহরটির আদৌ কোনো ভূমিকা ছিল কিনা, তা-ও বুঝতে পারল না। যদিও সে সময় মিতার কথা বলা, চুল সরিয়ে দেওয়া, টেবলস্লট হাতে ঢেলে নেওয়া আর একটি সিগারেট ধরানোর মধ্যে এমন একটা ভঙ্গি ছিল যাতে বিশ্বাস করতে অসুবিধে হয় না যে সেই শহরটি ছিল অন্যরকম। এবং মিতা শহরটিকে ভালোবাসে। এই গ্রহটিতে যে ওরকম একটি শহর আছে, গ্রহটির পক্ষে তা কম গর্বের বিষয় নয়। আবার মিতা যে গ্রহটিকে ভালোবাসে তা কেবল এই শহরটিকে ভালোবাসে বলেই। যেন এই স্থানিকতা, গোটা পৃথিবীর বিশালত্বে, আলো-অন্ধকারের অকল্পনীয় এক বিশাল ভূখণ্ডের ভয়ংকর ব্যাপারটি মিতার কাছে মধুর হয়ে উঠেছিল, যেন এইটুকুই জীবন, তারপর সব অনিশ্চিত।

ভয় করবে কেন?

এখন তো বেশ লাগে।

সম্ভবত অমল ক শহর সম্পর্কে মিতার অভিজ্ঞতা শুনতে চেয়েছিল। মিতা হাসছে, 'বাহ রে।'

চার

এখানে, কংক্রীটে আছে প্রায় সকল বস্তুর অবয়ব, নিখুঁত এক নকলের জগৎ। গৃহ্য, কুটির, ছাতা আর জাহাজ। আছে দোতলা বাস এবং দেশলাই বাক্স এবং একটি উড়োজাহাজ। হঠাৎ দেখলে মনে হতে পারে ইট, কাঠ, সিমেন্টই তাদের মূল ভাষা, প্রাণ ঢেলে এই ভাষায় তারা এক ব্যাপক নির্মাণকার্য চালিয়েছে। বিশ্রামের জন্য তারা গড়ে তুলেছে একটি আরামঘর, সেখানে স্থাপন করেছে ঢেউ-তোলা কংক্রীটের চেয়ার, প্রতিটি ঘরের মেঝের লেভেল আলাদা-আলাদা, এতে করে শব্দচলাচলে বাধা এসেছে, আছে গ্রিলের জানলায় সবুজ লতাগুল্ম। প্রতিটি বাড়িতে মানুষের সমবেত হওয়ার জন্য আছে বিশাল হল-ঘর, কদাচিৎ এই হলঘরে আলো জ্বালার প্রয়োজন হয়। শয়নগৃহের চওড়া দেওয়াল আর জানলার পর জানলায়, দোতলার ঘর, প্রতি রাতে ভেসে যেতে পারে নীল আলোর স্রোতে, ভাসেও, রাত্রিবাস ভাসে।

উপনগরীটির এই গৃহসৌন্দর্য, এত আশ্চর্য আকার এবং বস্তুর পিছনে যে ইতিহাসটি আছে তা কি গৃহ-হীনের। তারা কি সুদীর্ঘকাল আলো আর অন্ধকারের একটি শহরের রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছে, আশ্রয় পায় নি, কোথাও বিশ্রাম করার সুযোগ ঘটে নি, রাতের পর রাত শুধু জেগে কাটিয়েছে। তারপর একবার লক্ষ্যে পৌঁছতেই মানুষ যা-যা করতে পারে সেসবের এক দৃশ্য-ময়তা রচনা করেছে নিজেদের শয়নগৃহ দিয়ে। সেসব কেমন নিখুঁত মানবিক অভিব্যক্তি আর ব্যক্তিত্ব রচনা করে নিজেরা চলে গেছে সম্পূর্ণ আড়ালে আর শরীর-মনের সমস্ত ক্ষমতা উজাড় করে আস্বাদন করছে স্বস্তি। অথচ গৃহ্য থেকে জাহাজ পর্যন্ত এই যে দৃশ্যের জগৎ, এই প্রত্যক্ষতা কে অস্বীকার করবে।

রঙিন পরদা আর বেডকভার এমন কিছু নয়, বেতের চেয়ার কিছু নয়, যদিও উপনগরীটির নারীরা তাদের আবেগ প্রবাহিত হতে দিচ্ছে ওইসব জিনিসের দিকে। তারা দ্রবময় হয়ে উঠছে। একা বা যখন দু-একজন অতিথি আসে, সব সময়ই ঘর-বারান্দা-সিঁড়ি আর বাথ-রুমে পঁয়ত্রিশ-চল্লিশ বছরের নারীরা কলধ্বনি জাগায় বা উড়তে থাকে। চোখ নিমীলিত, আনন্দময় মিলনের এক অবগাহন সেরে উঠল যেন। পঁয়ত্রিশ-চল্লিশ বছরে কী করে তারা ঋকি হয়ে যাচ্ছে, ভাবতে পারছে আবার চপল হবে। বস্তুত তারা দুর্দান্ত খেলা শিখেছে। অথচ ওই বয়সের পুরুষেরা মৈথুনে চরম উৎসাহী হওয়া সত্ত্বেও অন্য সময় তাদের বার্ধক্য ছাড়া কিছু নেই। শহরের নর-নারীরা যে এতখানি বদলে যেতে পারে, এই উপ-নগরীটিতে না আসলে বোঝা যাবে না।

অতিসাধারণ একজন মানুষ, অমলের মতো মানুষ, অস্থির হয়ে ওঠে। সে আর ঊর্মিলা এখন চূড়ান্ত নিভৃতি নিয়ে কী করবে? এখন, এতদিনে, তারা নিঃশেষিত করে ফেলেছে নিভৃতির প্রয়োজন। একজনের কঠিন বা কালক্ষয়ী, শয্যাশায়ী ব্যাধিতেই একমাত্র এই নিভৃতি প্রাণ পেতে পারে। অন্যথায় তা মৃত। অথচ তাদের কোনো অসুখ হয় নি। বয়স হয়ে যাওয়া কি অসুখ। আর লবণহ্রদের যেসব নারী বয়স-হয়ে-যাওয়া ঠেকিয়েছে, চনমনে শরীর ধরে রেখেছে বলে মনে হয়, তারা তো কাপড় আর গয়নার দোকানের ডামি।

মানুষ কি সব সময় গোমড়া হয়ে বসে থাকবে।

হাই তুলবে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলবে শুধু।

এরকম সামান্য-সামান্য যুক্তিতেই অমল নড়বড়ে হয়ে যায় তবু ঊর্মিলাকে বলতে পারে না, 'তাহলে তুমি কেন...'। কারণ সে তো সত্যি ঊর্মিলার হৃদয় দেখতে পায় না, তারা কেউ কারো হৃদয় দেখে নি কোনোদিন।

বিধবাবালা যে ধরনের অতীতচারী তাতে অতীত সব সময়ই এক স্বর্ণযুগ। সে বলবে তখন হৃদয় ছিল। যেমন সে বলবে, ভবিষ্যৎ শুধুমাত্র বিনাশ। তবু তার বেঁচে থাকতে কোনো অসুবিধে হয় না, অতি দ্রুত সে লিখে নিয়েছে ফ্রঁজ আর গ্যাসের ব্যবহার, এখন তাকে দেখলে মনে হয় না একদিন সে উনুনে কাঠ ঠেসে ধরত, বা কাঁথা সেলাই করেছিল টুবাইর জন্য। উনুন আর কাঁথার গল্প তাই ততখানি গুরুত্ব পাবে না, বরং বিধবাবালার আরও বেশি বয়স হয়েছে। যতই সে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে ভবিষ্যৎ ততটাই মুছে যাচ্ছে, মিলিয়ে যাচ্ছে দিগন্তরেখা। বিধবাবালার মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গে বিধবাবালার পৃথিবীটিও মৃত হয়ে যাবে।

মিতা সরখেলের সঙ্গে অমল নিজের একটি অদ্ভুত মিল আবিষ্কার করেছে। তার কাছেও এই শহরটিই যেন এক অণু-পৃথিবী, শহরটির পৃথিবী হয়ে উঠতে নিসর্গের অভাব তার কাছেও তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। বরং এ যেন নবজাতকের দৃষ্টি, চোখ মেলে যতটুকু দেখতে পেল, দেখল, তা-ই সমগ্র হয়ে ওঠে। সে অর্থে অমল আর মিতারা আজও নবজাতক, হয়তো ঊর্মিলা, সুভদ্রারাও বাদ যাবে না, অমল নিশ্চিত নয়।

'তুমি কি আজ বেরোবে? আজ ছুটি? কখন? ওঠো। যাও। তখন থেকে গড়াচ্ছ! আবার আমাকে আটকানোর চেষ্টা...ভালো হবে না। এতবার চা দিতে পারব না। স্নান করে এসো। ওঠো। কী হল। ধ্যাত...'

এইসব আলসা অমলের শরীর থেকে ধোঁয়ার মতো উঠে আসছে। ফ্ল্যাটটি তখন রোদে ঝলমল করছে। অমল ভাবছে বড়োজোর একটা ফোন করা যেতে পারে, হঠাৎ শরীরটা...পর্যন্ত বলাই যথেষ্ট হবে। কারণ, সে তো জানে ওই অফিসারটির অমলকে তেমন প্রয়োজন কিছু নেই, ওদিকে নিয়ম অনুসারেই সে চলেছে, প্রাপ্য ছুটির সংখ্যা তো কম নয়। ক শহর যে বিষয়ে খুবই সজাগ তা হল নিয়ম, একমাত্র নিয়ম। বরং আজ সে একা-একা, আপাত উদ্দেশ্যহীনতায় হাঁটবে ফুটপাত বদলে-বদলে। অজস্র মানুষকে লক্ষ করবে, তাদের চরিত্র আর জীবন সম্পর্কে কল্পনা এবং অনুমানের চেষ্টায় সক্রিয় হয়ে উঠবে।

বোঝার চেষ্টা করবে এই উপনগরীটিই ক শহরের ভবিষ্যৎ নকশা কি-না। দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে, ক্ষুধার বিরুদ্ধে যে ত্রিশ-দফা কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে তা সত্যি ক শহরকে একটি নিষ্প্রাণ লবণহ্রদ উপহার দেবে কি-না।

আপনি কখনও কমিউনিস্ট পার্টি করেছেন?

না।

এস. এফ.?

না, সেভাবে করি নি, তবু মনে হয় করেছি।

আশ্চর্য।

শেষ পর্যন্ত একটি এলোমেলো দিনে অমল থেকে

যেতে পারে নি, সে দিনটিকে নিজের দিক থেকে সংগঠিত করে নিতে চেয়েছিল বলে, টুবাইর গালে একটি সশব্দ চুম্বন করে সুধী পিতার মতোই অফিসে চলে আসে। অফিসে এসে টাইপরাইটারের আড়ালে বসাই তার পছন্দ, সম্প্রতি যেখানে মিতা সরখেলও একটি চেয়ার টেনে এনেছে।

'আশ্চর্যের কিছু নেই, এসব ব্যাপার শহরটার এমন এক বৈশিষ্ট্য যার বাইরে থাকা একেবারে অসম্ভব। এখানে জন্মালে, বেড়ে উঠলে কিছুটা এসব আপসে পাওয়া যায়। তবে আবেগ-অনুভবের একটা পার্থক্য থাকতেই পারে। তা ছাড়া আমি মনে-মনে ওদের সমর্থক ছিলাম।'

প্রসঙ্গটি এভাবে শেষ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে প্রবীণ বীরেশ্বরবাবু রিসিভার তুলে বিদঘুটেভাবে চিৎকার শুরু করলেন 'হ্যালো...হ্যালো'। ওই চিৎকার, বীরেশ্বরবাবুর বিপুল শরীর ভয়ংকর বিরক্তির জন্ম দেয়। তবু সহ্য করতেই হবে, কেন যে এরা ভদ্রলোকের বাড়িতে মাসের প্রথম দিন থামটি পাঠিয়ে বলে না যে, রিটায়ার করা পর্যন্ত আপনাকে কষ্ট করে অফিসে আসতে হবে না, বরং সারাজীবন যে প্রতিষ্ঠানের সেবা করেছেন আপনি, সে-ই প্রতিষ্ঠান আপনার বার্ধক্যের দিনগুলিতে এটুকু করতে পারলে ধন্য হবে। শুধুমাত্র নিয়মের জন্য এই ঝঞ্ঝাট পোয়াতে হচ্ছে প্রতিদিন। বীরেশ্বরবাবু অফিসে এসে ঘণ্টায় চারটে করে ফোন করেন। মাঝে-মাঝে, লাইনের এপার থেকে বলে ওঠেন অদ্ভুত সব অসুখের নাম : বিনিয়োগ, বীমা ইত্যাদি বিষয়েই কথা চলে বেশি। আর জটিল আর পুরাতন সব ব্যাধির বিবরণ শোনা যায়।

[ক্রমশ

জাহাজী গল্প

অমৃতময় মুখোপাধ্যায়

কোরেগাঁও যাওয়ার অপকর্মের সপ্তাহ দুই বাদে আবার মেজর সাহেবের দপ্তরে তলব পড়ল। সেখানে পৌঁছতেই আমার সাজের দিকে তাকিয়ে ঠিকমতো চকচকে আছে কিনা দেখে নিয়ে তিনি বললেন, "চলো করনেলের ঘরে।"

করনেল একটা বই হাত থেকে নামিয়ে রেখে কাগজ চাপা দিয়ে গম্ভীরভাবে জিগেস করলেন, "তুমি অনেক দিন ভারতবর্ষের বাইরে কাটিয়েছ?"

"আজ্ঞে, হ্যাঁ।"

"তোমার কাগজ থেকে দেখেছি, তুমি ইংরাজি ছাড়াও কয়েকটা ভাষা কাজ চালানোর মতো জান।"

"আজ্ঞে, হ্যাঁ।"

"পাশ্চাত্য আদবকায়দাও জান নিশ্চয়ই।"

"আজ্ঞে, হ্যাঁ।"

"তোমার নেভিতে যেতে আপত্তি আছে?"

প্রশ্নগুলো এমনই থাপছাড়া যে থই পাচ্ছিলাম না। বললাম, "মিলিটারিতে যখন ঢুকেছি তখন তো আপত্তির প্রশ্ন ওঠে না।"

"বেশ, তাহলে দিল্লীর দপ্তরে জানিয়ে দিচ্ছি তোমার আপত্তি নেই। যেতে পার।"

সেলাম করে বেরিয়ে আসবার সময়ে দেখলাম করনেল মেনন যে বইটা সন্তর্পণে তুলে নিয়ে আবার দেখতে আরম্ভ করলেন সেটা পুনা রেসের বই।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে নীলকণ্ঠ বললেন, "আর কোনো পলটনের সাজের ডেলিভারি নিও না।"—বলে নিজের অফিসঘরে ঢুকে গেলেন। বেশ উদ্বিগ্নভাবেই সাইকেল চেপে মেসে ফিরতে-ফিরতে ভাবতে লাগলাম, এ আবার কী জ্বালা!

একটু অসাবধান বোধহয় হয়েছিলাম। হাসপাতালের গেটের সামনে হঠাৎ দেখলাম মস্ত বড়ো একটা মোটরগাড়ি ব্রেক কষে, টায়ার ঘষে সশব্দে থামতে চেষ্টা করতে-করতেও গাড়িয়ে এসে ধাক্কা মারলে। ব্যাপারটা ঘটেছিল আচমকা, কিন্তু হঠাৎ বিপদের সামনে পড়লে সমস্ত চেতনাটা বড়ো বেশি সজাগ হয়ে পড়ে বলেই বোধহয় সেই মুহূর্তটাকে মনে হল বেশ বিস্তীর্ণ। আমি দেখলাম গাড়ির চকচকে ক্রোম-করা ফোলডারটায় ঠেকতেই আমার সাইকেলের সামনের চাকাটা কিরকমভাবে দুমড়ে গেল, আর আমি পথের ধারের নীচু ঘাসের উপর কেমন করে পড়ে গড়িয়ে গেলাম। গাড়ি থেকে সুবেশ সুকেশ কয়েক-

জন বেরিয়ে এলেন। তারপর কী হল জানি না। একবার মনে হল কে যেন ইনজেকশন দিল আর আরেকজন যেন বহুদূর থেকে "নাম নম্বর ইউনিট" জিগেস করছে। তারপর সব চুপচাপ হয়ে গেল।

যখন হুঁশ হল, তাকিয়ে দেখলাম একটা অন্ধকার ঘরে শুয়ে আছি—একপাশে একটা মিটমিটে আলো জ্বলছে। দেখলাম বললে ঠিক বলা হয় না অবশ্য, কারণ, তাকাতেই আলোটা নাচতে-নাচতে ঘুরতে লাগল আর গা ঘুলিয়ে উঠল—কাউকে ডাকতে গেলাম কিন্তু গলা থেকে কেমন একটা আওয়াজ বার হল মাত্র। চোখ বন্ধ করে মাথা-ঘোরাটাকে বাগে এনে, আস্তে-আস্তে চোখ খুলে দেখলাম, আলোটা আর ঘুরছে না, দুলছে মাত্র—আর তারপরই দেখলাম, দুটো ডাগর আঁখি সেই সপ্তে দুলে-দুলে তাকাচ্ছে। আবার চোখ বন্ধ করে ফেলে স্থানকাল বোঝবার জন্য সচেতন হবার চেষ্টা করলাম। তখনই কানে এল সুরেলা ইংরাজিতে নারীকণ্ঠ বলছে, "তুমি ঘুমোও লেফটানেনট, কাল সকালে সব ঠিক হয়ে যাবে। গা-বমির ভাবটা মরফিনের জন্যে।"

ওষুধের ঘোরেই ছিলাম—বাধ্য ছেলের মতো ঘুমিয়ে পড়লাম। ভোরবেলা পাখির গানে ঘুম ভাঙলো।

উঠে বসলাম। ধীরে ধীরে বিছানা থেকে নেমে দেখলাম, একপায়ে ভর দিয়ে দেওয়াল ধরে চলতে পারছি। তখন পাশের ঘরের দরজার দিকে গুটিগুটি এগুলাম। সে ঘরটায় জোর আলো জ্বলছিল। গিয়ে দেখলাম সেটা নারসদের ডিউটি রুম। একজন সিসটার একমনে কী লিখছিল, মুখ না তুলেই বললে, "বসুন। কেমন লাগছে? ঠিক হয়ে গেছেন?"

কিছুক্ষণ বাদে মোটা চিনামাটির বড়ো কাপে করে সিসটারকে একজন চা দিয়ে গেল, আমাকেও।

লেখা থামিয়ে চায়ে চুমুক দিতে-দিতে সিসটার বললেন, "আপনার খুব কপালজোর ; হাড়ে কিছুই প্রায় হয় নি। তবে বেশ খানিকটা ছড়ে-টড়ে গেছে—দিন কয়েক বিশ্রাম নিলেই ঠিক হয়ে যাবে।"

কথায় কথায় নৌবাহিনীতে বদলি হব শুনে খুশি হয়ে উঠলেন। বললেন, "তাহলে তো কোচিনে যাবেন। খুব সুন্দর জায়গা—জল আর নারকেলগাছের সারি। তারই মাঝে-মাঝে সবুজ-গাছপালা-ঘেরা গ্রাম। কেরলের বেশির-ভাগই এইরকম। আপনার বাঙলার চেয়েও সুন্দর লাগবে।"

তারপর ঢুকলেন ডাকতার—ক্যাপটেন গুহ। তিনি মুখ খুলতেই বুঝতে পারলাম যে দুর্ঘটনার ফলে আমার খ্যাতি লাভ হয়েছে। দেখেই বললেন, "ও! আপনি! আমায় একজন বললে এক শিক্ষানবীশ সাইকেল চড়ে একটা স্টুডিবেকার গাড়িকে চাপা দিতে গিয়ে চোট খেয়েছে। তখনই বলেছি আমি নিশ্চয় 'সন্তান'—সাইকেলে চেপে মনে করেছে পক্ষীরাজে চড়েছে।" তারপর বললেন, "হাসপাতালে থাকবার দরকার নেই। তিনদিন ঘরে গিয়ে শুয়ে থাকুন। কবিতা পড়ুন, তারপর দেখা যাবে।" হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেবে শুনে হুঁশ হল যে মোটা-মোটা নীল ডোরাকাটা রোগীর জামা পরে আছি।

বিছানায় ফিরে এসে একসেট ইউনিফরম কী করে ঘর থেকে আনানো যায় ভাবছি, এমন সময় একগাল হেসে গনপত এসে হাজির। আজই ছাড়া পাব শুনে তখনই আমার উরদি আনতে গেল। বেশ খানিকটা পরে এসে, আমি কিছু বোঝবার আগেই একটা শালপাতা থেকে একটা সিঁদুরের টিপ আমার কপালে লাগিয়ে দিয়ে বললে যে বিঠঠল-মন্দিরে মানত করেছিল যেন আমি তাড়াতাড়ি সেরে উঠি—তার পূজাটাও দিয়ে এসেছে। তারপর সাজ-গোজ করে, তিলক মুছে, বেশ অনেকখানি খোঁড়াতে-খোঁড়াতে হেঁটে কর্তার আফিসের পাশে বসবার ঘরে হাজির হলাম।

ঘর থেকে বেরিয়ে দেখি গনপত বারান্দার মুখে দাঁড়িয়ে। বললে, "সাহেব, তুমি হাঁটতে পারবে না। এখানে একটু অপেক্ষা করো, স্কুটার-রিকশা নিয়ে আসি।"

যখন ঘরে ফিরলাম তখন অন্য সকলে ক্লাসে গেছে, সমস্ত জায়গাটা চুপচাপ। আমি কোনোরকমে বিছানায় পৌঁছে শুয়ে পড়লাম।

বিকেলবেলা ক্লাসের পর অনেকেই সহানুভূতি জানিয়ে গেল। তারপর আমার ঘরের অংশীদার সিন্দিক সাহেব (থুড়ি তখন তিনি লেফটানেনট সিদ্দিক) বললে "আপনি খুব ভাগ্যবান—আসল ধকল থেকে রক্ষে পেয়ে গেলেন। জানেন, আজ থেকে আমাদের তেরো ফুট উঁচু পাঁচিল টপকানো শেখানো হচ্ছে, আর দিন দুই বাদে রশি বেয়ে খাড়া তিরিশ ফুট ওঠা অভ্যাস করানো হবে।"

তিন দিন বাদে 'এম আই রুম'-এ হাজির হলাম। এটা হল পলটনের চিকিৎসার প্রাণকেন্দ্র—পুরো নামটা মেডি-কেল ইনসপেকশন রুম, সংক্ষেপে 'এমআইরুম'। কেবল চোট লাগলে বা অসুখ করলে নয়, কিছু না হলেও অফিসার, জোয়ান সকলের বছরে কয়েকবার এখানে চক্কর লাগাতেই হয়। ছুটিতে যাবে? এখান থেকে সই না হলে রাহাখরচ পাবে না। বসন্তের টিকা, টাইফয়েড-কলেরার প্রতিষেধক ইনজেকশন, পদোন্নতি ইত্যাদি থেকে হাসপাতালে ভরতি হওয়া পর্যন্ত অনেক কিছুর জন্যই এর ছাড়পত্র হতে হয়।

তখন ওসব জানা ছিল না। ঘরে ঢুকেই মনে হল, যেন জমিদারি সেরেস্তায় এসে পড়েছি—চারিধারে নানা আকারের বড়ো-বড়ো খাতা আর কাগজপত্র। তার মধ্যে টেবিলের উলটো দিকে একজন নির্লিপ্তভাবে কী লিখে চলেছে। আমি হাজির হতে লোকটা একটা বড়ো খাতা খুলে মুখ না তুলেই 'নাম নম্বর উনিট' জিগেস করে লিখে গেল। তারপর, বোধহয় আমি ডাকতার বলে, সোজা ডাকতারের ঘরে নিয়ে গিয়ে উপস্থিত করল। তিনি তখন ঘরের একপাশে খাটে শোয়া রোগী দেখছিলেন।

ফিরে চেয়ারে বসে আমার কাগজটায় চোখ বুলিয়ে বাঙলায় বললেন, "আমি ক্যাপটেন রায়। শিক্ষানবিশি শেষ হবার আগেই দুর্ঘটনা হল—খুব দুঃখের বিষয়। কিন্তু দমে যাবেন না—মিলিটারিতে বিপদ আর দুর্ঘটনা ছাড়া উন্নতি হয় না।" তারপর জানতে চাইলেন কেমন আছি। প্রত্যেকটা পা ফেলতেই যে কষ্ট হচ্ছে সেটা বলব কিনা ভাবছি এমন সময়ে উনি বললেন, "ঘরে বিশ্রাম, যাকে সরকারি ভাষায় বলে 'সিক ইন কোয়ার্টার্স', তা তিনদিনের বেশি দেওয়া যায় না। তৃতীয় দিনের পর অফিসার হয় ভালো হয়ে যাবে নয়ত হাসপাতালে দাখিল হবে। আপনাকে হালকা ডিউটির উপযুক্ত লিখে দিচ্ছি। তবে আগে এটা ভরে ফেলুন।"—বলে চারপাতার একটা ফরম এগিয়ে দিলেন।

ফরমটা হাতে নিয়ে সব দফাগুলো পড়ে উত্তর দিতে পারব বলে মনে হল না। উপরেই বড়ো হরফে ছাপানো দৈবাৎ কিংবা নিজে-নিজে-লাগা আঘাত সম্বন্ধে রিপোর্ট'। তার প্রথম দফাতেই আছে, বলতে হবে—যখন চোট লাগে তখন 'সৈনিক-ডিউটি' করছিলাম কিনা। অবশ্য আমার কথাটাই যে মেনে নেওয়া হবে তা নয়। কারণ, চার নম্বর প্রশ্নের উত্তর লিখবেন আমার বড়ো-কর্তা আর সেখানে পর-পর প্রশ্ন সাজানো আছে এইরকম—

প্রথমত, লোকটি কি এমন কোনো সামরিক কাজ করছিল যা না করলে সে শাস্তি পেতে পারে? বাড়ি থেকে কাজের জায়গায় যাওয়া বা ফেরার উপযুক্ত পথ দিয়ে লোকটি নিজে বা পরিবহণে আসছিল কি? লোকটি একলা বা অন্যদের সঙ্গে বিধিমতে আয়োজিত ব্যবস্থা অনুসারে যাত্রা করেছিল কি? লোকটি কি সরকারি টাকায়, না কনসেশনে না সম্পূর্ণ নিজের খরচায় যাচ্ছিল?

দ্বিতীয় দফা প্রশ্ন হল—দুর্ঘটনার কারণ কি মনে হয় সম্পূর্ণভাবে বা অংশত লোকটির অসাবধানতা বা বদাচার? ঘটনার সময়ে লোকটি কি কোনো ওষুধ বা মাদকদ্রব্যের প্রভাবে ছিল?

তৃতীয়ত, এ বিষয়ে কোনো খোঁজখবর, আদালত (কোর্ট অব এনকোয়ারি) দরকার কিনা।

আমার অসহায় ভাব দেখে ক্যাপটেন রায় বললেন, "প্রথম প্রশ্নের উত্তরে লিখুন 'হ্যাঁ'। তারপর বুঝিয়ে দিলেন, "অফিসে হাজিরা দেওয়া আপনার জিম্মাদারি, তখন আপনি 'ডিউটি'তে নন। কিন্তু কাজ সেরে ফেরার সময় কিছু হলে সেটা আপনার কর্তব্যরত অবস্থায় হয়েছে ধরা হবে, কারণ তা না হলে তো ঐ জায়গায় আপনি আসতেন না। অবশ্য আপনাকে আসতে হবে সোজা পথে।"

ব্যাপারটা আমার মাথায় ঠিক ঢুকছে না বুঝতে পেরে বললেন, "ধরুন, আপনার বাড়ি হাওড়ায় আর আফিস বালীগঞ্জে। যদি দশ নম্বর বাসে যেতে গিয়ে দুর্ঘটনা ঘটে তো আপনি খেসারত পাবেন, মরে গেলে সরকার আপনার পরিবারকে খাতির করে বেশি পেনসন দেবে। কিন্তু ওইটাই যদি ঘটে আটের-বি রুটে, ব্যাপারটার জন্য সরকার দায়িত্ব নেবে না।" ব্যাপারটা আমি বুঝি নি, তা আমার চোখ থেকেই বোধহয় বুঝলেন। একটু হেসে বললেন, "অবশ্য ব্যাপারটা এত সোজাসুজি ঘটে না। আপনার ইউনিটের লোকেরা প্রমাণ

করবার চেষ্টা করবে যে ওই আট-বিতে চড়া ছাড়া আপনার উপায় ছিল না, আর পয়সা-দেনেওয়ালা দস্তরের লোকেরা নানা প্রশ্ন তুলে ব্যাগড়া দেবে। এইভাবে লেখালেখি চলবে, দুপক্ষই আইন আর নজির দেখাবে, কেরানিদের কাজ বাড়বে, ফাইল মোটা হবে আর ভুক্তভোগী যে সে অনিশ্চয়তায় ঝুলে থাকবে। মিলিটারির ডাকতার যখন হচ্ছেন তখন এর অনেক উদাহরণ জীবনে পাবেন।"

ইতিমধ্যে রোগীর নাম-লেখা কাগজ বেশ কয়েকটা এসে টেবিলে জমেছে। সেদিকে তাকিয়ে বললেন, "সন্ধেবেলা মেসে দেখা হবেখন। ছোটো ঘরগুলোর কোনোটায় পাবেন। আসবেন, গল্প করা যাবে।"

মেসের সামনের বড়ো ঘরটার পাশে বিশেষ উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য গোটাচারেক তুলনায় ছোটো ঘর ছিল। এগুলোর কোনোটাতেই আমরা শিক্ষানবীশরা বিশেষ যেতাম না। একটা ছিল 'বার'—সেখানকার ধারক ছিল 'অব্‌দার' যার নাম 'জলওয়ালা'। সে হিসেব রাখত কোন অফিসার কতটা পানীয় খেল। কেউ বেশি নেশা করেছে বুঝলে আর মদ দিতে অস্বীকার করত। দেখতাম, রোজই সেখানে দু-তিনজন বসে গেলাস-হাতে গল্প করছে। আরেকটা ঘর ছিল তাসখেলার জন্য—সেখানে ছোটো-ছোটো চৌকো টেবিলের চারপাশে গভীর মনোযোগ দিয়ে চলত ব্রিজ, উইট ইত্যাদি। খেলোয়াড়দের সকলেই ছিলেন বেশি-বয়েসি—অধিকাংশেরই পাকানো গোঁফ, মাথায় টাক, কোঁচকানো ভুরু। তৃতীয় ঘরটা জুড়ে ছিল প্রমাণ সাইজের বিলিয়ার্ড টেবিল। সেখানে সবুজ কাপড়ে মোড়া টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ে লাল-সাদা বলগুলোকে ঠেলে-ঠেলে এদিক থেকে ওদিকে ঘুরত কয়েকজন। আরেকটা ছিল লেডিজ রুম। কোনো মহিলা এলে তিনি সেখানে বসতেন। মেসটা সাধারণভাবে মেয়েদের পক্ষে ছিল নিষিদ্ধ জায়গা।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা একটা অচেনা বাড়িতে ঢোকার মত ভাব নিয়ে গুটিগুটি বিলিয়ার্ডরুমে হাজির হলাম। চেনা মুখ একটাও নেই, আর খেলাও উচ্চমানের নয় দেখে একটু বাদে সরে পড়বো ভাবছি, এমন সময়ে অব্‌দার এসে সেলাম করে বললে, "রায় সাহেব সেলাম দিয়া।" সাব বার মে হায়।"

বিলাতে কয়েক বছর কাটালেও বার বা পাব-এ যারা যায় তাদের কেমন একটু নিকৃষ্ট স্তরের লোক মনে করতাম। তাই একটু কিন্তু-কিন্তু ভাব নিয়েই সে ঘরে হাজির হলাম। জনাচারেক বসে ছিলেন। তাঁরা সকলেই যদিও বুঝলাম সাইকেল দুর্ঘটনার সংবাদে আমাকে চেনেন, আমি রায় সাহেব ছাড়া একজনকেই চিনলাম—মেজর সীতানাথ গুপ্ত। এককালে আমার সহপাঠী—বহু বৎসর পরে দেখা। এর আগে যখন দেখা হয়েছিল তখন সে অবিভক্ত বাঙলার হয়ে ভলিবল খেলছিল। সদ্য গ্যাংটক থেকে ফিরে সে সিকিমের গল্প করছিল। সে সময়ে গ্যাংটক এখনকার মতো সকলের বেড়াবার একটা জায়গা হয়ে ওঠে নি—পথঘাট ছিল অপ্রতুল। শিলিগুড়ি থেকে গ্রাম্য পথবরাবর তিস্তা নদীর ধার দিয়ে রাংপো, তারপর বগলী নদীর পাশে-পাশে গ্যাংটক অবধি। তারপর আর এগুতে হলে ধরতে হবে ঘোড়া যাবার সরু পথ। পাহাড়ের কোলঘেঁষা পথ এত সরু যে মালবোঝাই দুটো টাট্টু পাশাপাশি যেতে পারে না। পথের একপাশে খাড়া পাহাড় উঠে গেছে, আর অন্যপাশে ঢাল নেমে গেছে পাহাড়ের পায়ের কাছের উপত্যকা বা ছোট নদী পর্যন্ত। সারা পথটাই কেবল চড়াই আর উতরাই। সামনে হয়তো গ্রাম দেখা যাচ্ছে—চিৎকার করলে কথাও শুনতে পাবে, কিন্তু পৌঁছাতে লাগবে কয়েক ঘণ্টা। কারণ, একটা পাহাড়-বরাবর নেমে অন্য পারের পাহাড়ের গা বেয়ে উঠতে হবে। ওদের সঙ্গে থাকত মিউল বা খচ্চর—তার পিঠে বোঝাই রসদ, সাজসামগ্রী। প্রত্যেক খচ্চরের পিঠে কেমনভাবে কত মাল নেওয়া যায়, তা নিয়ে আগে থেকে অনেক হিসেব করতে হয়, অঙ্ক কষতে হয়। দুপাশের বোঝাই সমান না হলে খচ্চর নানারকম শয়তানি করে—তার মধ্যে সবচেয়ে বিপদের ব্যাপার হল, চলতে-চলতে একটু থেমে একসঙ্গে পিছনের দুপায়ের চাট মেরে সহিসকে ফেলে দেওয়া। হয়তো খাদের দিকেই। সীতানাথের ভাষায়, "খচ্চরগুলো নেহাতই খচ্চর, সামলানো দায়।" আর যে খচ্চরের সোয়ারি থাকত—সাধারণত খুব লক্ষ্মী দেখে তবে তাদের ওই কাজে দেওয়া হত—তারা নির্লিপ্তভাবে খাদের ধার ঘেঁষে চলত আর পরমানন্দে মুখ বাড়িয়ে ঘাসপাতা খেত—সোয়ারি ততক্ষণে ভয়ে কাঁটা, বাহন একটু এদিক-ওদিক হলেই তো কয়েকশ ফুট পতন। মালবাহী খচ্চরগুলো আবার যেন ইচ্ছে করেই পাহাড়ের এত গা ঘেঁষে চলে যে সর্বদাই ভয়—

পাথরে লেগে মালপত্র তচনচ হয় বুঝি। উলটো দিক দিয়ে আরেকটা টাট্টু বা খচ্চর এলে খুব মুশকিল—বেশ কসরত করে সাবধানে পাশ কাটাতে হয়। তবে ওইসব ভুলে একবার সামনে তাকালেই অপূর্ব পার্বত্য দৃশ্য। তার কাছেই শুনেছিলাম যে, সে সময়ে সারা সিকিমে গ্রাম ছিল শ পাঁচেক, অরফিড-জাতীয় ফুলগাছ ছিল সাড়ে সাত শো রকমের, আর বিভিন্ন রকমের প্রজাপতি ছিল হাজার সাতেকেরও বেশি। ওইখানে আরেকজন ছিলেন যিনি আরো আগে ওখানে গিয়েছিলেন; তিনি ফাঁকে-ফাঁকে খবর নিচ্ছিলেন—দিক্‌বুর ডাকবাংলাটা এখনো সেরকম আছে কিনা, রামটেকের বুড়ো লামার সঙ্গে দেখা হয়েছিল কিনা ইত্যাদি। কিন্তু যে অভিজ্ঞতাটা সঙ্গলে মন দিয়ে শুনলাম সেটা অন্য ধরনের—পার্বত্য নদীতে হঠাৎ বন্যার বিবরণ।

সীতানাথ বললে, পাহাড়ে জায়গা, এমনিতেই প্রচণ্ড ঠাণ্ডা, লোকগুলো স্নানই করে কখনো-সখনো, আর সাঁতার তো জানেই না। সেখানে বরফগলা জলের ঢাল নেমে নদীতে বন্যা এল। গ্রামের মানুষগুলো কাঠের টুকরোর মতো ভেসে যাচ্ছিল। স্রোতের টান যদিও খুব ছিল না, কিন্তু কী ঠাণ্ডা জল! তারই মধ্যে ভারতীয় জোয়ানরা অনেক লোককে উদ্ধার করে। কিন্তু ঝামেলা হল তারপর—তাদের বাঁচিয়ে রাখতে হবে তো। পলটনের কাপড়-চোপড় তখনকার মতো দেওয়া হল, কিন্তু ফেরত নেওয়া যায় কী করে? তারা তো নিঃস্ব। এদিকে ওইসব জামাকাপড় তো সরকারি, প্রত্যেকটি হিসেবমতো ফেরত দিতে হবে। ঠাণ্ডা লেগে, জলে ভিজে অনেকে অসুস্থ, তাদের চিকিৎসা করতে ওষুধ গেল ফুরিয়ে। সীতানাথ শেষটায় হাসতে-হাসতে বললে, "আমি যখন ফিরে আসছি, তখনও অডিটের আপত্তি আর তার উত্তর লেখালেখি চলছে। কয়েক বছর আরো চলবে বলে মনে হয়।"

খাবার সময় হয়ে গেছে দেখে ভাবছি উঠে পড়ব, এমন সময়ে মোটাসোটা বেঁটে একজন এলেন। পলটনের সবুজ উরদিপরা লোকগুলো থেকে এ একদম আলাদা। পরনে সাদা হাফশার্ট আর কালো পাতলুন—তার উপর চকচকে কালো কাপড়ের মোটা কোমরবন্ধ—কাঁধে লাল জমির উপর তিনটে মোটা জরির ফিতে আঁটা। ছেলেবেলায় গল্পবইয়ে জলদস্যুদের যেমনটা ছবি দেখেছি, অনেকটা সেইমতো। ওই কোমরবন্ধে বন্দুক, ছোরা কিংবা কুঠার গোঁজা দেখলেও বোধহয় বেমানান মনে হত না। এসেই রায়সাহেবের পিঠ চাপড়ে বললেন, "এখনো বিয়ার খাওয়ার অভ্যাস গেল না?" অন্যদের দিকে চেয়ে বললেন, "এই লোকটাকে বোঝাতে পারলাম না যে ভদ্রসমাজে সূর্যাস্তের আর ডিনারের মধ্যে বিয়ার চলে না।" ক্যাপটেন রায় হেসে বললেন, "আর বোঝাতে পারলাম না যে 'আপ-রুচি খানা' কথাটার মধ্যে পানীয়টাও পড়ে।"

দেখলাম সেখানে সকলেই ঐ ভদ্রলোককে চেনেন। তিনি কিছু বলবার আগেই অব্‌দার তাঁর সামনে বরফ-কুচিতে ভরা একটা গেলাসের উপর নির্জলা উইস্কি ঢেলে দিয়ে গেল। ওইখানেই শিখলাম ওই ব্যবস্থাটাকে বলা হয় 'অন দি রকস'। তারপর নানারকম গল্প শুরু হল।

এক সময়ে রায়সাহেব ভদ্রলোককে বললেন, "এই ছোকরাকে চেনেন না। আমাদের নোঙরা সবুজের উপর বাঁতশ্রদ্ধ হয়ে এ আপনাদের দলে যোগ দিচ্ছে।" লোকটি আমায় আপাদমস্তক দেখে নিয়ে জিগেস করলে, "কোত্থেকে পাশ করেছ?"

কলকাতার নাম করতে পরম তাচ্ছিল্যে প্রশ্ন করলে, "সেখানে কিছু শেখায় নাকি?" প্রশ্নটা শুনেই আমার কান দুটো গরম হয়ে উঠেছিল। বললাম "হ্যাঁ, অন্তত এটা শিখিয়েছে যে স্বল্পপরিচিত লোকের অসৌজন্যের মন্তব্যকে আমল না দিতে।" হয়ত কথার পিঠে কথা বাড়ত, কিন্তু তার আগেই ক্যাপটেন রায় ব্যাপারটাকে লঘু করে নেবার জন্য বললেন, "কমানডার ডাভের ধারণা, ও'র মতো যারা বিলাতের গাইস হাসপাতাল থেকে পাশ না করেছে তারা কেউ কিছু জানে না। অবশ্য তাতে কিছু যায় আসে না—জাহাজ ডাঙার কাছাকাছি থাকলে রোগীগুলোকে সব আমাদের কাছেই পাঠিয়ে দেন।" তারপর ডাভেকে বললেন, "রসিকতা ছাড়ো। ছেলেটাকে নৌবাহিনী সম্বন্ধে অ আ ক খ একটু শিখিয়ে দাও। ও বেচারি বোধহয় গ্রীনিচে বেড়াতে গিয়ে নেলসনের ঘুনধরা 'ভিক্টরি' জাহাজটা ছাড়া কোনো যুদ্ধজাহাজ চোখেই দেখে নি।"

এবার বোধহয় ডাভে সাহেব একটু নরম হলেন। বললেন, "নেভির নিয়ম খুব সোজা। আমার প্রথম জাহাজের বোসন কোনো নতুন নাবিক এলেই শেখাত—যা কিছু নড়ে চলে তাকে সেলাম করবে, যা কিছু অনড়

সেটাকে রঙ করবে, আর যা দেখবে না-যায় সেলাম করা, না-যায় রঙ করা, সেটাকে জলে ভাসিয়ে দেবে।"

রায়সাহেব মন্তব্য করলেন, "তোমাদের সেলামের বলিহারি যাই। জ্যান্ত কিছু হবারও দরকার নেই ; জাহাজ নৌকো যা-হোক কিছু কাঁচে এলেই পোঁ করে বাঁশি বাজাও আর সেলাম কর। আর রঙ লাগানোর ক্ষমতা সত্যিই তোমাদের অসাধারণ। ইটালি থেকে ফেরবার পথে যে ক-দিন জাহাজে ছিলাম দেখতাম খালাসিরা রঙের টিন আর বুরুশ নিয়ে সারাদিন টুক-টুক করে ঠুকে-ঠুকে রঙের চাকলা তুলছে আর নতুন করে রঙ লাগাচ্ছে। কেবল তাই নয়। বন্দরে ঢোকার আগের দিন লোকগুলো চলন্ত জাহাজের গা বেয়ে নেমে একটা দোলনার মতো মাচায় বসে জাহাজের গোটা গায়ে একপ্রস্থ রঙ লাগিয়ে ফেলল।"

ডাভে বললেন, "তা তো করতেই হবে। নৌবাহিনীর একটা জাহাজ যদি নোঙরা চেহারায় বন্দরে ঢোকে তো ক্যাপটেন থেকে সর্বকনিষ্ঠ নাবিকদের পর্যন্ত লজ্জায় মাথা কাটা যাবে।"

সীতানাথ বললে, "স্থলবাহিনীতে আমরা সব জিনিস চকচকে ঝকঝকে রাখতে কম চেষ্টা করি! কেবল নৌবাহিনীকে দোষ দাও কেন?

রায়সাহেব বললেন, "জান না হে। আরামির পালিশ করাটা একটা চারুশিল্পের পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে, আর ওদের রঙ মারাটা উৎকট পাগলামোতে ঠেকেছে।"

ডাভে হাসতে-হাসতে বলেন, "অল্প বিদ্যা যেমন ভয়ংকরী, অল্প পরিচয়ে বুঝে ফেলাটাও তেমনি বিভ্রান্তকারী। কিন্তু ও কথা থাক। রঙের কথায় মজার একটা ঘটনা মনে পড়ল—তোমাদের বলা হয় নি। এবার ছুটিতে একদিন একটা গ্রামে পিকনিক করতে গিয়েছি। সেখানে গাছতলায় রাখা তেলসিঁদুর-মাখানো একটা পাথর দেখলাম—বললে গ্রামবাসীরা বজ্রবলীর মূর্তি বলে পূজা করে। আমি তো হনুমানজীর সঙ্গে আদল কোথাও খুঁজে পেলাম না—এত পুরু লাল রঙের প্রলেপ। মূর্তিটা কেমন দেখবার জন্য পেনসিলকাটা ছুরি দিয়ে একটু চেঁচে দেখতে গেলাম। চাকলার পর চাকলা রঙ ওঠে তবু পাথর বার হয় না। আমি ঠাট্টা করে বন্ধুদের বললাম, এত রঙ যখন লেপেছে, দেখো, নিশ্চয় এ গ্রামে নাবিক কেউ থাকে। কিছুক্ষণ বাদে তাদের একজন ঘুরে এসে খবর দিলে আমার আন্দাজ বিলকুল ঠিক—একজন নয়, দুজন।"

একজন বলে উঠলেন, "রঙের কথা বলতে গিয়ে ডাভে স্বভাবতই রঙ চড়াবে—নেভির লোক তো।" সকলে হেসে উঠল। ডাভে বললেন, "মোটেই না। সবটা শোনো তো আগে। কাজ ছিল না বলে বসে-বসে এক জায়গায় রঙ তুলতে পাথরে একটা ছোটো মুখ দেখতে পেলাম। কৌতূহল বেড়ে গেল। সারাটা দুপুর ধরে রঙ তুলে শেষকালে কী দেখলাম জান? হনুমানজীর মূর্তিই নয়, এক বহুস্তনবিশিষ্টা দশাসই নারীমূর্তি। ভীষণ বিপদে পড়ে গেলাম। বজ্রবলীর সেকস বদল! গ্রামের লোকেরা কী করবে তার ঠিক নেই। কোনোরকমে তখন পিকনিক সেরে চম্পট পরিপাটি।"

"গ্রামবাসীরা কী করল একটু খোঁজখবর করেছিলে পরে?" জিগেস করেন একজন।

"না", বললেন ডাভে, "তবে একটা চিঠি দিয়ে আমাদের জাদুঘরে জানিয়েছিলাম ওই গ্রামে একটা মূর্তি দেখেছি। কয়েকমাস পরে, সেদিন জাদুঘর থেকে চিঠি পেলাম—আমায় ধন্যবাদ জানিয়ে—সুন্দর অক্ষত হারীতি-মূর্তির সন্ধান দেওয়ার জন্য।"

রায়সাহেব হাসেন। "হারীতি? সে আবার কী? হাতি নামে জন্তু জানি, হরিৎ রঙ জানি, হরীতকী ফল জানি। এটা তো শুনি নি।"

ডাভে বলেন, "আমিই কি ছাই জানতাম ওইরকম নামে হিন্দু দেবী আছেন।"

এরই মধ্যে অর্ডার জানায় খাবার সময় প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। আমরা কজন তখন গিয়ে খেতে বসলাম। ততক্ষণে টেবিল খালি, শিক্ষানবীশদের দল কোনকালে খেয়ে চলে গেছে।

খাবার শেষে কেটে পড়বার তালে ছিলাম। বহু বছর-পলটনে-কাজকরা এইসব লোকগুলোর কথাবার্তা কেমন যেন—সাধারণ থেকে তফাত। সীতানাথ ধরলে, "এরই মধ্যে ঘুম পাচ্ছে?" 'না' বলতে বললে, "তবে বোস না। এইসব বুড়ো অফিসারদের কথাবার্তায় পলটনের অনেক কিছু শিখবি যা কোনো বইতে পাবি না, অথচ সময়ে দরকার কাজ দেবে।" তাই ফিরে আবার দলে জুটতে হল। এবার আস্তানা হয়েছে বারান্দার এককোণে আবছায়া আলোতে হাতলওয়ালা বেতের চৌকিতে। মেস-বাড়ির বাকি অংশ তখন নিঝুম। পলটনের সাজ আর হিন্দি-মেশানো ইংরাজি না হলে এটাকে কলকাতার কোন বনেদিবাড়ির বারান্দার আড্ডা বলে মনে হতে পারত।

একজন খবর এনেছে প্যারেডের হুকুমগুলো সব ইংরাজির বদলে হিন্দি হবে শিগগিরই। তাই নিয়ে আলোচনা।

"বল কী? অ্যাটেনশনের বদলে বলতে হবে—সাবধান। ও আমার ধ্বারা হবে না। তাল কেটে যাবে যে। যেভাবে 'অ্যা-ট-টে-এ-এন শন' বলা হয়, সেভাবে 'সা-ব-ধা-ন' বলাই যায় না। প্যারেড তো আর ভজন গান নয়। এই হিন্দিভাষা চালু করার দল প্যারেডের মহিমাই বোঝে না।"

ক্যাপটেন রায় প্রশ্ন করেন, "জারমানদের প্যারেড তো ইংরাজিতে হয় না, তা বলে সেটা কি কম কড়ক (স্মার্ট)?" ওদিক থেকে একজন বললেন, "আখ্‌টুং-এর মধ্যে একটা শক্তির ব্যঞ্জনা আছে, হিন্দিতে ওইরকম প্রতিশব্দ চাই। সীতানাথ বললে, "গুরখাদের কোনো অসুবিধা হবে না। ওরা এখনও যেমন 'অ্যাটেনশন'কে টানটান' আর 'ছিমছাম'-এর মাঝামাঝি একটা আওয়াজে পরিণত করেছে, 'সাবধান' বলতেও ওই একই আওয়াজ করবে। আরেকজন বললেন, "আমাদের কথা বাদ দাও, কিন্তু যারা বছরের পর বছর ওই কথাগুলোয় হুকুম দিয়ে অভ্যস্ত, সেই সব সুবাদার-জমাদারদের পক্ষে ভাষা বদলানো সহজ হবে না—বেশ সময় লাগবে।

ডাভে বললেন, "নেভিতে ওসব চলবে বলে মনে হয় না। যেখানে কমনওয়েলথের নানাদেশের লোক রয়েছে, তার মধ্যে হিন্দি চলবে কী করে?" যে খবর এনেছিল সে বললে, "তিন সেনাধ্যক্ষই মেনে নিয়েছেন। তা নইলে সম্মিলিত পারেড হবে না যে।" ডাভে বললেন, "কিন্তু বিলাতেও আরমি আর নেভির ভাষা সবসময়ে এক নয়।" সে লোকটি শ্লেষভরে বললে, "বলছ! রয়েল নেভির ভাষাটা কি ইংরাজি ছাড়া অন্য কিছু?" ডাভে উত্তেজিত হয়ে ওঠে, "আমি উদাহরণ দিচ্ছি। তোমরা হুকুম শুনে বল—'ইয়েস স্যার', আমরা বলি—'আয় আয়', যদিও দুটোই ইংরাজি।

একটু হেসে রায়সাহেব বললেন, "ডাভে যদি দাবি করে যে নৌবাহিনীর ইংরাজি অভিধানসম্মত নয় তো আমি মেনে নেব। ওদের ভাষা একমাত্র অশালীন প্রয়োগের অভিধানে পাওয়া যাবে।" সকলেই হেসে ওঠে।

সীতানাথ ডাভেকে বলে, "প্যারেড যখন হিন্দিতে হবে তখন দেখা যাবে। এখন বরং আপনার ঋুলি থেকে দু-চারটে চুটকি ছাড়ুন।"

ডাভে গম্ভীরভাবে বলেন, "রায়সাহেব তো আমাদের অসভ্য, আর আমাদের ভাষাকে অশ্লীল বলেই দিয়েছেন। তাই আজ ভদ্র গল্প বলতে হবে ; অথচ, অভদ্র একটু কিছু না হলে হাসির গল্প হয় না। কেউ পিছলে পড়ে গেলে ভদ্রতা হল আহা উহু করা, আর অভদ্রতাটাই হল হেসে দেওয়া—তাই না?" তারপর একটা গল্প বলেছিলেন।

নৌবাহিনীর হেড আফিস অর্থাৎ নেভাল হেড-কোয়ার্টার্স হল দিল্লীতে। নেভির লোকেরা সেখানে ডাঙা-তোলা নৌকোর মতো সব-কিছুতেই পরমুখাপেক্ষী। আর দিল্লীর লাল ফিতে তো জান—জবরদস্ত। সেখানে এক বিভাগের নতুন অধিকর্তা এসে বললেন, "এ বড় শরমকি বাত—দেশ স্বাধীন হবার এত বছর বাদেও সর্বকিছু ইংরাজি হরফে! হিন্দি চালু করো। আমার দপ্তরের সব নামপরিচয় হিন্দিতে লেখাও।" জাহাজ হলে তো ভাবনা ছিল না, পেন্টারকে ডাকলেই হয়। এখানে, আফিসের বড়োবাবু পূর্তবিভাগে খবর দিয়ে এক রঙমিস্ত্রী আনালেন—বুড়ো সরদারজী। সে দেবনাগরী অক্ষরে আফিসারদের নামগুলো লিখে দিয়ে গেল। কর্তা খুশি নন। ফাইল রাখবার ট্রেগুলোতে যে 'ইমিজিয়েট', 'আরজেন্ট', 'মুটিন' ইত্যাদি লেখা, তারও হিন্দি হওয়া চাই। এবার মুশকিল হল। অনেক চেষ্টা-তদবির করে পূর্তবিভাগ থেকে লোক আনা হয়েছিল, ফের চাইলে তারা নানারকম প্রশ্ন তুলবে। তাই বড়োবাবু বুদ্ধি করে লিখে পাঠালেন রঙমিস্ত্রি সব কাজ শেষ না করেই চলে গেছে। বুড়ো রঙমিস্ত্রি রাগে গরগর করতে করতে এসে হাজির। বললে, সে একচল্লিশ বছর দপ্তরে রঙ চড়াচ্ছে, কিন্তু এতদিন কেউ বলে নি যে সে ফাঁকি দেয়। বড়োবাবুর আরেক বিপদ হল ওই কথাগুলোর হিন্দি পরিভাষা জোগাড় করা। তাঁর টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে বুড়ো মিস্ত্রী বলে, "বাতাও জী, কিয়া লিখা বাকি হ্যায়।" বড়োবাবু সাহেবের ঘর থেকে ট্রেগুলো আনিয়ে দেখালেন। মিস্ত্রী বলে, "বোলো কিয়া লিখু?" বড়োবাবুর ভেবে দেখবার সময় চাই। তিনি বললেন, "আভি

নেহি। পিছে আও।" রঙমিস্ত্রী চলে গেল। বেশ-খানিকটা বাদে আবার এসে হাজির। মুখে ওই এক কথা, "কী লিখব বলো।" বড়োবাবু অস্থির। বললেন, "আরে বাতায়া তো, আজ নেহি, কাল দেখা যায়গা।" সে চলে গেল, বড়োবাবুও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। পরদিন সকালে সরদারজী হাজির। তাকে দেখেই বড়োবাবুর খেয়াল হল কথাগুলোর পরিভাষার খোঁজ করা হয় নি। অপ্রস্তুতভাব কাটাতে মিস্ত্রীর উপর গর্জে উঠলেন, "সরদারজী আমার এখন বিস্তর কাজ ; আজ নেহি।" মিস্ত্রি বলে, "ও তো হো গিয়া ; আপ তো কালই বাতায়া"। বড়োবাবু ক্ষেপে বলেন, "ও হো গিয়া তো অব বাতা রহুঁ কভি নেহি। যাও। দরকার হলে ডেকে পাঠাব।" বৃদ্ধ সরদারজী গম্ভীরভাবে বলে গেল, "তুমি অভদ্র, তবু তোমার কাজ করে দেব। এ বান্দা কখন কাজ আধা-খেচড়া ছাড়ে না।"

দুপুরবেলা সাহেবের আফিসে মহা গোলমাল। সাহেব ভীষণ রেগে বড়োবাবুকে ডেকে জিগেস করলেন—এ রসিকতাটা কার। বড়োবাবুর চোখ তো ট্রেগুলোর দিকে তাকিয়ে ছানাবড়া। তিনি দেখলেন, 'ইমিজিয়েট' মুছে সে জায়গায় লেখা 'আভি নেহি', 'আরজেনট' মুছে লেখা 'আজ নেহি', আর 'রুটিন' কথাটার জায়গায় লেখা রয়েছে 'কভি নেহি'। বড়োবাবু তক্ষুনি ওইগুলো মুছে ফেলবার ব্যবস্থা করতে দৌড়াদৌড়ি আরম্ভ করলেন। কিন্তু ঘটনাটা কেরানীদের মধ্যে রটে যাওয়ার পর থেকে তারা নাকি ঐ হিন্দী পরিভাষা অনুসারে কাজ করে। তাই দিল্লীতে ফাইল চলতে এত দেরি হয়।

পরের কটা দিন মন্দ কাটল না। ক্যাপটেন রায়ের দেওয়া হালকা কাজ বা 'লাইট ডিউটি' বিধানের কৃপায় দৌড়ঝাঁপ কুচকাওয়াজ থেকে রেহাই পাওয়া গেল। দিনের বেলা ক্লাস করি, আর সন্ধেবেলা বুড়োদের আড্ডায় আস্তানা গাড়ি।

একদিন বিকেলে বন্ধু সিদ্দিকি জিগেস করলে, বাঙলায় চোর মানে কী। প্রশ্নের কারণ জানতে চাইলে সে বললে, "তোমার দোস্ত কুণাল বলেছে তোমায় 'এ চোর' বলে ডাকতে।" শুনেই তো মাথা গরম। খুব একটা কাণ্ড করবার জন্য তৈরি হয়ে তার ঘরে গিয়ে জিগ্যেস করলাম, আমায় চোর অপবাদ দেয় কোন সাহসে। সে আর তার বন্ধু যারা সেখানে বসে ছিল সকলে হেসে উঠল। কুণাল হেসে বললে, "চোর নয়, ইঁচোড়—যত বুড়ো-হাবড়াদের সঙ্গে আড্ডা দিস, তুই তো ইঁচোড়ে পাকা।"

তত দিনে শিক্ষানবীশদের মধ্যে কতগুলো গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল। অধিকাংশই ভাষাভিত্তিক—বাঙালিদের একটা ; পানজাবি, মারাঠি, হিন্দি-ভাষীদের আর কয়েকটা। বাঙালি গোষ্ঠীর পাণ্ডা ছিল কুণাল—কলকাতার মতো শহর হয় না, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর-দের মতো কেউ পড়াতে পারে না—এইরকম কতগুলো ধারণা সে পোষণ করত। তখনও অবশ্য কলকাতার বর্তমান অবস্থা হয় নি। দক্ষিণ-ভারতীয়দের মধ্যেও নানাভাষী ছিল, কিন্তু বাঙালিরা তাদের সকলকে এক-লপতে মাদ্রাজি বলত, আর যারা মাছমাংস খায় না তাদের পরম অনুকম্পার চোখে দেখত। নিজেদের মধ্যে অবাঙালিদের নিয়ে নাক সিঁটকাত, আর নিজেদের গোষ্ঠীর কারও একটা কিছু বিশেষত্ব নজরে পড়লেই তাই নিয়ে ঠাট্টা হত—ড্যাবরা চোখ ছিল বলে গোপালের নাম হয়েছিল গলদা চিংড়ি, দশাসই চেহারা আর পাকানো গোঁফের জন্য প্রমোদকুমার আখ্যা পেয়েছিল 'জল্লাদ'। আমার নামটা স্থায়ী হয় নি, কারণ এর পরদিনেই আমার নামে এক চিঠি এসে গেল—

"এতদ্দ্বারা নৌবাহিনীর প্রধান আপনাকে ভারতীয় নৌবাহিনীর 'আংরে' জাহাজে নিযুক্ত করছেন এবং আপনাকে বম্বেতে ওই জাহাজে যোগ দিতে আদেশ দিচ্ছেন। আপনার নিয়োগ ওইদিন থেকে কার্যকর হবে। আপনার এই চাকরি স্থায়ী গণ্য করা হবে। এই চিঠির প্রাপ্তি স্বীকার 'আংরে' জাহাজের অধিনায়ককে অবি-লম্বে পাঠাবেন।"

নৌসেনার সদর দপ্তরের ছাপ দেওয়া সে চিঠি শিক্ষা-নবীশদের দল দেখল। কুণালের মন্তব্য হল, "নেভির ঢঙ দেখো। একটা কাগজে আমাদের বিশজনের নাম লিখে তো ধরিয়ে দেবে—অমুক ট্রেনে চড়ে পড়ো। দিল্লীর সদর দপ্তরের কেউ খোঁজই রাখবে না কোন চুলোয় গেলাম। আর এঁদের নাম ধরে-ধরে চিঠি! যেন কতদিনের দোস্ত!"

সিদ্দিকী সাহেব দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, "তোমার কপালটা যে ভালো, তা তো গোড়া থেকেই বুঝতে পেরেছি।"

[ক্রমশ

গ্রন্থসমালোচনা

ভগ্নহৃদয় : শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর/রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি-পর্যালোচনা। পাঠ-সংকলন ও আলোচনা : শ্রীকানাই সামন্ত। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা। পঁচিশ টাকা।

রচনার কালক্রম অনুসারে নয়, গ্রন্থাকারে প্রকাশের কালক্রম অনুসারে, ভগ্নহৃদয় রবীন্দ্রনাথের চতুর্থ গ্রন্থ। প্রথম কবি-কাহিনী [নভেম্বর ১৮৭৮], দ্বিতীয় বনফুল [মার্চ ১৮৮০], তৃতীয় বাল্মীকিপ্রতিভা [ফেব্রুয়ারি ১৮৮১] এবং চতুর্থ ভগ্নহৃদয় [জুন ১৮৮১]। প্রথম দুখানি কাহিনীকাব্য, তৃতীয়খানি গীতিনাট্য। চতুর্থ ভগ্নহৃদয় গীতি-কাব্য। কাব্যগ্রন্থ হিসাবে ভগ্নহৃদয়ই গীতিকবি রবীন্দ্রনাথের আদিসৃষ্টি।

ভগ্নহৃদয় সম্পর্কে জীবনস্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন 'বিলাতে আর-একটি কাব্যের পত্তন হইয়াছিল। কতকটা ফিরিবার পথে কতকটা দেশে ফিরিয়া আসিয়া ইহা সমাধা করি।' গ্রন্থ-খানি চৌত্রিশ সর্গে বিভক্ত। পাত্রপাত্রী-দের সংলাপসূত্রে গ্রথিত। 'ভূমিকা'য় কবি লিখেছেন, 'নিম্নলিখিত কাব্যটিকে কাহারো যেন নাটক বলিয়া ভ্রম না হয়। দৃশ্যকাব্য ফুলের গাছের মত ; তাহাতে ফুল ফুটে বটে, কিন্তু সে ফুলের সঙ্গে শিকড়, কাণ্ড, শাখা, পত্র, কাঁটাটি পর্যন্ত থাকা আবশ্যক। নিম্নলিখিত কাব্যটি ফুলের তোড়া। গাছের আর সমস্ত বাদ দিয়া কেবল মাত্র ফুলগুলি সংগ্রহ করা হইয়াছে। নাটকাকারে কাব্য লিখিত হইয়াছে।'

ভগ্নহৃদয়ের প্রথম ছয়টি সর্গ ভার-তীতে প্রকাশিত হয়েছিল। চৌত্রিশ খণ্ডে সম্পূর্ণ সমগ্র গ্রন্থ প্রকাশিত হয় কবির কুড়ি বৎসর বয়সে। পঞ্চাশ বৎসর বয়সে যখন ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস থেকে কবির গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হয় তখন ভগ্নহৃদয়েরও পুনর্মুদ্রণের আয়ো-জন হয়েছিল। কবি প্রুফ দেখতেও বসেছিলেন। কিন্তু আঠারো থেকে কুড়ি বৎসর বয়সের রচনাকে পঞ্চাশ বৎসর বয়সে মনে হয়েছে "Rubbish'। তাই তিনি মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে অনু-রোধ করেছিলেন, 'দোহাই ধর্মের এটা ছাপিয়ো না।' ভগ্নহৃদয় স্বতন্ত্র গ্রন্থা-কারে আর ছাপা হয় নি। কবির একে-বারে শেষ বয়সে যখন তাঁর সমগ্র রচনা-বলী প্রকাশের আয়োজন হয় তখন তাঁর অনিচ্ছা সত্ত্বেই রবীন্দ্ররচনাবলীর 'অচ-লিত সংগ্রহ' প্রথম খণ্ডে ভগ্নহৃদয় পুনর্মুদ্রিত হয়।

কিন্তু আমাদের বর্তমান সমালোচ্য গ্রন্থ মুদ্রিত ভগ্নহৃদয়ের পুনর্মুদ্রণ বা নতুন সংস্করণ নয়। সম্পাদক কানাই সামন্ত 'নিবেদনে' জানিয়েছেন, 'শান্তি-নিকেতনের রবীন্দ্রভবনে সংরক্ষিত রবীন্দ্রপাণ্ডুলিপির পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা বা পর্যালোচনা ও তদনুযায়ী আনুপূর্বিক সংকলন' এই গ্রন্থ। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, রবীন্দ্রনাথের জন্ম-শতবর্ষপূর্তি উৎসবের পর শান্তি-নিকেতনে 'রবীন্দ্রচর্চাপ্রকল্প' নামে একটি গবেষণাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রভবনে সংগৃহীত রবীন্দ্রপাণ্ডুলিপির পাঠোদ্ধার এবং বিচারবিশ্লেষণ ছিল তার অন্যতম কৃত্য। বলাই বাহুল্য, রবীন্দ্রভবন রবীন্দ্রনাথ-সম্পর্কিত একটি সামগ্রিক সংগ্রহশালা ; কবির যাবতীয় সৃষ্টি,—তাঁর রচিত পাণ্ডুলিপি, মুদ্রিত গ্রন্থ, চিত্র, সংগীত এবং তাঁর জীবন ও সৃষ্টি সম্পর্কে জ্ঞাতব্য তথ্যরাজির মূল সংরক্ষণকেন্দ্র।

এই সংগ্রহশালায় বসে রবীন্দ্রচর্চা-প্রকল্পের প্রথমদিককার কাজ ছিল প্রধানত পাণ্ডুলিপির বিচারবিশ্লেষণ এবং তার সাহায্যে মুদ্রিত গ্রন্থরাজির পাঠান্তর-সংবলিত সংস্করণ প্রকাশ করা। বিভিন্ন পাণ্ডুলিপির সংক্ষিপ্ত বিবরণ বা আলোচনাও বিভিন্ন সাময়িক-পত্রে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু 'রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি-আধারিত বিচার-বিশ্লেষণ ও সংকলন'-এর ফল হিসাবে গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হল ভগ্নহৃদয়।

রবীন্দ্রভবনে সংরক্ষিত প্রাচীনতম পাণ্ডুলিপির নাম 'মালতী-পুঁথি'। ১৮৭৪ থেকে ১৮৮২ সালের অনেক রচনা এতে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে। তার পরের পাণ্ডুলিপিতে [পাণ্ডুলিপি-সংখ্যা ৯৩] আছে ভগ্ন-হৃদয়। এই পাণ্ডুলিপি ইন্দিরা দেবী রবীন্দ্রসদনে [রবীন্দ্রভবনের পূর্বনাম রবীন্দ্রসদন] দান করেন। এই পাণ্ডু-লিপির পাঠকে ভিত্তি করে, এবং মালতী-পুঁথি, ভারতীতে প্রকাশিত প্রথম ছয় সর্গ এবং গ্রন্থাকারে মুদ্রিত একমাত্র সংস্করণের প্রয়োজনীয় সাহায্য নিয়ে কানাই সামন্ত বহু আয়াসসাধ্য এই কাজ সম্পন্ন করেছেন। তিনি পাণ্ডুলিপি-ধৃত পাঠকে দুইভাগে বিন্যস্ত করেছেন। তাঁর বিচারে ভগ্ন-হৃদয়ের প্রাথমিক পরিকল্পনায় ছিল, মোট ছাব্বিশটি সর্গ। 'অতঃপর ভগ্নহৃদয়ের যে যে বিশেষ সর্গ ও বিশেষ অংশ একবার প্রেসকপি প্রস্তুত করার পরে, এমন-কি সম্ভবতঃ ছাপাখানায় কম্পো-জের কাজ চলিবার সময়েও কবি পুনঃ পুনঃ যোগ করেন' সেগুলি 'সংযোজিত নূতন সর্গ বা অংশ'-রূপে দ্বিতীয় ভাগে সংকলিত হয়েছে। সম্পাদক এই দুভাগের নাম দিয়েছেন 'পাঠসংকলন : প্রথম' এবং 'পাঠসংকলন : দ্বিতীয়'। তিনি এই প্রসঙ্গে বলেছেন, 'মালতী-পুঁথি'র কোনো কোনো অংশ ভগ্ন-হৃদয়েরই কতক অংশের 'মূল' খসড়া তাহাতে সন্দেহ নাই। তেমনি সন্দেহা-তীত যে, পুঁথির কোনো কোনো অংশ লিখিবার কালে ভগ্নহৃদয়ের কোনো কল্পনাই কবির মনে ছিল না অথচ পরে

সেগুলি এ রচনায় তাঁহার কাজে লাগিয়াছে।'

কাব্যরচনার সময় অদল-বদল করা রবীন্দ্রনাথের চিরদিনের অভ্যাস। চৌত্রিশ সর্গে বিভক্ত প্রথম কাব্যগ্রন্থ রচনার সময় এই অদলবদল এত বেশি যে সম্পাদক একে 'খেলায় তাস ভাঁজা'র সঙ্গে উপমিত করেছেন। [পৃষ্ঠা আট]। পুনশ্চ তিনি বলেছেন, 'একবার লিখিয়া, পুনঃ পুনঃ যোগ বিয়োগ করিয়া, কবি যেন তাস ভাঁজার কৌশলে নানা রচনাংশ আগে পরে পরিবর্তিত ও বিবর্তিত পারম্পর্যে নূতন ভাবে সাজাইয়াছেন।' [পৃষ্ঠা বারো]। তাস ভাঁজার উপমাটি অবশ্য সুপ্রযুক্ত হয় নি। তাস ভাঁজার উদ্দেশ্য তাস এলোমেলো করে দেওয়া ; কাব্যসৃষ্টিতে অদল বদল, সংযোজন ও সংশোধন সজ্ঞান পরিকল্পনা-প্রসূত, তার উদ্দেশ্য সৃষ্টির উৎকর্ষ সাধন। তাছাড়া এখানে একটি মৌলিক প্রশ্ন উত্থাপনের সুযোগ রয়েছে। যে-পাণ্ডুলিপি সংশোধন ও পরিমার্জন করে কবি স্বয়ং গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেছেন সেই পাণ্ডুলিপিকে জোড়াতালি দিয়ে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা খোদার ওপর খোদকারি করা হয় কি না। এই গুরুত্বপূর্ণ বিতর্ক দূরে সরিয়ে রেখে একথা অবশ্যই বলতে হবে যে, কানাই সামন্ত পাণ্ডুলিপি-পর্যালোচনা প্রসঙ্গে যে সুদীর্ঘ অধ্যবসায় ও ঐকান্তিক নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন তা প্রশংসার্হ। ভগ্নহৃদয়ের 'বিষয়সূচী' এবং 'পূর্বাপর ইতিহাস' অধ্যায়-দুটি পাণ্ডুলিপি-পর্যালোচনার প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করেছে।

'ভগ্নহৃদয়' অধ্যায়ে জীবনস্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'আমার পনেরো-ষোলো হইতে আরম্ভ করিয়া বাইশ-তেইশ বছর পর্যন্ত এই যে একটা সময় গিয়াছে, ইহা একটা অত্যন্ত অব্যবস্থার কাল ছিল। যে-যুগে পৃথিবীতে জল-স্থলের বিভাগ ভালো করিয়া হইয়া যায় নাই, তখনকার সেই প্রথম পঙ্কস্তরের উপর বৃহদায়তন অদ্ভুত-আকার উভচর জন্তুসকল আদিকালের শাখাসম্পদ্‌হীন অরণ্যের মধ্যে সঞ্চরণ করিয়া ফিরিত। অপরিণত মনের প্রদোষালোকে আবেগগুলা সেইরূপ পরিমাণ-বহির্ভূত অদ্ভুতমূর্তি ধারণ করিয়া একটা নামহীন পথহীন অন্তহীন অরণ্যের ছায়ায় ঘুরিয়া বেড়াইত। তাহারা আপনাকেও জানে না, বাহিরে আপনার লক্ষ্যকেও জানে না।' আসলে ভগ্নহৃদয় প্রেমের কাব্য। তরুণ-তরুণীর মন-দেয়া-নেয়ার বিচিত্র রূপ ও রীতি এতে উন্মীলিত। অপরিণত মনের প্রদোষালোকে আবেগগুলি পরিমাণ-বহির্ভূত অদ্ভুতমূর্তি ধারণ করে একটা নামহীন পথহীন অন্তহীন অরণ্যের ছায়ায় ঘুরে বেড়িয়েছে। কাব্যের প্রধান নারীচরিত্র তিনটি—মুরলা, ললিতা ও নলিনী। প্রধান পুরুষচরিত্র দুটি—কবি ও অনিল। অনিল ও ললিতার ফুলশয্যা উপলক্ষেই কাব্যের সূত্রপাত। মুরলা অনিলের বোন, কবির বাল্যসহচরী। কবিকে সে ভালোবাসে, কিন্তু তার নীরব প্রেম প্রতিদান-প্রত্যাশা-মুক্ত। কবির সুখেই তার সুখ। নলিনী 'এক চপলস্বভাবা কুমারী'। তার অসামান্য রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হয়ে অনেক যুবকই তার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী। কবিও এই 'পূর্ণিমারূপিণী বালা'র প্রেমে মুগ্ধ। শেষ পর্যন্ত নলিনীর চিত্তও কবির প্রতিই বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছে। বলাই বাহুল্য, মুরলা, ললিতা ও নলিনী ত্রিবিধ প্রেমের তিন মূর্তি। এরা কবির পরবর্তী সাহিত্যে নানা রূপে নানা নামে বার বার ফিরে ফিরে এসেছে। তাছাড়া প্রেমের যে বিচিত্র রূপ ভগ্নহৃদয়ে বীজাকারে দেখা দিয়েছে তা-ই কবির পরিণত রচনায় পল্লবিত, পুষ্পিত ও পরিশীলিত হয়েছে।

প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, ভগ্নহৃদয়ের নলিনী কি বম্বের মারাঠী ষোড়শীর আদলে রচিত? 'কবি'র সঙ্গে তার সম্পর্ক রচনায় কি রবীন্দ্রজীবনের সেই স্বল্পস্থায়ী অধ্যায়কে স্মরণ করিয়ে দেয়? আত্মকথাকে আড়াল করার জন্যই কি তিনি নাট্যপ্রকরণের আশ্রয় নিয়েছিলেন? এসব প্রশ্নের সদুত্তর দেওয়ার সময় অবশ্যই মনে রাখতে হবে, প্রথমবারের বিলাতপ্রবাসের বিচিত্র অভিজ্ঞতাও তাঁর কবিমানসে ক্রিয়াশীল ছিল। তবে 'ও আমার গোলাপবালা' কবিতাটি ভগ্নহৃদয়ের কবিকণ্ঠে উচ্চারিত হওয়ায় মূল প্রশ্ন নতুন গুরুত্ব পেয়েছে। এই প্রসঙ্গে ভগ্নহৃদয়ের প্রথম উৎসর্গকবিতাটিও আরেক দিক দিয়ে রসিকচিত্তে কৌতূহল উদ্রেক করে। ভারতীতে প্রকাশের সময় কবি তাঁর নোতুন-বোঠানকে গ্রন্থোৎসর্গ করে লিখেছিলেন, 'তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা/এ সমুদ্রে আর কভু হব নাক পথহারা।' ভাষা ঈষৎ বদল করে এবং শেষের দুটি চরণ বর্জন করে এই গানটিই আদি ব্রাহ্মসমাজের মাঘোৎসবে ব্রহ্মসংগীত হিসাবে গীত হয়। ফলে ভগ্নহৃদয় গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় নতুন উপহার রচিত হয়েছিল। মালতী-পুঁথিতে পুলিনবিহারী সেন আরেকটি উপহারগীতি আবিষ্কার করেছেন। তিনটিই নোতুন-বোঠানের উদ্দেশে নিবেদিত। এই তিনটি উপহারের প্রথমটির 'এ সমুদ্রে আর কভু হব নাক পথহারা' উক্তিটি বিশেষ তাৎপর্য-মণ্ডিত।

আমরা ভগ্নহৃদয়কে বলেছি গীতিকবি রবীন্দ্রনাথের আদিসৃষ্টি। পরিণত জীবনে শৈশব-কৈশোরের রচনাবলী সম্পর্কে তাঁর যতই অনীহা থাক, তাঁর গ্রন্থপঞ্জীতে দেখতে পাচ্ছি সন্ধ্যাসংগীত, প্রভাতসংগীত, ছবি ও গান প্রভৃতি গ্রন্থ প্রকাশের পর তাঁর তেরো থেকে আঠারো বৎসর বয়সের মধ্যে লেখা অনেক কবিতা 'শৈশব-সংগীত' গ্রন্থে প্রকাশ করছেন। ওই গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি বলেছেন, যে-সব কবিতায় তিনি 'কিছু-না-কিছু গুণ' দেখতে পেয়েছেন সেগুলিই গ্রন্থভুক্ত করেছেন। ভগ্নহৃদয় তো শৈশব-সংগীতের পরবর্তী কালের রচনা। ১৩০৩ সালে সত্যপ্রসাদের সম্পাদনায় যে 'কাব্যগ্রন্থাবলী' প্রকাশিত হয়েছিল তার পুরোভাগের চল্লিশটি কবিতার শিরোনাম ছিল 'কৈশোরক'। এই চল্লিশটি কবিতার ত্রিশটিই ভগ্নহৃদয় থেকে সমাহৃত। ভগ্নহৃদয়ের গানগুলিও নগণ্য নয়। 'গীতবিতান : কালানুক্রমিক সূচী'র প্রথম খণ্ডে দেখতে পাচ্ছি রবীন্দ্ররচিত প্রথম অষ্টআশিটি গানের কুড়িটিই ভগ্নহৃদয় থেকে গৃহীত।

গীতিকাব্য হিসাবে ভগ্নহৃদয়ের কবিভাষাতেও রবীন্দ্রনাথের স্বকীয়তার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। অরণ্যের অন্ধকারে ইতস্তত আলোর প্রকাশ কবিভাষায় হয়েছে 'দুয়েকটি রবি-কর সাহসে করিয়া ভর/অতি সন্তর্পণে যেন মারিতেছে উঁকি'। মুরলার মুগ্ধদৃষ্টিতে কবি হয়েছেন 'জীবন্ত স্বপ্নের মত', অথবা 'মূর্তিমান ভাবনার মত'। ষণ্মাত্রিক পর্ববন্ধে কবির গানের ভাষাও লক্ষণীয় : 'অধর দুটির শাসন টুটিয়া/রাশি রাশি হাসি পড়িছে ফুটিয়া,/দুটি আঁখি পরে মেলিছে মিশিছে/তরল চপল জ্যোতি'। বিভিন্ন ইন্দ্রিয়চেতনার সংমিশ্রণ রবীন্দ্রকবিভাষার বিশিষ্ট লক্ষণ। তার পরিচয় পাওয়া যায় নন্দন-বনে বসন্তের বর্ণনায়। 'হরিত আসন পরে নন্দন-বনের কাছে/ফুল বাস পান করি বসন্ত ঘুমায়ে আছে'। ভগ্নহৃদয়ে যেমন বিবিধ ললিত ছন্দের পরিচয় পাওয়া যায় তেমনি শোনা যায় অষ্টাদশ অক্ষরের মহাপয়ারের উদাত্ত উচ্চারণ। কবিচিত্তের বর্ণনায় এই ধ্রুপদী ছন্দে 'মহাপক্ষ গরুড়ে'র রূপকল্প ব্যবহৃত হয়েছে। 'নবজাত উল্কা-নেত্র মহাপক্ষ গরুড় যেমন/বসিতে না পায় ঠাঁই চরাচর করিয়া ভ্রমণ,/...তেমনি এ ক্লান্ত হৃদি বিশ্রামের নাহি পায় ঠাঁই,/সমস্ত ধরায় তার বসিবার স্থান যেন নাই।' এইসব উদাহরণ থেকে অনায়াসেই বলা যায়, শিল্পকৃতির দিক থেকেও ভগ্নহৃদয় উপেক্ষার যোগ্য নয়। কাজেই এ কথা অকুণ্ঠভাবে স্বীকার করতেই হবে যে, পাণ্ডুলিপির জীর্ণ পৃষ্ঠা থেকে ইতস্তত-বিন্যস্ত ভগ্নহৃদয়কে পুনরুদ্ধার করে কানাই সামন্ত বিদগ্ধ রবীন্দ্ররসিকজনের ধন্যবাদের পাত্র হয়েছেন।

জগদীশ ভট্টাচার্য

প্রত্নতীর্থ-পরিক্রমা—কুঞ্জগোবিন্দ গোস্বামী। প্রকাশক : ছায়া গোস্বামী, ২৮০ যোধপুর পারক, কলকাতা-৭০০ ০৬৮। তিরিশ টাকা।

অতীশ দীপংকর শ্রীজ্ঞান—অলকা চট্টোপাধ্যায়। নবপত্র প্রকাশন, পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯। আঠারো টাকা।

অধ্যাপক কুঞ্জগোবিন্দ গোস্বামী প্রত্নবিদ্যায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত। হরপ্পা আর মহেনজোদারোতে প্রত্নক্ষেত্রের যে আবিষ্কার ভারতের ইতিহাসে নতুন যুগের সূচনা করে, কর্মজীবনের শুরুতেই সেই কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সুযোগ তাঁর হয়েছিল। সেই দুর্লভ অভিজ্ঞতা তিনি লিপিবন্ধ করে রেখেছেন তাঁর 'প্রাগৈতিহাসিক মহেঞ্জোদারো' গ্রন্থে। সার জন মারশালের 'মহেনজোদারো অ্যানড দি ইনডাস সিভিলাইজেশন' প্রকাশিত হওয়ার অনতিকাল পরেই আত্মপ্রকাশ করে তাঁর এই বই। প্রত্নতত্ত্বভিত্তিক গবেষণাগ্রন্থ হিসাবে তাঁর এই বইটি অনন্য—প্রতিদ্বন্দ্বী-হীন।

১৯৩২-৩৩ সালে আর্থিক-অসংকুলতাজনিত কর্মচ্যুতির ফলে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ থেকে চলে আসতে হলেও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক গোস্বামীকে বাঙলাদেশের প্রত্নসম্পদ সমীক্ষণের যে সুযোগ দিয়েছিল, নিঃসন্দেহে তিনি তার যথাযোগ্য সদ্ব্যবহার করেছেন। তাঁরই প্রয়াসে এবং সুযোগ্য পরিচালনায় উত্তর বাঙলার প্রাচীন জনপদ কোটীবর্ষ বা বর্তমান বাণগড়ের লুপ্তোদ্ধার, এবং বারাসাতের সন্নিহিত বেড়াচাঁপা-চন্দ্রকেতুগড়ে মাটির তলা থেকে একটি বিপুলায়তন ইটের তৈরি মন্দিরের উন্মোচন অধ্যাপক গোস্বামীর কৃতিত্বের স্থায়ী সাক্ষ্য বহন করছে।

কর্মজীবন থেকে অবসরগ্রহণের পর প্রকাশিত এই গ্রন্থখানিতে তিনি তাঁর প্রত্নবিদ্যাসাধনার যে রূপরেখা এঁকেছেন, প্রত্নজিজ্ঞাসায় অনুৎসুক সাধারণ পাঠকও তা পড়ে প্রভূত আনন্দ উপভোগ করবেন।

অধ্যাপক গোস্বামীর বাঙলা রচনার শৈলী সরল, অনুভূতি-উদ্দীপক। শিক্ষাজীবনে প্রত্নতত্ত্বের বিশেষ অঙ্গ প্রাচীন লিপি আর মুদ্রা সম্বন্ধে কী ভাবে তাঁর আগ্রহ জন্মায়, কেমন যোগাযোগের ফলে সংস্কৃতচর্চার সঙ্গে প্রাচীন লিপি আর শিল্পকলা অধ্যয়ন করেছিলেন, তার সরস বর্ণনা আমাদের পরিতৃপ্ত করে।

হরপ্পা, মহেনজোদারো, তক্ষশিলা, অহিচ্ছত্র, মহাস্থানগড়, বাণগড়, চন্দ্রকেতুগড়ে তক্ষণের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সঙ্গে উত্তর ভারতের তাবৎ প্রত্নক্ষেত্র সম্পর্কে তাঁর ভ্রমণ আর পরিশীলনের বর্ণনা অত্যন্ত সংবেদনশীল মনের পরিচয় দেয়। কর্মোপলক্ষে যেসব পারংগম প্রত্নতত্ত্ববিদের সংস্পর্শে আসার সুযোগ তাঁর হয়েছিল—দীর্ঘ তিরিশ বৎসর যিনি ভারতের প্রত্নতত্ত্ববিভাগের অধিকর্তা ছিলেন সেই সার জন মারশাল, ১৯৪৪ থেকে ১৯৪৮ পর্যন্ত বিভাগীয় প্রধান থাকার সময় যিনি পূর্বতন তাবৎ প্রত্নপরিচালকদের কাজকে অবৈজ্ঞানিক বলে প্রতিপন্ন করে গেছেন সেই মর্টিমার হুইলার, গান্ধীটুপি সম্বন্ধে স্পর্শকাতর আর্নস্ট ম্যাকে, পশ্চিম সিন্ধুদেশে ধর্মোন্মাদ হুরদের হাতে নিহত বিজ্ঞানী ননীগোপাল মজুমদার, দেশীয় প্রত্ন-অধিকর্তা কাশীনাথ নারায়ণ দীক্ষিত, শিক্ষক বনমালী বেদান্ততীর্থ, ডকটর শ্যামাপ্রসাদ মুখো-

পাধ্যায়—এঁদের বৈশিষ্ট্য এবং ব্যক্তিত্ব অত্যন্ত দক্ষতায় ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। উচ্চাঙ্গের সরস ভ্রমণকাহিনী আস্বাদনের সঙ্গে প্রত্নবিজ্ঞানের বহু মৌলিক তত্ত্ব এবং প্রত্নধৃত ইতিহাসের পরিবর্তন বড়োই উপাদেয়। মূর্তি এবং মন্দিরের চিত্রের প্রতিমুদ্রণ কিন্তু আরও সুন্দর হওয়া উচিত ছিল।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা সবিনয়ে নিবেদন করতে চাই।

এখন, এদেশে প্রত্নবিদ্যাচর্চা উপনিবেশবাদীদের প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়ার মুহূর্তে উপনীত হয়েছে। পাশ্চাত্ত্য ঐতিহাসিকেরা ভারতে আর্য-আগমনের যে কল্পিত সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, বর্তমানে নানা আবিষ্কারের ফলে সেসব তত্ত্ব আজ বর্জিত হওয়ার মুখে। অনেক ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিদ হরপ্পা-সভ্যতাকে আর্যদেরই গড়ে তোলা সভ্যতা বলে যুক্তিপ্রমাণ উপস্থাপন করেছেন। অধ্যাপক গোস্বামী নিজে অহিচ্ছত্রায় তক্ষণের ফলে আবিষ্কৃত রঙিন ধূসর মৃৎপাত্রের বিশিষ্টতার উল্লেখ করেছেন (পৃ. ১১৭)। এই ধরনের মৃৎপাত্র হরপ্পা-পরিবেশের কলিবঙ্গানে এবং সিন্ধু-সরস্বতীর পূর্বে হস্তিনাপুর, কুরুক্ষেত্র, রূপার, অহিচ্ছত্রা ইত্যাদি অঞ্চলে হরপ্পা-বর্গীয় মৃৎপাত্রের প্রায় অনুষঙ্গরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই আবিষ্কার তথাকথিত আর্য-আগমন-তত্ত্বের পরিপোষক বলে যাঁরা সিদ্ধান্ত করতে চাইছেন, মাকসমুলার-হুইলারের প্রভাব তাঁদের এখনও আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

ফেয়ারসারভিস নামে জনৈক গবেষক সম্প্রতি এই মত প্রচার করেছেন যে একসহস্র খ্রীষ্টপূর্বাব্দে এই আর্য-আগমন ঘটেছিল। হুইলারের মতের উপর নির্ভর করে পিগট সিদ্ধান্ত করেছেন—দেবরাজ-ইন্দ্র-পরিচালিত আর্যেরা ১৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে হরপ্পা-সভ্যতা ধ্বংস করেছিল। এই সিদ্ধান্ত প্রচারিত হওয়ার পর ফেয়ারসারভিস, জরজ এফ ডেলস, স্যামুয়েল ক্র্যামার, এইচ টি ল্যামব্রিক প্রমুখ বেশ-কিছু বিদেশী পণ্ডিত হরপ্পা-সভ্যতা সম্বন্ধে বিস্তারিত গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু এঁদের প্রত্যেকেই এ বিষয়ে নিশ্চিত যে হরপ্পা-সভ্যতা আর্যদের সঙ্গে সংস্রবহীন। দেশীয় পণ্ডিতদের মধ্যে স্বামী শংকরানন্দ, টি এন রামচন্দ্রন, এস আর রাও প্রমুখ বিদ্বানেরা হরপ্পা-সভ্যতাকে বৈদিক আর্যদেরই কীর্তি বলে অভিহিত করতে চেয়েছেন, কিন্তু পাশ্চাত্ত্য দেশে এই মত এখনও কোনো স্বীকৃতি-লাভ করে নি। বরং, পূর্ব-তুরস্কের বোগাইকোইতে আবিষ্কৃত ১৪০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের হিটাইট লেখতে ইন্দ্র বরুণ মিত্র নাসত্য ইত্যাদি বৈদিক দেবতার নামের উল্লেখ, এবং উত্তরে রূপার, অহিচ্ছত্রা ; দক্ষিণে লোথাল ও চম্বল এবং নর্মদার উপত্যকা-অঞ্চল থেকে যে বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রত্নোপকরণ আবিষ্কৃত হচ্ছে, তাকে আড়াল করে হরপ্পা-বর্গের সভ্যতার উদ্ভব, স্থিতি এবং ধ্বংসের কাল নিয়ে বিভ্রান্তিকর নানা সিদ্ধান্ত প্রচারের প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে অধ্যাপক গোস্বামী যদি কিছু নতুন আলোকের সন্ধান দিতে পারতেন তবে জিজ্ঞাসু পাঠক খুশি হতেন।

অলকা চট্টোপাধ্যায়-রচিত বইখানি অতীশ দীপংকর শ্রীজ্ঞানের জীবনকথা—যিনি দুরধিগম্য-হিমালয়বেষ্টিত তিব্বতে ভারতের প্রজ্ঞাচৈতন্য বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন। ভারতের চিন্তা-ভাবনা-কল্পনা পূর্বে চীন কোরিয়া অতিক্রম করে সুদূর জাপানে, পশ্চিম-উত্তরে মধ্য এশিয়ায় এবং দক্ষিণ-পূর্বে ব্রহ্মদেশ-শ্যাম-ইন্দোচীন-জাভায় বিস্তৃত হয়েছিল সুদূর অতীতে। বিস্তৃত হিমালয়ের অভ্যন্তরে তিব্বত অপেক্ষাকৃত সন্নিহিত হলেও অতীশ যাওয়ার পূর্বে এখানে ভারত-সংস্কৃতির প্রভাব তেমন কার্যকর হয় নি। প্রাচীন তিব্বতীদের জীবনচর্যা তথা সংস্কৃতির মূলে যে ধর্ম অতীতে ক্রিয়াশীল ছিল, তাকে বলা হত 'বোন' বা 'পোন'। এই পোন-ধর্মে তাঁদের নিজস্ব দেবদেবী-ভূতপ্রেতযক্ষরক্ষের পূজা-উপাসনা প্রচলিত ছিল।

আদিম স্তরের এই জীবনচর্যা থেকে জনসাধারণকে উন্নতির পথে আনবার জন্য, তিব্বতের ঐক্যসাধক নামরি স্রোঙচানের পুত্র সম্রাট সোঙ চাম গামপো তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম প্রবর্তনের জন্য খ্যাত হয়ে আছেন। তাঁরই সময়ে রাজমন্ত্রী থোনমি সম্ভোট তিব্বতীয় বর্ণমালার প্রচলন করেন, এবং বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থ অনুবাদ করতে শুরু করেন। এর কিছুকাল পরে প্রখ্যাত বৌদ্ধ পণ্ডিত শান্তরক্ষিত, পদ্মসম্ভব আর কমলশীল তিব্বতে গমন করেন, এবং নবপ্রবর্তিত বৌদ্ধধর্ম এক নূতন জীবন লাভ করে।

প্রাচীন পোনধর্মাবলম্বীরা বিশেষ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল। পদ্মসম্ভব তাঁর দৃঢ়ক্ষমতাবলে এইসব বাধা-বিপত্তিকে প্রতিহত করে বৌদ্ধধর্মকে এক সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করেন। কিন্তু কমলশীল-পদ্মসম্ভব-প্রবর্তিত বৌদ্ধধর্ম খুব বেশি প্রসার-লাভ করতে পারে নি। এই ধর্মে তান্ত্রিকতার প্রভাব ছিল প্রবল—সাধারণ্যে এই তান্ত্রিকতা-সমর্থিত ক্রিয়াকলাপ, যক্ষরক্ষভূতপ্রেতডাকিনীযোগিনী উপাসনায় যোগ দিয়ে বৌদ্ধধর্মের মূলকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল।

এই গ্লানিকর অবস্থা থেকে বৌদ্ধ-ধর্মকে পুনরুদ্ধার করার জন্য যিনি বিখ্যাত হয়ে আছেন তাঁর নাম খোরদে। তিনি বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা নিয়ে ধর্মরাজ এশেওদ নামে পরিচয় লাভ করেন—তাঁর দীক্ষান্তিক নাম হয় জ্ঞানপ্রভ। তিনিই ধর্মসংস্কারের জন্য অতীশকে তিব্বতে আমন্ত্রণের অভিলাষ করেছিলেন।

রাজ্যের পশ্চিম সীমান্তে মুসলমানদের সঙ্গে এক যুদ্ধে, এশেওদ বন্দী হলে বিজেতারা তাঁর দেহের সমান ওজনের সোনা মুক্তিপণরূপে দাবি করে। প্রজারা এই মুক্তিপণ দিতে সম্মত ছিলেন, কিন্তু তিনি সেই সোনা দিয়ে তাঁর অনুগামীদের ভারত থেকে অতীশকে তিব্বতে আনবার নির্দেশ দিয়ে নিজে শত্রুকারাগারেই জীবন-বিসর্জন শ্রেয় মনে করেছিলেন। এর পরেই কয়েকজন ভিক্ষু বহু আয়াসে অতীশকে তিব্বতে নিয়ে যান।

তিব্বতে রক্ষিত নানা লিখিত উপকরণে এই মহাপণ্ডিত ধর্মব্যাখ্যাতা অতীশ সম্বন্ধে বিস্তৃত সংবাদ পাওয়া যায়। তিনি যখন ভারতত্যাগ করেন তখন তাঁর বয়স উনষাট। ভারতে তাঁর স্মৃতি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। তিব্বতী সূত্র থেকে জানা যায়, অতীশ জন্মগ্রহণ করেন পূর্বভারতের সোহোর-নামক একটি স্থানে এক রাজবংশে। তাঁর পিতৃদত্ত নাম চন্দ্রগর্ভ। প্রথম জীবনে তান্ত্রিক সাধনায় দীক্ষালাভ করলে তাঁর নাম হয় জ্ঞানগুহ্যব্রহ্ম। তান্ত্রিকসাধনপথে তিনি তান্ত্রিক ধর্ম এবং ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে সবিশেষ জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। এই জ্ঞান পরবর্তীকালে তিব্বতে তন্ত্রানুরাগী অগ্রণী বৌদ্ধ ভিক্ষুদের বিশুদ্ধ বোধিচর্যা এবং শীলপালন প্রবর্তনে সহায়ক হয়েছিল। কিছুকাল তান্ত্রিক সাধনায় নিরত থাকার পর অতীশ বৌদ্ধধর্মে দীক্ষাগ্রহণ করেন, এবং ক্রমে বৌদ্ধ আচার্যদের মধ্যে এক অগ্রণী স্থান অর্জন করেন। তিব্বতযাত্রার প্রাক্কালে তিনি বিক্রমশীল মহাবিহারে এক বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

তিব্বতে অতীশ তিন বৎসর থাকতে সম্মত হয়েছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর আর ভারতে ফেরা হয় নি। দীর্ঘ ষোলো বৎসর ওদেশে নানাভাবে বৌদ্ধ-ধর্মের পুনরুজ্জীবন ঘটিয়ে, এবং অসংখ্য জ্ঞানগর্ভ পুস্তক রচনা করে তিব্বতীয় সমাজে অতিপূজনীয় দেবতার মর্যাদা লাভ করে, তিনি ওই দেশেই দেহত্যাগ করেন।

পাশ্চাত্ত্য দেশ থেকে তিব্বতে আগত কিছু বিদ্বান ব্যক্তি কৌতূহলী হয়ে অতীশের জীবনেতিহাস রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। পরে, প্রখ্যাত তিব্বততত্ত্ববিদ শরৎচন্দ্র দাশ তাঁর সম্বন্ধে বহু তথ্য সংগ্রহ করে গ্রন্থরচনা করেন। কিছুকাল পূর্বে তিব্বতপ্রত্যাগত পণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন অতীশকে বিহারের সন্তান বলে প্রতিপন্ন করে কিছু তথ্য প্রকাশ করেছিলেন।

১৯৮০ সালে সারা ভারত জুড়ে অতীশ দীপংকরের সহস্রতম জন্মবার্ষিকী উদযাপিত হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতেই অধ্যাপিকা অলকা চট্টোপাধ্যায় বর্তমান পুস্তকটি রচনা করেন—এটি তাঁর ইংরেজিতে লেখা সুবৃহৎ প্রামাণ্য গ্রন্থ 'অতীশ অ্যানড টিবেট'-এর সংক্ষেপিত বাঙলা সংস্করণ। তিব্বতবিদ্যায় গভীর অনুরাগে প্রবুদ্ধ হয়ে লেখিকা তিব্বতীয় লিপি এবং ভাষা বহু আয়াসে আয়ত্ত করেন, এবং তাঁর এই গ্রন্থরচনার পশ্চাতে আছে বহু তিব্বতীয় মূলগ্রন্থের অধ্যয়ন এবং বিশ্লেষণ। যথেষ্ট সতর্কতা এবং নিষ্ঠায় অতীশ সম্পর্কে নানা বিভ্রান্তিকর উপকরণের ভিতর থেকে প্রকৃত তথ্য নিষ্কাষণ করে যে দৃঢ়প্রত্যয়মূলক তথ্যসমৃদ্ধ পুস্তক তিনি প্রকাশ করেছেন, তার জন্য তাঁকে অভিনন্দন জানাই। অতীশের জন্মবর্ষ ; প্রখ্যাত বৌদ্ধ-ধর্মব্যাখ্যাতা ধর্মকীর্তির শিষ্যত্বলাভের জন্য সুবর্ণদ্বীপভ্রমণ ; মহাবোধি (বজ্রাসন) সোমপুর, ওদন্তপুরী, এবং সর্বশেষে বিক্রমশিলা মহাবিহারের সঙ্গে যোগাযোগ ; পশ্চিমের সম্ভবত কলচুরিরাজ কর্ণের সঙ্গে গৌড় সম্রাট নয়পালের প্রবল সংগ্রাম উপস্থিত হলে অতীশের মধ্যস্থতায় সেই সংগ্রামের অবসান ; এবং পরিশেষে তিব্বতের জনসমাজে দেবতার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা-লাভ—এই বিস্তৃত ইতিহাস তিব্বতীয় আকরগ্রন্থের থেকে তথ্য আহরণ করে লেখিকা রচনা করেছেন। তার ফলে, অতীশ দীপংকর সম্বন্ধে বহু বিভ্রান্তির অবসান ঘটেছে বলে আমাদের বিশ্বাস।

উৎসুক পাঠকদের কাছে বইটি অবশ্যই সমাদৃত হবে।

কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

পুরোনো বাংলা গদ্য—আনিসুজ্জামান। বাংলা একাডেমী, ঢাকা। ১৯৮৪

ড. আনিসুজ্জামান ঢাকা বাংলা একাডেমীতে বাংলা গদ্যের উদ্ভবপর্ব সম্বন্ধে যে তিনটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন, 'পুরোনো বাংলা গদ্য' গ্রন্থটি তারই লিখিত রূপ। তিনি বাংলা গদ্যের উৎপত্তি ও আদিপর্ব সম্বন্ধে অনেক দিন ধরে গবেষণা করে চলেছেন। উপাদান সংগ্রহের জন্য তিনি সম্ভাব্য সমস্ত অঞ্চল পরিভ্রমণ করেছেন, যতটা সম্ভব সমস্ত উৎসও তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করেছেন। তাঁর অনুসন্ধানের ফলাফল এই-সমস্ত সংকলন ও রচনায় রক্ষিত হয়েছে। ফ্যাকটরি করেসপনডেনস অ্যানড আদার বেঙ্গলি ডকুমেনটস ইন দ্য ইনডিয়া অফিস লাইব্রেরি অ্যানড রেকর্ডস (লনডন, ১৯৮১), 'আঠার শতকের বাংলা চিঠি' (চট্টগ্রাম, ১৯৮২) এবং আলোচ্য গ্রন্থ। এ ছাড়াও তিনি কয়েকটি প্রবন্ধেও ("আঠার শতকের একটি মামলার নথি", সাহিত্য পত্রিকা ১৩৮৯, "অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা চিঠিপত্র", ভাষা ও সাহিত্যপত্র, ১৩৮৫ ; "এ নোট অন টু মানসক্রিপটস অব স্বরোদয়", চিটাগাঙ ইউনিভারসিটি স্টাডিজ, পার্ট ওয়ান, ভলুম ২, ১৯৭৮), ষোড়শ-অষ্টাদশ শতাব্দীর চিঠিপত্র, দলিল-দস্তাবেজ, সাহেব কুঠিয়াল, বাঙালি কর্মচারী, রেশমের আড়তের খুচরো ব্যবসায়ী ও তাঁদের চিঠি, আদেশনামা ইত্যাদি অব-

লম্বন করে প্রাগাধুনিক বাংলা গদ্যের গঠন, বিকাশ ও বিষয়বস্তু সম্বন্ধে অনেক চমকপ্রদ তথ্য উদ্ধার করেছেন।

বাতাসের মধ্যে বাস করে সব সময়ে তার অস্তিত্ব বোঝা যায় না, তেমনি নিত্য সর্বকার্যে গদ্য ব্যবহার করে তার রূপ-রীতি ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আমরা সবসময়ে অবহিত থাকতে পারি না। মলিয়রের নাটকের একটি চরিত্র চল্লিশ বছর ধরে গদ্যভাষা ব্যবহার করেও জানত না যে, তাকে গদ্য বলে। বোধহয় সাধারণভাবে গদ্যের ব্যবহারিক প্রয়োগ সম্বন্ধে সকলেই ঐ একই কথা বলবেন। তবু বাংলা গদ্য উনিশ শতকে যে সুগঠিত রূপ গ্রহণ করল, তা অকস্মাৎ আবির্ভূত হয় নি, অথবা ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিত-মুনশি, কেরী সাহেব ও তাঁর 'ভ্রাতৃবর্গ' বাংলা গদ্যের বনিয়াদ তৈরি করেন নি। প্রাপ্ত উপকরণ থেকে ড. আনিসুজ্জামান তাঁর একাধিক সংকলনগ্রন্থ ও প্রবন্ধ-নিবন্ধে দেখিয়েছেন যে, উনিশ শতকে ছাপার অক্ষরে বাংলা গদ্যের আবির্ভাবের প্রায় তিনশত বৎসর পূর্বে কাজ-কর্মে ব্যবহৃত বাংলা গদ্যের একাধিক লিখিত নমুনা পাওয়া গেছে। ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি রচিত বলে গৃহীত যে বাংলা চিঠিটিকে আদিতম বাংলা গদ্যের দৃষ্টান্ত বলে ধরা হয়, তার সন-তারিখের মধ্যে কারচুপি না থাকলে এই চিঠিকেই বাংলা গদ্যের প্রথম দৃষ্টান্ত বলে মেনে নেওয়া যেতে পারে। সেখান থেকে শুরু করে চিঠিপত্র, দলিল, চুক্তি, বৈষ্ণব সহজিয়াদের গদ্যের পুঁথি, কবিরাজী ও ন্যায়দর্শনের অনুবাদ প্রভৃতির মধ্য দিয়ে উনিশ শতকের তৃতীয় দশকের মধ্যে বাংলা গদ্য কাজের ভাষা থেকে রসের ভাষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। ড. আনিসুজ্জামানের পুস্তিকাটি আকারে ছোটো, ১০০ পৃষ্ঠাও নয়। কিন্তু বাংলা গদ্যের আদিপর্বের সংগ্রহ এবং আলোচনার দিক থেকে অত্যন্ত মূল্যবান। পুস্তিকাটি পড়তে-পড়তে বাংলা গদ্যের উদ্ভব এবং বিকাশের কথা নতুন করে ভাবতে হবে।

যে-কোনো কারণেই হোক, পার্শ্ববর্তী আঞ্চলিক ভাষার (অসমিয়া, ওড়িয়া, মৈথিলি) তুলনায় বাংলা গদ্যের আত্মপ্রকাশে কিছু বিলম্ব হয়েছিল। এই বিলম্বের কারণ সম্বন্ধে নানা জনে নানা কথা বলেন। বাংলা পয়ারবন্ধের শোষক শক্তির জন্যই কি বাংলা গদ্য লেখার প্রয়োজন অনুভূত হয় নি? শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত বা মঙ্গলকাব্যের (বিশেষত ধর্মমঙ্গল) পয়ার-ত্রিপদীর বন্ধন সত্ত্বেও তার মূল প্রেরণা গদ্যাত্মক, তা অস্বীকার করা যায় না। অবশ্য কিছু-কিছু পুরাতন ছন্দাত্মক রচনায় গদ্য-পদ্যের সংমিশ্রণ লক্ষ করা যায়। 'শূন্যপুরাণ' নিশ্চয় পরবর্তী কালের (১৭শ-১৮শ শতাব্দী) রচনা। তাতে মাঝে-মাঝে যে গদ্যের ঝোঁক দেখা যায়, তা ছড়ারই ভাঙা-চোরা পংক্তি। তাকে গদ্যপদ্যময় চম্পূকাব্যও বলা যায় না। 'সেকশুভোদয়া'র পশ্চাদ্‌ভূমিতেও বাংলা গদ্যের প্রচ্ছন্ন প্রভাব থাকতে পারে। হয়তো সংস্কৃত ভাষায় স্বল্পদক্ষ কোনো মুসলমান ফকির অথবা মসজিদের খাদেম বাংলা ভাষায় আখ্যানগুলির ছক মনে-মনে তৈরি করে তার অর্বাচীন সংস্কৃতে (অনেক ভুলভ্রান্তিও আছে) রূপ দিতে চেষ্টা করেছিলেন। ফলে এর ভাষাভঙ্গির পিছনে অনেকটা সাধু বাংলা গদ্যের ছায়া লক্ষ করা যাবে। সে যাই হোক, ১৬শ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে বাংলা গদ্যের লেখা-রূপের প্রমাণ পাওয়া গেছে, তা অস্বীকার করা যায় না। অবশ্য তার আগেও বাংলা গদ্যের অস্তিত্ব ছিল, নানা কাজে লোকে গদ্যের ব্যবহারও করত। পাঠান আমলে (১৩শ-১৬শ শতাব্দীর ৭ম দশক) সাধারণ বাঙালির চিঠিপত্র, জমি-জমা-ক্রয়বিক্রয়-সংক্রান্ত দলিল ও পাট্টা, কবুলিয়ত, চুক্তিনামা, হলফনামা, দান-প্রতিদানপত্র প্রভৃতিতে বাংলা ভাষাই ব্যবহৃত হত। অবশ্য পাঠান সুলতানি আমলে শাসকদের দরবারে তথা ধর্মাধিকরণে নিশ্চয় ব্যাপকভাবে বাংলা ভাষায় লেখাপড়া আর কাজকর্ম চলত না। কিন্তু সাধারণ বাঙালি যখন বিচারপ্রার্থী হত বা অভিযোগ পেশ করত তখন তাকে বাংলা গদ্যের সাহায্যেই বক্তব্য জানাতে হত, হয়তো পেশাদার তরজমানবিশ শাসকদের প্রয়োজনে তার ফারসি অনুবাদ করে দিতেন। তাই অনুমান করা যায়, ষোড়শ শতাব্দীর আগেই সমাজে নানা কাজে, বিশেষত চিঠিপত্রে বাংলা গদ্যের ব্যবহার ছিল। কারণ ১৫৫৮ খ্রীষ্টাব্দে লেখা কোচবিহার-রাজের যে চিঠিটাকে লিখিত বাংলা গদ্যের প্রথম নমুনা বলে ধরা হচ্ছে, তার ভাষার মধ্যে যে প্রবহমানতা, পরিচ্ছন্নতা এবং ঈষৎ রূপক অলংকারের প্রয়োগ আছে, তার থেকে মনে হচ্ছে, তারও অন্তত এক শতাব্দীর (অর্থাৎ ১৫শ শতাব্দী) আগের থেকে বাংলা গদ্যলেখার অনুশীলন চলেছিল। উক্ত পত্রটির অনুলিপি ১৯০১ সালের 'আসামবন্তি' (২৭ জুন) পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। তার পর উত্তরবঙ্গ সাহিত্যসম্মেলনের তৃতীয় অধিবেশনের (১৩১৩) কার্যবিবরণী এবং রঙপুর সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকায় (৪র্থ ভাগ) এটি পুনর্মুদ্রিত হয়। তার পর যাঁরাই বাংলা গদ্যের প্রথম পর্ব আলোচনা করেছেন তাঁরাই এটির উল্লেখ করেছেন। আপাতত এটিকেই বাংলা গদ্যের প্রথম লিখিত নিদর্শন বলতে হবে। ড. আনিসুজ্জামানের বক্ষ্যমাণ পুস্তিকা প্রকাশের অনেক আগের থেকেই পুরাতন বাংলা গদ্যের নমুনা হিসাবে আরো অনেকগুলি সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। ১৮৮৫ সালে কৈলাসচন্দ্র ঘোষ সর্বপ্রথম বলেন যে, ষোড়শ শতাব্দী থেকে বাংলা গদ্যের রচনাকর্ম চলে আসছে। তারপর সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকায় অনেকগুলি পুরাতন চিঠিপত্র, দলিল, চুক্তিনামা মুদ্রিত হয়েছিল। তার মধ্যে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী-প্রকাশিত বৈষ্ণবদের স্বকীয়া-পরকীয়া বিচার-বিতর্ক-বিষয়ক দুটি দলিল (একই দলিলের দুটি ভারশন) ১৩০৬ ও ১৩০৮ সালের সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় মুদ্রিত হয়। তার পর দীনেশচন্দ্র সেনের 'বঙ্গসাহিত্য পরিচয়' (২য় খণ্ড, ১৯১৪), বেঙ্গলি প্রোজ স্টাইল (১৯২১), সুশীলকুমার দে-র বেঙ্গলি লিটারেচার ইন দ্য নাইনটীনথ সেনচুরি (১৯১৯), শিবরতন মিত্রের টাইপস অব আরলি বেঙ্গলি প্রোজ্ (১৯২২), সুরেন্দ্রনাথ সেন-সম্পাদিত 'প্রাচীন বাঙ্গালা পত্রসঙ্কলন' (১৯৪২), পঞ্চানন মণ্ডল-সম্পাদিত 'চিঠিপত্রে সমাজচিত্র (২য় খণ্ড, ১৯৫৩), আনিসুজ্জামান সাহেবের তিনখানি গ্রন্থ (পূর্বে উল্লিখিত), ইন্দ্রাণী রায়-সংগৃহীত প্যারিসের 'বেঙ্গলি সেক্রেতেয়ারে'র বাংলা চিঠিপত্র (দ্রষ্টব্য : 'আঠার শতকের বাংলা গদ্য'—দেবেশ রায়, পরিচয়, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৮), বিবলিওথেক নাশিওনালে রক্ষিত আঠার শতকের পাণ্ডুলিপি (ড. আনিসুজ্জামান যেগুলি নিয়ে গবেষণা করেছেন) এবং সুধাংশু তুঙ্গ-সম্পাদিত ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আশু প্রকাশিতব্য 'বাংলার বাইরে বাংলা গদ্যের চর্চা : ষোড়শ-অষ্টাদশ শতক' প্রভৃতি সংগ্রহ ও সংকলনগ্রন্থগুলি পুরাতন বাংলা নমুনা হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে। অবশ্য এ-সব নমুনা অধিকাংশ স্থলেই অষ্টাদশ শতাব্দীর রচনা। এই প্রসঙ্গে দোম আন্তোনিও নামে বাঙালি ক্যাথলিক (অগাস্তিনীয় সম্প্রদায়ভুক্ত) খ্রীষ্টানের 'ব্রাহ্মণ-রোমান ক্যাথলিক সংবাদ'* নামে পরিচিত বিতর্ক-পুস্তিকাটি ১৭শ শতাব্দীর শেষভাগে লেখা হয়েছিল। এর পাণ্ডুলিপি এখনো লিসবনে রক্ষিত আছে। গ্রন্থটি টানা রোমান হরফে লেখা, মুদ্রণের জন্য লিসবনে পাঠানো হলেও এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয় নি। দোম আন্তোনিও প্রথম জীবনে দাসহাটে বিক্রীত হয়েছিলেন, এবং খ্রীষ্টান হওয়া সত্ত্বেও তাঁর ললাট থেকে দাসত্বের কলঙ্কচিহ্ন মোছে নি। অথবা জেসুইট ও অগাস্তিনীয় ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের পারস্পরিক বিরোধের জন্যই তাঁর গ্রন্থটি মুদ্রিত হয় নি, কেউ কেউ এমন অনুমানও করেন। আনিসুজ্জামান সাহেব বলেছেন যে, এটি লিসবনে মুদ্রিত হয়েছিল। কিন্তু তার কোনো প্রমাণ বা ইঙ্গিত পাওয়া যায় নি। এর প্রথম মুদ্রিত ইনটারলিনিয়ার সংস্করণ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৩৭ সালে ড. সুরেন্দ্রনাথ সেনের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। এর বাংলা হরফে রূপান্তরীকরণ ড. সেন-কৃত। ঢাকা শগোরী গ্রামের সেন্ট নিকোলাস তলন্তিনো গীর্জার রেক্টর মানোএল দা আসুমসাঁও-এর নামে দুটি গ্রন্থ রোমান হরফে লিসবন থেকে (১৭৪৩) মুদ্রিত হয়, একটি কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ শিষ্য গুরুর বিচার, অপরটি বাংলা-পর্তুগীজ ব্যাকরণ ও শব্দকোষ। এর ভাষাবৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আনিসুজ্জামান সাহেব বিচক্ষণ বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি আর-একখানি প্রাচীন বাংলা গদ্যগ্রন্থের উল্লেখ করেছেন। গ্রন্থটির নাম 'স্বরোদয়'। এটি ১৪৫০ শক অর্থাৎ ১৫২৮ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়। এত পুরাতন রচনা আর পাওয়া যায় নি। কিন্তু এর ভাষাবিন্যাস কাটাকাটা হলেও বিন্যাসপদ্ধতি বেশ সহজ সরল। অনেক সময় মনে হয়, বুঝি ১৮শ শতাব্দীর শেষভাগ অথবা ১৯শ শতাব্দীর প্রথম দিকের রচনা। এর দ্বারা প্রমাণিত হল, ষোড়শ শতাব্দীর গোড়ার দিকেই বাংলা গদ্যের স্বাভাবিক আকার লেখার মধ্যে ব্যবহারযোগ্য রূপ পেয়েছিল। পরবর্তী কালে বৈষ্ণব সহজিয়াদের কড়চা' ধরনের রচনাও কতকটা এইরকম। তাই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, ষোড়শ শতাব্দীর শতাব্দীকাল পূর্বেই বাংলা গদ্যের লেখারূপ কাজে-কর্মে চিঠিপত্রাদিতে ব্যবহৃত হত। অবশ্য নেপালে প্রাপ্ত বাংলা নাটক এবং আসামের শঙ্করদেবের 'অঙ্কিয়া নাটে' পরিচ্ছন্ন গদ্যের পরিচয় পাওয়া যাবে, যাতে বাংলা গদ্যের সহজ চালচলন লক্ষণীয়। শঙ্করদেবের 'রুক্মিণী-হরণ' নাটকে রুক্মিণীর এই উক্তিটি বাংলা গদ্যের মতো অতি চমৎকার দৃষ্টান্ত : "হে স্বামী কৃষ্ণ! ভিক্ষুক-মুখে তোহাক রূপগুণ শুনিয়ে হামো কায়বাক্যমনে তোহাক পতিভাবে বরিয়িহি। তথি শিশুপাল পাপী হামাক নিতে চাহে। জানি প্রাণনাথ সত্বর আসি হামাক রক্ষা করহ। তোহোক ছাড়ি হামার গতি নাহি।" দু-চারটি স্থানীয় শব্দ ছেড়ে দিলে ১৫শ-১৬শ শতাব্দীর এ রচনা তো পুরোপুরি সাধু বাংলা গদ্যের অনুরূপ। ড. সুধাংশু তুঙ্গ তাঁর আশু-প্রকাশিতব্য গদ্যবিধিপত্রের সংকলনে দক্ষতার সঙ্গে দেখিয়েছেন যে, আসামে যেসমস্ত 'বুরঞ্জী' (ইতিহাস) ও অন্যান্য চিঠিপত্র পুরাতন অসমিয়া বলে স্বীকৃত হয়েছে তার ভাষাভঙ্গি এবং শব্দপ্রয়োগে বাংলা গদ্যের স্বাদ পাওয়া যাবে। ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ব্রিটিশ মিউজিয়ামের কাগজপত্রে 'মহারাজ বিক্রমাদীত্য চরিত্র' শীর্ষক পুঁথি থেকে (দ্রষ্টব্য—সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩২৯, ৩য় সংখ্যা) ভোজরাজ-কন্যা মৌনাবতির (sic) যে আখ্যানটি আবিষ্কার করেছেন তার মধ্যে প্রথম সহজ গদ্যে গল্পরস ফুটে উঠেছে। অবশ্য প্রায় সমকালে রচিত** মানোএল দা সাম্‌সুমসাঁওয়ের 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদে' (১৭৪৩) যে ৬৪টি আখ্যান ও প্যারাবেল আছে, তা যদি তাঁর লেখনীপ্রসূত হয়, তা হলে বাংলা গদ্য রচনায় এই পর্তুগীজ পাদরির অসামান্য অধিকার স্বীকার করতে হবে। কিন্তু

* 'ব্রাহ্মণ-রোমান ক্যাথলিক সংবাদ' নামটি উক্ত গ্রন্থের সম্পাদক ডঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন দিয়েছিলেন। সেই নামেই গ্রন্থটি পরিচিত হয়েছে।

বিস্ময়ের বিষয় উক্ত আখ্যানগুলি ছেড়ে দিলে তাঁর রচনার ভাষায় বিস্তর ত্রুটি, অস্বাচ্ছন্দ্য এবং পদবিপর্যাস লক্ষ করা যাবে। কিন্তু আখ্যানগুলির ভাষা কেন এতটা সরল এবং বাংলা ভাষার সম্পূর্ণ অনুগামী তার রহস্য মোচন উপস্থিত ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক।

ড. আনিসুজ্জামান তাঁর 'পুরোনো বাংলা গদ্য'-এর স্বল্পপরিসর চারটি অধ্যায়ে (প্রস্তাব, উপকরণ, বিকাশ, বৈচিত্র্য) বাংলা গদ্যের প্রাথমিক রূপ দৃষ্টান্তসহ বিশ্লেষণ করেছেন। ১৬শ থেকে ১৮শ শতাব্দী পর্যন্ত যেখানে বাংলা গদ্যের যত নমুনা ও রচনা পাওয়া গেছে, তিনি তার মধ্য থেকে উপাদান সংগ্রহ করে নিজস্ব সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। প্রসঙ্গক্রমে তাম্রপত্র, সনদ, চিঠিপত্র, দানপত্র, দলিল, চুক্তিপত্র, বৈষ্ণবদের তীর্থপরিক্রমাবিষয়ক গদ্য-নিবন্ধ, সহজিয়া বৈষ্ণবদের কড়চা-জাতীয় সাধ্যসাধন তত্ত্বসংক্রান্ত রচনা, স্মৃতি, ন্যায়দর্শন ও আয়ুর্বেদ গ্রন্থের অনুবাদ, কথকতা, কাহিনী, পত্রলিখন প্রভৃতি নানা নমুনা সংগ্রহ করে, কোন্ উৎস থেকে বাংলা গদ্যের উদ্ভব এবং বিকাশ হয়েছে, তার ইঙ্গিত দেবার চেষ্টা করেছেন। কীভাবে 'কাজের গদ্য' ধীরে ধীরে 'ভাবের গদ্যে' (পৃ. ১৯) রূপায়িত হল, কেমন করে বাংলা গদ্য জড়ত্ব ত্যাগ করে উনিশ শতকের তৃতীয় দশকের মধ্যে সর্বভাবপ্রকাশক মননের আয়ুধে পরিণত হল, তা আনিসুজ্জামান সাহেব এই গ্রন্থে সবিস্তারে আলোচনা করেছেন। সমস্ত আলোচনাটি তথ্যনির্ভর, যুক্তিসঙ্গত এবং বিশ্লেষণধর্মী। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ, ব্রিটিশ মিউজিয়ম লাইব্রেরি, বিবলিওথেক নাশিওনেল (প্যারিস), ইনডিয়া অফিস লাইব্রেরি, ইনডিয়া অফিস রেকর্ডস, কলকাতার ভিকটোরিয়া মেমরিয়াল লাইব্রেরি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে রক্ষিত বাংলা গদ্যের আদি নিদর্শনগুলি সতর্কভাবে পরীক্ষা করে তিনি বাংলা গদ্যের প্রথম পর্বের ইতিহাস উপস্থাপিত করেছেন। শ্রমসাধ্য গবেষণা যে কত নিপুণ এবং নিখুঁত হতে পারে তার সার্থক দৃষ্টান্ত আনিসুজ্জামানের এই গ্রন্থটি। যাঁরা প্রাচীন বাংলা গদ্যের কায়া এবং কান্তি নিয়ে গবেষণা করেন তাঁরা এই গ্রন্থ থেকে বহু উপাদান সংগ্রহ করতে পারবেন। এখন শুধু বাকি রইল দিনেমার ও ওলন্দাজ উৎস সন্ধান। বাংলাদেশে এই-সমস্ত বণিক ব্যাপকভাবে বাণিজ্য করেছিল, বাঙালি ব্যবসায়ী, জমিদার ও আড়তদারের সঙ্গে এদের বহু পত্রালাপ হয়েছিল। সেগুলির হদিশ করা প্রয়োজন। তা হলে অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা গদ্যের আরো নতুন তথ্য পাওয়া যেতে পারে। আনিসুজ্জামান ইংরেজি ও ফরাসি সূত্র থেকে অনেক অজ্ঞাতপূর্ব তথ্য উদ্ধার করেছেন। প্রয়াত ইন্দ্রাণী রায়ও ফরাসি উৎস থেকে মৌলিক বাংলা চিঠিপত্র উদ্ধার করেছিলেন। এখন অন্যান্য উৎস সন্ধানের প্রয়োজন। আনিসুজ্জামান সাহেব এই দিকটির দিকে আকৃষ্ট হলে বাংলা গদ্যের হয়তো আরও একটা হারানো উৎস খুঁজে পাওয়া যেতে পারে।

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ফজলুল হকের গল্প—শওকত ওসমান সম্পাদিত। ঢাকা।

চল্লিশ বছর আগে 'চতুরঙ্গে' আর সুধীন্দ্রনাথ দত্ত-সম্পাদিত 'পরিচয়ে' প্রকাশিত ফজলুল হকের তিনটি গল্পের সংকলন দুই বাঙলার পাঠকদের উপহার দিয়েছেন লেখকের বন্ধু শওকত ওসমান আর প্রীতীশ দত্ত। বাঙালি পাঠকসমাজ তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। সাহিত্যে সত্যিই যা ভালো, তা ভেজালের ভিড়ে চাপা পড়ে না—এই প্রাচীন সত্য আর-একবার প্রমাণিত হল।

বস্তুত, দেশকাল সম্পর্কে এমন গভীর মমত্ব, আর তারই পাশাপাশি পরিশীলিত বিদগ্ধ মন এই চল্লিশ বছর পরেও দুই বাঙলায় বেশি পাই না। দুই বাঙলায়ই গল্পে অনেক চাকচিক্য বেড়েছে, কিন্তু তারই সঙ্গে বেড়েছে বিষয় আর ব্যক্তিত্বের বিচ্ছিন্নতা। যে মানুষটি লিখছেন, তাঁর মেজাজটা, তাঁর বিশেষ স্বকীয় জীবনবোধটা স্পষ্ট হয় না। তাই, খুব কম গল্পই মনের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকে।

ফজলুল হকের তিনটি গল্পের মধ্যে নিঃসন্দেহে 'মাছধরা' আর 'মাষ্টার' আমাদের মনের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকে। আমরা এক পরিশীলিত, মার্জিত, আবু সয়ীদ আইয়ুবের ঘনিষ্ঠ বন্ধু, আত্মমগ্ন, অনিসন্ধিৎসু যুবককে খুঁজে পাই যে খুব সাদামাটা গ্রাম্য মাছধরার পরিবেশে আবহমানকাল মানুষের জীবননাট্যের সন্ধান পায়, যে তার বাঁকা হাসি আর বিষণ্ণতায় মন্বন্তর-সমসাময়িক গ্রামবাঙলার দিকে চেয়ে আছে। কোনো প্যাঁচ নেই, অতিকথনের ঝোঁক নেই। মৃদু গলার এই উচ্চারণ আমরা কান পেতে শুনি।

খুব সাধারণ কয়েকটি বালকের পুঁটিমাছ-ধরার গল্পে আলতু ছেলেটি তার সারা দিনের চেষ্টায় তার সঙ্গীকে হারিয়ে দিয়েও কেন হেরে গেল—এই সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বের গল্পটি আমাদের মনের মধ্যে নড়াচড়া করে। লেখক পরিষ্কার করে বলেন নি—বলার প্রয়োজনও নেই—তবে মানুষের অনেক হারজিতের গল্পই তো বালক আলতুর পুঁটিমাছ-ধরার গল্প।

দ্বিতীয় গল্প 'বুড়ীমা' গল্প হিসাবে খুব গভীরতায় নামতে পারে নি; তবে গ্রামের মুসলমান অন্দরমহলের ছবিটি বেশ স্পষ্ট। চল্লিশ বছর আগে অখণ্ডিত বাঙলায় একান্নবর্তী অন্দরমহলের চেহারাটা যে প্রায় একই ছিল, এই ধরনের হিন্দু বুড়িমা আর মুসলমান বুড়িমা যে গোটা সংসারটা ধরে রাখতেন—তা এ গল্পে স্পষ্ট।

সংকলনের শেষ রচনা 'মাষ্টার' সম্ভবত ফজলুল হকের শ্রেষ্ঠ গল্প—মন্বন্তরপীড়িত বাস্তবের জটিল চেহারা এখানে স্পষ্ট ধরা পড়েছে। গল্পের নায়ক গরিব স্কুল-মাস্টার। সংসারে শুধু মা, কিন্তু বউ এলে ঘরে কুলোবে না। মাস্টার তাই মনস্থ করে চৌচালা একখানা ঘর তুলবে। কিন্তু "চৌচালা আর ওঠে না, কারণ কোথায় কোন মুলুকে যুদ্ধ বাধিয়াছে। জিনিসপত্র কেনা হইয়া উঠিল দায়।" কলমের এইরকম ছোটোখাটো টানে আমাদের সামনে সেদিনের পল্লীজীবনের গোটা ছবিটা ফুটে ওঠে। লেখক কাউকেই রেয়াত করেন না। মসজিদের ইমাম কাজীসাহেব পঁচিশ বছর গ্রামে থাকার পর চলে যাচ্ছেন : তেতাল্লিশের মন্বন্তরে চাল-কাপড় পাওয়া যেত না—সে দুঃখে নয়; লাশের কাপড় ঠিকমতো দেওয়া হয় না—এইজন্যেই তাঁর গ্রামত্যাগ। তেমনি, সমাজের কিছুটা উপরের স্তরের প্রতিনিধি রায়বাহাদুর 'বৃহৎ আদর্শে'র জন্যে জাপানি বোমার ভয়ে বসবাস শুরু করেন গ্রামে, কিন্তু কয়েক দিনেই এ শখ মিটে যায়। রায়বাহাদুরের বাড়িতে গৃহশিক্ষক হয়ে তাঁর সপ্রতিভ কন্যা সম্পর্কে মাস্টারের চিত্তচাঞ্চল্য জাগে। বাঙলা আর হিন্দি ফিলমের কাহিনী কিংবা উপন্যাসেও (নীলাঙ্গুরীয়—বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়) এই ধরনের চিত্তচাঞ্চল্যের পরিণতি বিয়ের শঙ্খধ্বনিতে সমাপ্ত হয়। এখানে ফজলুলের নির্মোহ বাস্তবতাবোধ ব্যতিক্রম। গল্পের শেষ অধ্যায়টি চমৎকার :

> দুধবাজার যাইবার পথে কালুর বাড়িটা দেখা যায়। কালু উধাও হইয়াছে...শচীন চক্রবর্তী এগার লাখ টাকা করিয়াছে...এগার লাখ... বৃষ্টি নাই কেন, সেদিনের বৃষ্টির ছাট...হঠাৎ করে কি মাষ্টার পথের ধারেই ধপ করিয়া বসিয়া পড়িয়া শুঁটির ঝোপে মাথা গুঁজিয়া দেয়। শুঁটির ফুলের স্তরে স্তরে জমিয়া আছে বৃষ্টির জল, চোখে মুখে লাগাইয়া ধুতির কোঁচায় দিয়া মুছিয়া মাষ্টার আরাম বোধ করে। কিন্তু এমন করিয়া কত দিন চলিবে? নিয়তই যাহা ঘটিতেছে চোখের সামনে, আশেপাশে, হয়ত ভবিষ্যতেও ঘটিবে, তাহা যদি মনের মধ্যে এমন প্রবল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে তাহা হইলে মানুষের মাত্রাজ্ঞান বজায় থাকে কতদিন?
>
> মাষ্টারকে পুলিশ ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। রঙীর মা ঠিকই বলিয়াছিল। চক্কোত্তিরা মাষ্টারের সর্বনাশ করিয়া গেল।

যদি-র কথা অবশ্যই নদীতে। তবু ফজলুল হকের গল্পগুলো পড়তে-পড়তে তাঁর সম্ভাবনার কথা আমাদের ভাবায়। ১৯৪৯ সালে প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়ে ঢাকার নীলখেতের কাছে চলন্ত ট্রেনের সামনে তিনি যদি আত্মবিসর্জন না করতেন, তাহলে কী হত? তাহলে নিশ্চয় এতদিনে তিনি হতেন খবরের কাগজের সাহিত্যসম্রাট অথবা রাশিয়া কিংবা মারকিন মুলুকে বাংলাদেশের অ্যামবাসাডর (যেরকম ঘটনা প্রায়ই ঘটে)। এই দু ধরনের সাহিত্যিক নির্বাসন ছাড়াও তাঁর সংবেদনশীল মন হয়তো মৌন থাকত সাম্প্রতিক বাস্তবের অপরিসীম জটিলতায়। কিন্তু আর-একটা সম্ভাবনাও আমাদের দোলায়—তিনি আরও কিছু ভালো গল্প লিখতেন, এবং লিখতেন আমাদের দ্রুতপরিবর্তমান কালের বাস্তব নিয়ে উপন্যাস, যার বীজ আছে তাঁর 'মাষ্টার' গল্পে। আর, এই ভাঙা বাঙলায় যাঁরা সীরিয়াস সাহিত্যসাধনায় আত্মমগ্ন, তাঁদের সহকর্মিত্বের বন্ধনে নিশ্চয়ই আবদ্ধ হতেন।

অসীম রায়

বিদেশীদের দৃষ্টিতে হাওড়া—অচল ভট্টাচার্য। শিবা অ্যান্ড কোম্পানি, হাওড়া। পনেরো টাকা।

হাওড়া নিয়ে গবেষণায় আন্তরিক নিষ্ঠার পরিচয় দিয়ে আসছেন হাওড়ারই সন্তান অচল ভট্টাচার্য। তাঁর 'হাওড়ার ইতিহাস' সুপ্রচলিত বই। আলোচ্য বইটি চিত্রে এবং মানচিত্রে, ইংরেজি আর বাঙলার দ্বৈতভাষ্যে একটি অভিনব প্রকাশ।

চিত্র, মানচিত্র এবং বিভিন্ন পর্যটকের দুষ্প্রাপ্য রচনা থেকে উৎকলিত তথ্য লেখকের নিরলস প্রয়াসের ফল।

অনেক চমকপ্রদ তথ্যের সমাবেশ পাই বইটিতে। ১৭১৯ সালে ফারুখশীয়ারের ফরমানে গঙ্গার পশ্চিমতীরে যে পাঁচখানি গ্রাম ঈস্ট ইনডিয়া কোম্পানিকে মনজুর করা হয়, তাদের নাম সালিকা, কাসুন্দিয়া, রামকৃষ্ণপুর, হরিরহ আর বেতড়। এই পঞ্চগ্রামই মিলেমিশে হয়েছে আজকের হাওড়া : হরিরহ, সংক্ষেপে হারিরা, লোকায়ত রূপে হাওড়া।

জেলা হিসাবে হাওড়ার উৎপত্তি ১৮৪৬ সালে। তত দিনে আমতা, বাগনান, রাজপুর, কোতরা (অধুনা শ্যামপুর) যুক্ত হয়েছে হাওড়া সদরের সঙ্গে (পৃ. ৩)।

বেতড় বন্দর কোথায়? সে তো হাওড়ার এক পাড়া। কিন্তু ষোলো শতকে বেতড় ছিল সরস্বতী-দামো-

** এই পুঁথিটি হালহেড (১৭৫১-১৮৩০) ১৭৮৫ খ্রীঃ অব্দের পূর্বে ব্রিটিশ মিউজিয়ামের গ্রন্থাগারে দান করেছিলেন। মনে হয় এটি অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি রচনা, অথবা পুরাতন কোনো রচনার নকল।

দরের গঙ্গাসংগমের মুখে এক ভারি ব্যস্ত বন্দর। সমুদ্রগামী জাহাজের শেষ নোঙর ছিল এখানে। ১৮৭৫-এ ভেনিসীয় নাবিক সীজার ফ্রেডরিক বণিকদের আনাগোনায় মুখর বেতড়ের কথা লিখে গেছেন। জিও ডি বারোস (১৫৫২-১৬১৩) এবং ব্রায়েভ-এর মানচিত্রেও বেতড় ছিল। ভ্যান ডেন ব্রোকের মানচিত্রেই (১৬৬০) সে অদৃশ্য। সরস্বতী মজে যাওয়ায় এই বিপর্যয়। অচলবাবুর ভাষায়, "বেতড়ের সামনে সরস্বতীর মজা চরায় জেগে ওঠে শালিমার।"

ইংরেজের কাছে নবাব সিরাজ-উদ্দৌলা প্রথম কোথায় পরাজিত হন? থানা দুর্গে। এটি নির্মাণ করেন প্রতাপাদিত্যের সেনাপতি রডা, মতান্তরে সুলতান হুসেন শাহ। এই থানা মাকুয়া ছিল শিবপুর উদ্ভিদ-উদ্যানের কাছে।

আরও সব চমকপ্রদ তথ্য ছড়িয়ে আছে এ বইয়ে। জোব চারনক উলুবেড়িয়াতেই কুঠি আর দুর্গ তৈরির কথা প্রথম ভাবেন সেই ১৬৮৮ সালে। কিন্তু স্থানীয় আপত্তি, জাহাজডুবির ঘটনা, এবং পরে ১৬৯০ সালে সুতানুটি-গোবিন্দপুর-কলিকাতা কেনার পর মত বদলে তিনি চলে আসেন সাগরের আরও কাছে সুতানুটিতে। লেখক বলছেন, "সেদিন সৌভাগ্যসূর্য পূর্বে কলকাতার দিকে উঠল, পশ্চিমে হাওড়ার দিকে অস্ত গেল।"

ক্রমে হাওড়া শিল্পাঞ্চল হয়ে উঠল। ১৭০৬ সালে প্রকাশিত ক্যাপটেন হ্যামিলটনের 'এ নিউ অ্যাকাউনট অব দি ঈসট ইনডিজ' গ্রন্থে হাওড়ায় জাহাজ নির্মাণের ডকের উল্লেখ পাওয়া যায়। ১৭৯৬-এ শালিমার ডকের প্রতিষ্ঠা, আর ১৮২৩-এ বিশপ হিবারের বর্ণনায় হাওড়া সত্যিই তখন ডকে ডগমগ। ১৮২৫-এ স্কালকের মানচিত্রে কলকাতার মানচিত্রে হাওড়া ডকে-ডকে ছেয়ে গেছে।

আঠারো শতকে আন্দুলের রাজা রামচন্দ্র রায় শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন যে অঞ্চলে, তা-ই হল শিবপুর, আর উনিশ শতকের শেষে এর শহুরে চেহারা কলকাতার সরকারি দপ্তরের কেরানিকুলের বাসস্থান হিসাবে। শিবপুর বিখ্যাত তার বটানিকাল গার্ডনস-এর জন্য। কোমপানির সামরিক সচিব করনেল কিড (১৭৪৬-৯৩) ১৭৮৬ সালে বর্তমান জমিতে এই প্রকল্পের প্রস্তাব দেন। ১৭৮৭ থেকে এই উদ্যান রচিত হতে থাকে। কিড ছিলেন প্রথম অবৈতনিক অধিকর্তা। উদ্ভিদবিজ্ঞানের বিকাশ এর প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল না; বনজ সম্পদ আহরণের প্রস্তুতি হিসাবে বিদেশী ফল, মশলাপাতি, সেগুনগাছ ইত্যাদির চারার নারসারি হিসাবে এর শুরু (পৃ. ১৮)।

৮১৯ বিঘা জায়গা জুড়ে এই বাগান। বাগানের গা ঘেঁষে বিশপস কলেজ। প্রায় পঞ্চাশ বিঘা জমির উপর এই কলেজের সূচনা ঘটান বিশপ মিডলটন। ভারতে লাটিন, গ্রীক, হিবরু পড়ার একমাত্র প্রতিষ্ঠান ছিল তখন এই কলেজ। ১৮২৪-এ হয় এর উদ্বোধন। রেভারেনড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এখানে অধ্যাপক ছিলেন, আর ছাত্র ছিলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। অচলবাবু জানাচ্ছেন, ১৮৮৩ সালে কলেজটি কলকাতার বেকবাগানে উঠে গেলে, প্রেসিডেনসি কলেজের ইনজিনীয়ারিঙ বিভাগটি এখানে উঠে আসে—এখন যার নাম বেঙ্গল ইনজিনীয়ারিঙ কলেজ।

বইয়ের শেষে লেখক হাওড়া সম্বন্ধে বিদেশী বিবরণ, মানচিত্র আর চিত্রাবলীর এক পঞ্জী সংযোজন করেছে। ১৭৮২-৮৩ সালে প্রস্তুত মারক উডের দুষ্প্রাপ্য মানচিত্র হাওড়ার ভূপ্রাকৃতিক অবস্থান এবং এই অঞ্চলের জলজঙ্গলের প্রকৃতিকে ফুটিয়ে তুলেছে (পৃ. ১)। মেজর স্কালকের করা মানচিত্রে গোলাবাড়ি ঘাট থেকে হাওড়া ঘাট পর্যন্ত ডকের জট হাওড়ার জাহাজনির্মাণ আর মেরামতির ঐতিহ্যের কথা মনে করিয়ে দেয় (পৃ. ২)। জিও ডি বারোসের করা (১৫৫২-১৬১৭) মানচিত্রে বেতড় বন্দরের যে ছবি পাওয়া গেল, সরস্বতীর মজা খাতের সোঁতায় তা প্রোথিত। ১৬-১৭ শতকের এই সাতগাঁও, বেতড়, উলুবেড়িয়ার বর্ধিষ্ণু রূপটি এইসব অঞ্চলের বর্তমান হাজামজা চেহারার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

আপজনের মানচিত্রে (১৭৯২-৯৭) হাওড়ার দড়িশিল্প আর দড়ির সেতুর সংবাদ পাওয়া যায়। দড়ির কারখানার মালিক অবশ্য মেসারস ক্লারক অ্যানড কোমপানি।

মানচিত্রে ফুটেছে হাওড়ার এক নথিগত রূপ, কিন্তু সমকালীন চিত্রাবলীতে ধরা পড়েছে তার একান্ত ব্যক্তিক রূপ। যেমন, চারলস ডয়েলির আঁকা হাওড়ার ডক (১৮৩৫—পৃ. ১৩)। জাহাজের মাস্তুল গাছের মাথা ছাড়িয়ে উঠেছে, ছবির পশ্চাৎপট রচনা করেছে আদিগন্ত গঙ্গা। জেমস ফ্রেজার এঁকেছেন সালকিয়ার নদীতট (১৬৭৫—পৃ. ১৫)। আকাশে ঘনঘটা, নদীতে বান, নৌকো টলমল—সালকিয়ার ভৈরব নিসর্গ। এই ফ্রেজারই ১৬৭৪-এ আরও এঁকেছেন বটানিক গার্ডন হাউস—কিড সাহেবের বাড়ি। প্রকৃতির কোলে মানুষের প্রতিমা সুন্দর প্রকাশ পেয়েছে (পৃ. ১৯)। চারলস ডয়েলির নয়নাভিরাম ছবি বিশপস কলেজ (১৮৪৮—পৃ. ২১)—আজকের বি ঈ কলেজের সঙ্গে মেলানো দুষ্কর। প্রকৃতির চালচিত্রটি কখন হারিয়ে গেছে।

বইটি নানা দিক দিয়ে চিত্তাকর্ষক, দৃষ্টিনন্দন—কিন্তু পরিসর বড়োই স্বল্প। প্রতিটি প্রসঙ্গই আরও বিস্তৃত হতে পারত, পাঠকের প্রত্যাশাও তাতে পুরোপুরি পরিতৃপ্ত হত। যেসব বই লেখক ব্যবহার করেছেন, তাদের সঙ্গে আরও কিছু যোগ করলে অতীতের নদীপথে বাণিজ্য, জাহাজ-শিল্প, বিশপস কলেজ, বটানিকাল গার্ডনস ইত্যাদি পরিচ্ছেদগুলি আরও পূর্ণতা পেত। সম্প্রতি বিশপস কলেজের নথিপত্র, বটানিকাল গার্ডনস-এর কার্যবিবরণ গবেষণার কাজে ব্যবহারের অনুমতি পাওয়া গেছে। পোর্ট কমিশনের নথিপত্রও জাহাজ-শিল্পের সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোকপাত করে। 'হাওড়া জেলার ইতিহাস' বইটির মর্যাদা অনুসরণ করে এই ভ্রমণসঙ্গী-সুলভ বইটিকে লেখক যদি আরও বিস্তৃতি দেন, তবেই তাঁর প্রয়াস চূড়ান্ত সফলতা পাবে।

চিত্তব্রত পালিত

অন্য কুঠার—সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় ও সাধন দাশগুপ্ত। নীহাররঞ্জন রায় জাতীয় সংহতি চর্চাকেন্দ্রের পক্ষে ক্লেসিডা, ৩২ গোবিন্দ আঢ্য রোড, কলিকাতা ২৭। দশ টাকা।

পারমাণবিক যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে আজ পৃথিবীর বহু মানুষই মোটামুটিভাবে সজাগ। কিন্তু 'কেমিক্যাল অ্যানড বায়োলজিক্যাল ওয়ারফেয়ার' (সি-বি-ডব্লু) সম্পর্কে তাঁরা ততটা সচেতন নন। বিশেষভাবে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে এ সম্পর্কে চেতনা বেশ কম। তার কারণ, সি-বি-ডব্লু-র ভয়াবহ চরিত্র এবং বিধ্বংসী ক্ষমতা সম্পর্কে এসব দেশে অনেক কম আলোচনা হয়েছে; এই ধরনের যুদ্ধের ধ্বংসলীলার ইতিহাস এবং ভবিষ্যতে তার আরও মারাত্মক পরিণতির সম্ভাবনা জনসমক্ষে তুলে ধরা হয় নি।

কোনো সন্দেহ নেই, পারমাণবিক যুদ্ধ মানবসভ্যতাকে পৃথিবী থেকে একেবারে বিলুপ্ত করে দিতে পারে। সম্প্রতি সুইডেনের স্টকহোম ইনটারন্যাশন্যাল পীস রিসারচ ইনসটিটিউট এস-আই-পি-আর-ই (সিপরি)-এর এক সমীক্ষা থেকে দেখা যাচ্ছে, এখন পর্যন্ত মাত্র চারটি দেশ—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ব্রিটেন এবং ফ্রান্স, পারমাণবিক যুদ্ধের জন্য যে অস্ত্রভাণ্ডার মজুত করে তুলেছে, তা দিয়ে মাত্র আটাশ মিনিটের মধ্যে পৃথিবীর দুই-তৃতীয়াংশের সভ্যতাকে মুছে দেওয়া যায়।

কিন্তু, তুলনামূলকভাবে, সি-বি-ডব্লুর ধ্বংসক্ষমতা কোনো অংশে কম নয়। আজ পর্যন্ত এই ধরনের যুদ্ধের জন্য যে-সমস্ত উপকরণের ভাণ্ডার বিভিন্ন দেশে মজুত করে তোলা হয়েছে, তা দিয়ে কয়েক শ বছরের জন্য মানবজাতিকে নির্জীব, নিষ্ক্রিয় এবং প্রজননক্ষমতাহীন করে একেবারে ধ্বংস করে দেওয়া যেতে পারে। এ বিষয়ে বিশিষ্ট বিজ্ঞানী-অধ্যাপক আরথার এইচ ওয়েসটিং তাঁর সর্বশেষ প্রামাণ্য বই "হারবিসাইডস ইন ওয়ার : দ্য লংগ-টারম ইকোলজিকাল অ্যানড হিউম্যান কনসিকোয়েনসেস" (বইটি মাত্র একমাস আগে সিপরি প্রকাশ করেছে।)—এ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করে দেখিয়েছেন, বর্তমানে সি-বি-ডব্লুর জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যে পরিমাণ উপকরণ তৈরি হয়েছে, তা দিয়ে মানুষজাতির দুই-তৃতীয়াংশকে এবং তৃতীয় বিশ্বের অর্ধেক মানুষকে চিরদিনের মতো পঙ্গু করে দেওয়া যায়।

এই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৬৯-এর জুলাই মাসে ইউনাইটেড নেশনসের রিপোর্ট—'কেমিকাল অ্যানড ব্যাকটিরিওলজিক্যাল (বায়োলজিক্যাল) ওয়েপনস অ্যানড দ্য এফেকট অব দেয়ার পসিবল ইউজ'-এ যা বলা হয়েছে, তা খুবই প্রণিধানযোগ্য। এই রিপোর্টে অত্যন্ত স্পষ্ট ও সোজাসুজিভাবে বলা হয়েছে "নো ফরম অব ওয়ারফেয়ার হ্যাজ বীন মোর কনডেমড দ্যান হ্যাজ দ্য ইউজ অব সি বি ওয়েপনস।"

গত তিন দশকে বিভিন্ন ভাষায় পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে সি-বি-ডব্লু নিয়ে অনেক বই এবং সমীক্ষা প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু, ভারতবর্ষের কোনো ভাষাতেই সি-বি-ডব্লু সম্পর্কে যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করে প্রায় কোনো আলোচনাই হয় নি। এমন কি, বাঙলা ভাষায়ও এ সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা হয় নি। অতি সম্প্রতি বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ড. সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় এবং বিশিষ্ট প্রযুক্তিবিদ সাধন দাশগুপ্ত 'কেমিক্যাল ও বায়োলজিক্যাল ওয়ারফেয়ার' সম্পর্কে তাঁদের এই বই সমস্ত বাঙালি জাতির হাতে তুলে দিয়েছেন। সম্ভবত, এই বিষয়ে ভারতে যে-কোনো ভাষায় এটিই প্রথম প্রকাশিত বই। আমরা, আশা করি এটি ভারতের অন্যান্য ভাষায়ও অনূদিত হবে।

দুই লেখক সি-বি-ডব্লুর ইতিহাস এবং অতি-সাম্প্রতিক ঘটনাবলী নিয়ে মোটামুটি বিস্তারিতভাবেই আলোচনা করেছেন। কিন্তু অত্যন্ত বিনীতভাবে উল্লেখ করছি, যুগ যুগ ধরে এইজাতীয় যুদ্ধরীতির যেভাবে বিবর্তন হয়েছে তা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করার প্রয়োজন ছিল। পরবর্তী সংস্করণে এই অভাব পূর্ণ হলে পাঠকেরা উপকৃত হবেন।

সি-বি-ডব্লু-এর সূচনা একেবারে প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে। লেখকরা সে কথা উল্লেখ করেছেন। প্রত্নপ্রস্তর যুগের শেষের দিকে যখন আদিম মানুষ আগুনের ব্যবহার শিখল, তখনই নিজেদের নিরাপত্তা তথা আধিপত্য বিস্তারের জন্য, হিংস্র জীবজন্তুর হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্য একদিকে যেমন তাদের পাথরের অস্ত্রগুলিকে আরও ধারালো করল, ঠিক তেমনই তাঁদের বিচরণের পরিধিকে আরও বিস্তৃত করার জন্য একধরনের গাছের শুকনো লতাপাতা জড়ো করে আগুন জ্বালিয়ে দিত। তার ফলে যে গ্যাস উৎপন্ন হত, তা অন্যান্য জীবজন্তুরা সহ্য করতে না পেরে পালিয়ে যেত। বিশিষ্ট নৃতত্ত্ববিদ এম. সি. বারকিটের ধারণা, এই গ্যাস সম্ভবত বিষাক্ত কার্বন মনোকসাইড।

খ্রীষ্টপূর্ব ৪৩১-৪০৪ সালে এথেন্স-স্পার্টার যুদ্ধে পিচ আর গন্ধক পুড়িয়ে শ্বাসরোধক গ্যাস ব্যবহার করা হয়েছিল। এ তথ্যও গ্রন্থে উল্লেখিত।

কিন্তু তারও আগে, খ্রীষ্টপূর্ব ৪৪০০ সাল থেকেই প্রাচীন মিশরের ফারাওরা যুদ্ধে গ্যাস ব্যবহার করতেন। পচা আবর্জনার বিশাল স্তূপে আগুন ধরিয়ে ফারাওরা কয়েকবার আক্রমণকারী আরব উপজাতিদের শ্বাসরুদ্ধ করে আক্রমণ প্রতিহত করেছিলেন। এই শ্বাসরোধক গ্যাসগুলি ছিল কারবন মনোকসাইড আর সালফার ডায়কসাইড।

'কেমিক্যাল ওয়ারফেয়ার' যদিও যুগ-যুগ ধরে চলে আসছে, এবং বিবর্তনের মধ্য দিয়ে আরও বিভীষিকাময় হয়ে উঠছে, 'বায়োলজিক্যাল ওয়ারফেয়ার'-এর সূচনা কিন্তু আরও অনেক পরে। মাইক্রোবায়োলজি এবং জেনেটিক ইনজিনীয়ারিঙ-এ যত উন্নত ধরনের গবেষণা আর আবিষ্কার হচ্ছে, ততই 'বায়োলজিক্যাল ওয়ারফেয়ার'-এর চরিত্র আরও ভয়াবহ রূপ ধারণ করছে।

১৮৯৯ সাল থেকে ১৯৭২ পর্যন্ত সি-বি-ডব্লু বন্ধ করার জন্য অনেক আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। কিন্তু যুদ্ধরত কোনো দেশই কখনও মানবিকতার খাতিরেও সি-বি-ডব্লু থেকে বিরত থাকে নি।

এমনকি সাম্প্রতিকতম ইরান-ইরাক যুদ্ধেও সি-বি-ডব্লু বন্ধ করা যায় নি। মাত্র একমাস পূর্বে প্রকাশিত ইউনাইটেড নেশনস-এর রিপোর্টে স্পষ্টভাবে এ ঘটনা উল্লেখ করেছে।

এই ইরান-ইরাক যুদ্ধে এখনও মাসটার্ড গ্যাস, টাবুন গ্যাস, ও কুকিং গ্যাস, আর্সেনিকালস এবং বিভিন্ন ধরনের মাইক্রোবায়োলজিক্যাল জারম এজেনটস ব্যবহার করা হচ্ছে। তার ফলে অদূর ভবিষ্যতে এই দুই দেশেই হাজার হাজার মানুষের একেবারে পঙ্গু ও নির্জীব হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা।

জ্যোতির্ময় গুপ্ত

শিল্পী বিকাশ ভট্টাচার্য

জন্ম কলকাতায়, ১৯৪০ সালে।

১৯৬৩ সালে কলকাতার ইনডিয়ান কলেজ অব ফাইন আর্টস অ্যানড ড্রাফটম্যানশিপ থেকে ডিপ্লোমা লাভ করেন। ওই প্রতিষ্ঠানেই কাজ করেন ১৯৬৮-৭২। কলকাতার কলেজ অব আর্ট অ্যানড ক্র্যাফট-এ কাজ করেন ১৯৭৩ থেকে ১৯৮২ পর্যন্ত।

নতুন দিল্লীর ললিতকলা অকাদেমীর জেনারেল কাউন্সিল এবং একজিকিউটিভ বোর্ডের সদস্য। কলকাতার সোসাইটি অব কনটেমপোরারি আর্টিস্টস-এর সক্রিয় সদস্য।

পুরস্কার অর্জন : ১৯৭১ ও ১৯৭২-এ জাতীয় পুরস্কার। ১৯৬২ সালে কলকাতার অকাদেমী অব ফাইন আর্টস থেকে। ১৯৭২ সালে বিড়লা অকাদেমী অব আর্ট অ্যানড কালচারের পুরস্কার।

১৯৬৫ থেকে ১৯৮৪ পর্যন্ত ভারতের বিভিন্ন শহরে তেরোটি একক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ ছাড়া স্বদেশে এবং বিদেশে বহু চিত্রপ্রদর্শনীতে তাঁর চিত্ররচনা প্রদর্শিত হয়েছে।

ভারতের বিভিন্ন স্থানের সংগ্রহশালায় তাঁর চিত্রকর্ম সংগৃহীত আছে।

সেপ্টেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীমতী গৌরী আইয়ুবের প্রবন্ধটির সঠিক শিরোনাম : 'কাবিননামহ্‌ বনাম বসুধারা : অসম্পূর্ণ পরিচয়ের সূত্রে।' পাঠকেরা অনুগ্রহ করে সংশোধন করে নিলে বাধিত হয়।

সম্পাদক

দেশে বিদেশে

ধর্মঘট ইত্যাদি

শ্রমিক এবং তার নিয়োগকর্তার মধ্যে বিরোধ নিরপরাধ তৃতীয় পক্ষের কত দূর নিগ্রহের কারণ হতে পারে, নতুন করে তার পরিচয় পাওয়া গেল সেপটেম্বরের প্রথম সপ্তাহে। রাঁচির মনোরোগীদের হাসপাতাল থেকে ৫ই সেপটেমবর ৪৬০ জন রোগী পালিয়ে যান। পরদিন তাঁদের ন-জনকে পাওয়া যায় মৃত অবস্থায়। ৭ তারিখে জানা যায়, ১০০ জন তখনো নিখোঁজ। অন্যদের এখান-ওখান থেকে ধরে আনা হয়েছে। ধরা পড়ে তাঁরা এখন কী অবস্থায় আছেন, বাইরের জগৎ আবার কবে যে খোঁজ পাবে কে জানে!

তাঁদের সম্বন্ধে দুশ্চিন্তার কারণ, যাঁরা পালিয়েছিলেন, পরে জানা গেছে, তাঁরা আসলে প্রাণের দায়ে পালাতে বাধ্য হয়েছিলেন। পালাতে পেরেছিলেন—তার কারণ, হাসপাতালের গেট বন্ধ করবার লোক ছিল না। তেমনি আবার রোগীদের খাবার, এমন-কি পানীয় জল দেবারও লোক ছিল না। দু দিন নির্জলা উপবাস পালন করবার পর, মানসিক-রোগগ্রস্তরা বেরিয়ে পড়েন আমাদের এই সুস্থ-মনাদের জগতে, একটু অন্নজলের প্রত্যাশায়।

কে যেন বলেছিলেন, মানুষ যত দেখছি, কুকুরের ওপর আমার ভালোবাসা তত বেড়ে যাচ্ছে। সন্দেহ হতে পারে, অসহায় মনোরোগীদের অন্ন যোগানোর দায়িত্ব যারা অম্লানবদনে অস্বীকার করতে পারে তারাই কি সুস্থ মনের অধিকারী, আর সেই রোগীরাই তাদের চাইতে অসুস্থ?

বিহার সরকারের নন-গেজেটেড কর্মচারীরা ধর্মঘটে রত, কাজেই রাঁচির মানসিক হাসপাতালের রোগীরা যদি না খেয়ে মারা যান, সেদিকে ফিরে তাকানো শ্রমিক-কর্মচারীদের সংগঠনের প্রতি, তাঁদের আন্দোলনের প্রতি, তাঁদের সংগ্রামী মনোভাবের প্রতি, চাই কি বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণীর শৃঙ্খলমুক্তির সংগ্রামের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার শামিল। এই জংগি জিগিরের সামনে মানবোচিত হৃদয়বৃত্তি যদি মুখ লুকোতে চায়, তাহলে ঈডিথ ক্যাভেল নাম্নী জনৈকা নার্সকে আমরা স্মরণ করতে পারি। তিনি মানবপ্রেমকে দেশপ্রেমের ঊর্ধ্বে স্থান দিয়েছিলেন। আর্তের প্রতি অনুকম্পায় শত্রু-মিত্রের ভেদাভেদ করতে ভুলে গিয়েছিলেন। তারপর বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে তিনি একটি কালজয়ী প্রত্যয় উচ্চারণ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "পেট্রিয়টিজম ইজ নট এনাফ।"

নট এনাফ। শ্রেণী-শত্রুকে পর্যুদস্ত করতে হবে, শ্রমিকশ্রেণীর বিশ্বব্যাপী সংগ্রামকে দুর্বারগতিতে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে, শোষণের অবসান ঘটাতে হবে, সর্বহারার সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হবে, এবং যে-যে দেশে সর্বহারার স্বর্গ এখনো প্রতিষ্ঠিত হয় নি, সেই-সেই দেশে শ্রমিকের জন্যে অধিকতর মজুরি, চাকরির নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা, ক্যানটিনে প্রায় বিনামূল্যে খাদ্য, টেরিকটনের পোশাক, এবং সে পোশাক না-পরবার স্বাধীনতা ইত্যাদি দাবি আদায় এবং সংরক্ষণ করতে হবে। ধরা যাক, এ সবই শ্রমিক আন্দোলনের অনস্বীকার্য লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য। তবু, আর্তের সেবার বৃত্তি যদি আমি গ্রহণ করে থাকি, তবে অন্য এক আনুগত্য আমাকে অনুভব করতেই হবে, দেশের প্রতি নয়, জাতির প্রতি নয়, শ্রেণীর প্রতি নয়—সেই অক্ষম, দুর্বল ব্যক্তিটির প্রতি, যে আমার ওপর নির্ভরশীল।

যত রকমের প্রতিবন্ধী আছে, তার মধ্যে মনোরোগী সবচেয়ে অসহায়, অক্ষমতা একেবারে তার সত্তার মূলে। সেই মনোরোগীরা যখন দলে-দলে হাসপাতাল থেকে পালিয়ে যান, তখন বুঝতে হবে, নিছক বেঁচে থাকার তাগিদে মরীয়া হয়ে তাঁরা রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছেন। যে শ্রমিক-আন্দোলন তাঁদেরকে রাস্তায় ঠেলে দিল, তার গতিপ্রকৃতি নিয়ে এখন নতুন করে ভাববার সময় এসেছে।

অথচ সেরকম কোনো ভাবনাচিন্তার লক্ষণ আমাদের দেশে দেখা যাচ্ছে না। রাঁচির ঘটনা অবশ্য অমানুষিকতার চূড়ান্ত কিন্তু, অতটা না হলেও, আন্দোলনের মুখে মানুষের নানা দুর্গতির খবর আজকাল দেশের নানা জায়গা থেকে প্রায়ই আসছে। কখনো কখনো বড় ভয়ংকর চেহারা নিয়ে দাঁড়াচ্ছে এই-জাতীয় ঘটনা।

তরুণ সুশান্ত গড়াই ছিলেন কৃতী সাইকেল-চালক। রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের ধর্মঘটের দিন গত ৪ সেপটেমবর এক পথদুর্ঘটনায় সাংঘাতিক জখম হয়ে কল্যাণী হাসপাতালে আনীত হন, এবং তার অল্পক্ষণ পরে মারা যান। সুশান্তর দাদার একটি অভিযোগ খবরের কাগজে বেরিয়েছে। তিনি বলেছেন, হাসপাতালের একজন ধর্মঘটী শ্রমিকের বাধাদানের ফলে সারজন জরুরি ডাক পেয়েও বাসস্থান থেকে হাসপাতালে আসতে পারেন নি। অর্থাৎ, হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে বিনা চিকিৎসায় মারা গেলেন এক তরুণ যুবক।

এই অভিযোগ যদি সত্যি হয়, ধর্মঘটের কর্তাদের ভেবে দেখা কর্তব্য, কত বড়ো অপরাধের বোঝা তাঁরা নিজেদের কাঁধে টেনে আনছেন। হাসপাতালের ইমারজেনসি বিভাগ ধর্মঘটের আওতার

বাইরে থাকবে, ঘোষণা করা হয়েছিল। তা সত্ত্বেও, সেই ইমারজেনসিতেই মরণোন্মুখ আর্তের চিকিৎসায় অগ্রসর চিকিৎসকের পথরোধ করে দাঁড়ালেন ধর্মঘটীরা। ধর্মঘটের ডাক যাঁরা দিয়েছিলেন, এর দায়িত্ব তাঁরা অস্বীকার করতে পারেন না। চৌরিচৌরার দায়িত্ব অস্বীকার করেন নি গান্ধী, তৎক্ষণাৎ আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন।

ধর্মঘটের নেতারা কোনোদিন এসব দায় স্বীকার করেন না। সর্বাধিক-সংখ্যক ব্যক্তির সর্বাধিক-পরিমাণ দুঃখ-কষ্টের কারণ হতে পারলে তবেই তাঁরা মনে করেন তাঁদের আন্দোলন পরিপূর্ণতা লাভ করল। যেমন, রাস্তা দিয়ে মিছিল নিয়ে যাওয়ার স্থান-কাল নির্বাচন করা হয় এমনভাবে যাতে জটিলতম যানজট সৃষ্টি করা যায়। তেমনি শ্রমিক-আন্দোলনেরও একটা চোখ থাকে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রায় যত দূর সম্ভব জটিলতা সৃষ্টির দিকে।

এ নিয়ে বেশি অনুযোগ করেও লাভ নেই, কেননা কার্য উদ্ধারের এইটেই হয়তো প্রকৃষ্ট পন্থা। মুখে কেউ না বললেও মনে-মনে সবাই জানেন, ধর্মঘটে ফলপ্রাপ্তির প্রক্রিয়াটা এই পথে সাধারণত এগোয়—ধর্মঘট—জনজীবনে সংকট—সংকট-ত্রাণের জন্যে ব্যাকুলতা —কর্তৃপক্ষের অসহায়তা—ধর্মঘটীদের দাবিপূরণ—ধর্মঘটের অবসান। ব্রিটেনে খনি-শ্রমিকদের এক বৃহৎ অংশের ধর্মঘট চলছে গত এপ্রিল থেকে। আজও যে সে ধর্মঘট সফলতার ধারে-কাছে পৌঁছতে পারে নি, তার একটা প্রধান কারণ ভান্ডারে প্রচুর কয়লা মজুদ। (অন্য কারণও অবশ্য আছে, কিন্তু সে প্রসঙ্গ পরে আসবে।) অতএব স্বভাবতই ধর্মঘটের প্রথম বলি জনস্বার্থ।

তা সত্ত্বেও, জনসাধারণের কাছেই প্রথম আহ্বান আসে, 'ধর্মঘট সমর্থন করুন, আমাদের পাশে দাঁড়ান' ইত্যাদি ইত্যাদি। এই আহ্বানে জনসাধারণের সাড়া ক্রমশই ক্ষীণ হয়ে আসছে। আনন্দবাজার পত্রিকায় ধর্মঘটের ব্যর্থতার একটি প্রধান কারণ জনসমর্থনের অভাব (এক্ষেত্রেও অন্য কারণ ছিল, এবং সে কথাও পরে।) ব্রিটেনে সেপটেম্বরের প্রথম সপ্তাহে এক জনমতসমীক্ষায় দেখা যায়, খনিশ্রমিক ধর্মঘটের সমর্থক জনসাধারণের এক-তৃতীয়াংশেরও কম। ধর্মঘটের নেতাদের তার চেয়েও বিচলিত করে আরেকটি তথ্য। বিভিন্ন ইউনিয়ন-ভুক্ত শ্রমিকদের মধ্যে সমীক্ষায় প্রকাশ পায়, তাঁদের ৮০ শতাংশ ধর্মঘটীদের পিকেটিং অমান্য করতে প্রস্তুত, এবং ধর্মঘটী ইউনিয়নকে অর্থ সাহায্য করতে প্রস্তুত, এমন শ্রমিকের সংখ্যা ১৬ শতাংশের বেশি নয়।

ব্যাপক জনসমর্থন তো দূরের কথা, যাঁদের নামে ধর্মঘট ডাকা হয়, সেই শ্রমিক-কর্মচারীদের অধিকাংশের সমর্থনের ওপরও ধর্মঘটের নেতাদের ভরসা ক্রমেই কমে আসছে। একটি প্রতিষ্ঠানের কতজন প্রস্তাবিত ধর্মঘটের সপক্ষে, আর কতজন তার বিরোধী, তা নির্ধারণ করবার একমাত্র নির্ভরযোগ্য পন্থা গোপন ব্যালট। কারো ভয়ে নয়, কোনো চাপে নয়, নিজের বিচার-বিবেচনার থেকে উদ্ভূত নিজস্ব সিদ্ধান্ত জানাবার অন্য কোনো পদ্ধতি আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নি। অথচ এই গোপন ব্যালটকে ধর্মঘটে কৃতসংকল্প নেতারা প্রায়শই খুব সন্দেহের চোখে দেখে থাকেন। কেন? যেহেতু তাঁরা কৃতসংকল্প, এবং গোপন ব্যালটের ফলাফল তাঁদের সংকল্পের বিরুদ্ধে যেতে পারে, এমন আশঙ্কার যথেষ্ট কারণ বর্তমান।

আমরা সবাই গণতন্ত্র চাই, অথচ যেখানে ক্ষমতা আমার হাতে ন্যস্ত, সেখানে যূথবদ্ধ মানুষকে (অবশ্য তাদেরই মঙ্গলের জন্যে) আমরা নির্ধারিত পথে ভেড়ার পালের মতো তাড়িয়ে নিয়ে যেতে চাই। বিশ্বব্যাপী শ্রমিক-অন্দোলন আজ কত দিন ধরে এই গাইডেড ডেমক্রেসির পথে চলেছে, এবং চলতে-চলতে আজ কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে, ভেবে দেখবার বিষয়।

অন্তত একটা ব্যাপার ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে আসছে। শ্রমজীবীরা নেতাদের হাতে ভাবনাচিন্তার ভার চোখ বুঁজে সমর্পণ করার বদলে নিজের ভালোমন্দের চিন্তা নিজে মাথায় নিতে আরম্ভ করছেন। আনন্দবাজারের ধর্মঘটের ব্যর্থতার বড়ো কারণ এইটি। আর, শুধু ভাবনাচিন্তাই নয়, নিজেদের সিদ্ধান্ত, প্রতিপক্ষের সশস্ত্র আক্রমণের মুখে দাঁড়িয়ে, কার্যে পরিণত করতেও তাঁরা প্রস্তুত হচ্ছেন।

ব্রিটেনের খনিশ্রমিক ধর্মঘটের নেতারা খনিশ্রমিকদের প্রকৃত মতামত জানবার জন্যে দেশব্যাপী গোপন ব্যালটের পথে গেলেন না, যদিও সংগঠনের নিয়ম অনুযায়ী ধর্মঘটের আগে সেটা কর্তব্য ছিল। তার বদলে স্থানীয় ভিত্তিতে ধর্মঘট ডেকে তাঁরা অন্যত্র তা ছড়িয়ে দেওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ মনে করলেন। "যদি কথায় না হয়, লাঠির জোরে ধর্মঘট ছড়িয়ে দাও", এই হল তাঁদের নীতি। এখন শতকরা ৮০ জন খনিশ্রমিক ধর্মঘটের শামিল, বাকি ২০ জনকে কিছুতেই বাগে আনা যাচ্ছে না। অর্থাৎ এঁরা যেসব খনিশ্রমিক ইউনিয়নের সভ্য, ধর্মঘটে তাঁরা যোগ দেন নি। এঁদেরকে পথে আনবার এখন দুটো পন্থা। এক, নিয়মের এমন পরিবর্তন করা, যাতে ধর্মঘট আহ্বান করবার জন্যে এখনকার মতো সংখ্যাধিক্যের প্রয়োজন না হয়; দুই, সন্ত্রাসের সৃষ্টি করে, অধর্মঘটী শ্রমিকদের এবং তাঁদের পরিবারের ওপর আক্রমণ চালিয়ে তাঁদের বশে আনা। দেশের লোক টেলিভিশনের পরদায় এইসব হিংস্র আক্রমণের ছবি দেখেছেন। ফলে, ধর্মঘটের জনপ্রিয়তা বাড়ছে না, বলা বাহুল্য। ধর্মঘটের প্রধান হোতা ন্যাশন্যাল ইউনিয়ন অব মাইন ওয়ারকারসের নেতা আরথার স্কারগিলকে এই হিংসাচারের নিন্দা করতে অনুরোধ করা হলে তিনি বলেন, "এ বিষয়ে আমার মত শ্রেণী-

ভিত্তিক। যাঁরা পিকেট করছেন তাঁদের একমাত্র অপরাধ নিজেদের জীবিকা রক্ষার জন্যে তাঁরা সংগ্রাম করছেন। আমি তাঁদের নিন্দা করতে রাজি নই।"

জীবিকার প্রশ্নই যে ব্রিটেনের এই ধর্মঘটের মূল প্রশ্ন, তা অবশ্য ঠিক। যেসব শ্রমিক দেশের মধ্যে সর্বোচ্চ-পরিমাণ অর্থ উপার্জন করেন, কয়লাখনির শ্রমিকরা তাঁদের অন্যতম। এখন, ন্যাশন্যাল কোল বোর্ড সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যেসব কয়লাখনি প্রচুর লোকসানে চলছে সেগুলি বন্ধ করে দেওয়া হবে। থ্যাচার-সরকারের নীতি, সরকারি এবং আধা-সরকারি কারবারে লোকসান কমিয়ে এনে ব্রিটেনের অর্থনীতিকে কালোপোযোগী করে তোলা। কয়লাখনি-সংক্রান্ত এই সিদ্ধান্ত সে নীতির সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ। অথচ এর ফলে বহুসংখ্যক খনিশ্রমিক যে বেকার হয়ে পড়বেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তাঁদের অসন্তোষ, অতএব, অমূলক নয়। কিন্তু লোকসানের কারবার, সরকারি হলেও, চিরদিন চালিয়ে যেতে হবে—এ দাবি জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী। এই প্রত্যয়ের ভিত্তিতেই ব্রিটেনের বর্তমান রক্ষণশীল সরকার তাঁদের নীতি প্রণয়ন করেছেন, এবং সেই নীতি ঘোষণা করেই তাঁরা বিগত নির্বাচনে বিপুল ভোটে জিতেছেন। আগামী নির্বাচনে যে তাঁরা হেরে যাবেন, তারও বিশেষ কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। অতএব, ধরে নেওয়া যায়—জনমত, অর্থাৎ তার বৃহত্তর অংশ শ্রমিকদের এই আন্দোলনের প্রতি অনুকূল নয়।

সংগঠিত শ্রমিকের সঙ্গে অন্যদের স্বার্থের সংঘাত যদি বাড়তে দেওয়া হয়, এবং যদি অন্যেরা বুঝতে আরম্ভ করেন, সংগঠিত শ্রমিকদের উপার্জন, অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা এবং আদায়ীকৃত নানা অধিকার তাঁদের একটু বিশেষ-সুবিধা-ভোগী শ্রেণীতে পরিণত করেছে, এবং তার ওপরে আবার তাঁরা নতুন নতুন দাবি তুলেছেন, তার অবশ্যম্ভাবী ফল কী হতে পারে? এসব যাঁদের ভাববার বিষয়, তাঁরা কি ভাবতে আরম্ভ করেছেন?

মানুষ-বেচার ব্যাবসা

লোকচক্ষুর অন্তরালে গত বিশ বছর ধরে দুই প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মধ্যে এক মানুষ-বেচার ব্যাবসা চলছে। দীর্ঘকালের গোপনীয়তার পর সম্প্রতি তার বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে। বিক্রেতা পূর্ব জারমানির সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র আর ক্রেতা পশ্চিম জারমানির কোনো কোনো অধিবাসী। ব্যাবসাটা আরম্ভ হয় এইভাবে—

আজ থেকে বছর কুড়ি আগে পশ্চিম জারমানির তখনকার ডেপুটি চ্যানসেলর এবং জারমান-সম্পর্ক-বিষয়ক মন্ত্রী এরিথ মেনডে পূর্বজারমানিতে আটক রাজনৈতিক বন্দী কিনতে আরম্ভ করেন। তিনি অবশ্য প্রথম থেকেই বুঝেছিলেন, সম্পূর্ণ গোপনীয়তা রক্ষা করতে না পারলে, এ নিয়ে এমন একটা হৈ-চৈ উঠবে যে বন্দীমুক্তির এই অভিনব রাস্তা হয়তো অচিরেই বন্ধ হয়ে যাবে। পশ্চিম জারমানির সব প্রধান প্রধান সাময়িক পত্রিকা, সংবাদপত্র এবং টেলিভিশন অফিসে গিয়ে তিনি অনুরোধ জানাতে লাগলেন, এ খবর যেন ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ না পায়। আশ্চর্যের বিষয়, সে অনুরোধ এত দিন ধরে তাঁরা রক্ষা করে এসেছেন।

মেনডে বলেছিলেন, "পূর্ব জারমানির সঙ্গে আমাদের চুক্তিতে লেখা আছে, কোনোরকম প্রচার হলেই এ কারবার বন্ধ হয়ে যাবে।" বন্ধ হয় নি, বরং দিনে-দিনে ফুলে-ফেঁপে উঠেছে। তাতেই বোঝা যায়, হাজার প্রলোভন সত্ত্বেও, পশ্চিম জারমানির কোনো সংবাদমাধ্যম এই নীরবতা ভঙ্গ করে নি।

তার ফলে, অর্থের বিনিময়ে বন্দী-বিক্রয়ে পূর্ব জারমানির যেমন লাভ প্রচুর হয়েছে ঠিকই, কিন্তু আরেক দিকে দলে-দলে মানুষ বন্দী-দশা থেকে মুক্তি পেয়ে মুক্ত সমাজের খোলা বাতাসে নিঃশ্বাস নিয়ে বেঁচেছেন। সংবাদ-মাধ্যমসমূহের এই আত্মসংযম এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। কতদূর তারা লোভ সংবরণ করেছে তার একটি উদাহরণ : এই প্রক্রিয়ায় সদ্যোমুক্ত একজন বন্দী পশ্চিম জারমানিতে এসে একটি সংবাদপত্রের অফিসে গিয়ে তাঁর কাহিনী প্রকাশ করতে চান। সম্পাদকরা সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন।

প্রথম দিকে লেনদেনটা হত লুকিয়ে-চুরিয়ে। হয়তো পাতাল-রেলের সুড়ঙ্গের এদিক-ওদিক তাকিয়ে একজন আরেকজনের হাতে টাকা-ভরতি একটা খাম গুঁজে দিল। এখন আর অত লুকোছাপা নেই। বন্দীর বিনিময়ে পূর্ব জারমানি পাচ্ছে কাঁচামাল, যথা তেল, তামা ইত্যাদি। এমন-কি, পূর্ব জারমানির পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার হিসেবেও সেসব ধরা হচ্ছে। কিন্তু এখনও এ নিয়ে প্রচার নেই বললেই চলে। যাঁরা জানেন, তাঁরা এ নিয়ে কোনো প্রকাশ্য আলোচনা-বিতর্ক ইত্যাদিতে যেতে গররাজি।

এই লেনদেনের যখন সূত্রপাত হয় তখন দুই জারমানির মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিল না, যা কিছু করতে হত, তলে-তলে। কিন্তু ১৯৭২-এর চুক্তির পর সম্পর্ক অনেকটা স্বাভাবিক। এখন এই গোপনীয়তা কেন? এই প্রশ্ন অনেকে এখন করছেন।

এতদিন পর্যন্ত কিন্তু লেনদেন নিয়ে কোনো রাজনৈতিক দলই আপত্তি তোলে নি। এর শুরু হয় ক্রিশ্চান-ডেমক্র্যাট সরকারের আমলে, সোশ্যাল-ডেমক্র্যাট সরকার এসেও একে চালু রাখেন, এবং এখন ক্রিশ্চান-ডেমক্র্যাটরা ক্ষমতায় আসার পরও এই কারবার অব্যাহত। তার কারণ, নিছক মানবিকতার খাতিরেই এই বিনিময় মেনে না নিয়ে উপায় নেই। একজন মুক্তি-

প্রাপ্ত রাজনৈতিক বন্দী বলেছেন, "জানি, মানুষ নিয়ে ব্যাবসা অন্যায়, তবু বন্দীমুক্তির প্রচেষ্টা আমরা সমর্থন করব।"

কী অপরাধে এঁরা পূর্ব জারমানির কারাগারে বন্দী ছিলেন? জানা গেছে ১৯৬০-এর দশকে যাঁরা বন্দী ছিলেন তাঁদের বেশির-ভাগই জারমানিতে কমিউনিজম প্রবর্তনের প্রতিবাদ করেছিলেন বলে বন্দী হন। আর এখন যাঁদের ধরা হচ্ছে তাঁদের ৭০ শতাংশের একমাত্র অপরাধ—দেশ ছেড়ে তাঁরা পালিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁদের অধিকাংশের বয়স বিশ কিংবা তিরিশের কোঠায়।

১৯৬০ থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত প্রায় ২২,০০০ বন্দীর মুক্তি এইভাবে ক্রয় করা হয়েছে, মূল্য দিতে হয়েছে ৫ কোটি ৪০ লক্ষ ডলারের মতো।

বারলিনের প্রাচীর নির্মাণ করার সময়ে পূর্ব জারমান কর্তৃপক্ষ হয়তো ভাবতে পারেন নি—কত আর্থিক লাভের কারণ হতে পারে পূব থেকে পশ্চিমে পালাবার পথের এই বাধা।

৯. ৯. ১৯৮৪

ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

নাটক

জসমা ওড়ান

এ নাটকের প্রযোজক এন. এস. ডি. রেপার্টরি। দলটির সূচনা ১৯৬৪ সালে, চারজন সদ্য-নাট্যস্নাতক নিয়ে। এখন শিল্পী আর কর্মীর সংখ্যা—৩০। ১৯৭৫ সাল থেকে এঁরা ভারত সরকারের অর্থানুকূল্য লাভ করছেন।

নাটকের নির্দেশক শান্তা গান্ধী (১৯১৭—) বহু অভিজ্ঞতার অধিকারিণী। পুনের পিউপিলস ওন স্কুলের ছাত্রী। জাহাঙ্গীর ভকিলের এই স্কুল শান্তিনিকেতনের আদর্শে প্রতিষ্ঠিত। (ভকিল-কন্যা ইরা চৌধুরী শান্তিনিকেতনের ছাত্রী ছিলেন। ইন্দিরা গান্ধী কিছুদিন এই স্কুলের ছাত্রী ছিলেন—শান্তিনিকেতনে আসবার আগে।) এই স্কুলই শান্তার মনে শিল্পচেতনা জাগায়। স্কুলের নৃত্যনাট্যে যোগ দিতেন। ছাত্রী ছিলেন বিজ্ঞানের। এম-এস-সি পড়েছেন জেনেটিকসে, ডাকতারিও পড়েছেন। কোনোটাই শেষ করেন নি। ১৯৩৬-এ বিলেতে থাকতে স্প্যানিশ রিপাবলিকের মেডিক্যাল এইড ফানডে টাকা তোলার জন্য নৃত্যানুষ্ঠানে যোগ দেন। উদয়শঙ্করের আলমোড়া নৃত্যকেন্দ্রে ছিলেন। পরে যোগ দেন ভারতীয় গণনাট্য সংঘে—ওই সংঘের সেনট্রাল ব্যালে ট্রুপে ছিলেন। তখন রবিশঙ্কর আর শান্তি বর্ধনের সংস্পর্শে আসেন, নানা নৃত্যনাট্যের সঙ্গে যুক্ত হন। লোকনৃত্য-লোকনাট্য অনুশীলনের জন্য আদিবাসীদের মধ্যে কিছুকাল বাস করেন। শিশুনাট্যের প্রযোজনারীতির অনুশীলন করেছেন ইউরোপে আমেরিকায়। নৃত্য এবং নাট্যের মাধ্যমে শিশুশিক্ষায় আগ্রহী। বোমবাইয়ে তাঁর দল 'রঙ্গবীজ' শিশুদের জন্য নাটক করে আসছে অনেক কাল। দিল্লির ন্যাশনাল স্কুল অব ড্রামার অধ্যাপিকা, বর্তমানে তার চেয়ার-পারসন। একাধিক ধ্রুপদী এবং লোকনাট্যের নির্দেশক।

ভাওয়াই (গুজরাতি লোকনাট্য) দলগুলি যেসব পালা করে তার নাম—'বেশ'। যে ৫০-৬০টি বেশ এখনও পাওয়া যায় তার একটি হচ্ছে 'জসমা ওড়ান'। বেশ-এ একটা কাহিনী-কাঠামো থাকে, তাকে সম্পূর্ণ করে তোলেন শিল্পীরা—বিস্তার ঘটান। একটা মাত্রায় স্বাধীনতা থাকে শিল্পীদের। ড. সুধা দেশাই আর অমৃত নায়ক-সংগৃহীত দুটি কাঠামোর সাহায্যে শান্তা গান্ধী রচনা করেছেন তাঁর এই 'জসমা ওড়ান'। প্রথমে গুজরাতিতে (১৯৬৭)। পরে ড. শ্যাম পারমারের সহযোগিতায় মালবী হিন্দিতে অনুবাদ করেছেন। ১৯৬৮ সালে এন. এস. ডি.-র ছাত্রদের নিয়ে প্রথমে করেন—ন্যাশনাল স্কুলের বিদেশী ধরনধারনের মধ্যে এমন হাওয়া আনেন যা দেশী আর তাজা।

গুজরাতি লোকনাট্য—ভাওয়াই। কারো মতে, এর সূচনা ৬০০ বছর আগে, কারো মতে ৮০০। রাজস্থানে মধ্যপ্রদেশেও এর কিছুটা চল আছে। আশ্বিন মাসে নবরাত্রি উৎসবের সময় অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। কিন্তু পেশাদার দলগুলি এখন, বৃষ্টির কয়েক মাস ছাড়া, সারা বছরই অনুষ্ঠান করে। দলপতি খোলা জায়গায় বড়ো একটি গণ্ডি আঁকে—এই গণ্ডির নাম 'চাচর'। এটিই আসর—এরই মধ্যে অভিনয় হয়। চাচর-এর বাইরে বসে দর্শকেরা। ভাওয়াইর অধিষ্ঠাত্রী দেবী অম্বা। তাঁর আর গণপতির (অনেক ক্ষেত্রে সরস্বতীরও) আশীর্বাদ প্রার্থনা করে অনুষ্ঠান শুরু হয়। অনুষ্ঠান চলে সারা রাত। একাধিক 'বেশ' হয়। মধ্যের যোগসূত্র বাজনা আর গরবা নৃত্য। ভাওয়াইতে মেয়েরা যোগদান করে না—ছেলেরা মেয়েদের ভূমিকা নেয়। বেশ-এর কাহিনী-কাঠামোকে ভরাট করে তোলে অভিনেতা-উদ্ভাবিত সংলাপ, ক্রিয়া, গতিবিধি, এবং শারীরিক ক্রিয়াকৌশল। প্রত্যেক অভিনেতা তার চরিত্রকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য একটা কোনো স্টাইলাইজড ভঙ্গি গ্রহণ করে। রংলা প্রধান কমিক চরিত্র—তার রঙ্গব্যঙ্গ থাকে, সমাজ-সমালোচনার টিপ্পনি থাকে। সে কোনো 'চরিত্র' হয়ে যেতে পারে, আবার নিরপেক্ষ মন্তব্যও করতে পারে। রংলা (এবং নায়ক) কাহিনীকে পরিচালিত করে, গতি দান করে—সূত্রধারের মতো।

উচ্চাঙ্গসংগীত আর লোকসংগীত—দুয়েরই ব্যবহার হয়। বাদ্যযন্ত্র থাকে ঢোলক, পাখোয়াজ, সারেঙ্গী, ঝাঁঝ। তবে ভাওয়াই-সংগীতের প্রাণ—ভুংগাল। লম্বায় পাঁচ ফুটের ওপর, সরু, এক-রকমের বাঁশি। একাধিক থাকে। ভুংগাল অনুষ্ঠানের সূচনা ঘোষণা করে, বিভিন্ন চরিত্রের প্রবেশ আর প্রস্থানের জানান দেয়। চরম মুহূর্তগুলি সুচিহ্নিত করে, গায়কের কণ্ঠে সুর ধরে রাখতে সাহায্য করে। অনেক সময় বাদকদল চাচরের চারদিকে ঘুরে-ঘুরে বাজিয়ে দর্শকদের মনোরঞ্জন করে। বাদকদের পোশাক সাধারণ হতে পারে, কিন্তু ভুংগাল-সরদারের পোশাক জমকালো। শিল্পীদের বেশভূষাও রঙচঙে।

মশাল জ্বালিয়ে অভিনয় হয়। অনেক সময় শিল্পীরাও মশাল-হাতে অভিনয় করেন—মুখের অভিব্যক্তি দর্শকদের কাছে তুলে ধরবার জন্যে।

শান্তা গান্ধী চাচরে নয়, মঞ্চে অভিনয় করিয়েছেন। দেবদেবীর বন্দনা-অনুষ্ঠান বাদ দিয়েছেন। মেয়েরা নিয়েছেন মেয়েদের ভূমিকা। ভুংগাল ব্যবহার করেছেন, কিন্তু তা অনেক সীমিত। মূল অভিনয় করিয়েছেন বিদ্যুৎ-আলোয়। কিন্তু শিল্পীরা প্রথমে মশাল-হাতেই ঢোকে, এবং শেষদিকের একটি দৃশ্যে মশালকে সুন্দরভাবে ব্যবহার করেছেন শান্তা গান্ধী।

এ তো গেল নাট্যরীতির কথা। নাট্যকাহিনী আমাদের অপরিচিত, তাই সেটা সংক্ষেপে একটু জেনে নেওয়া যাক।

নালা ঋষি তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করলে ইন্দ্রের সিংহাসনের অধিকারী হবেন। তাই তাঁকে তপোভ্রষ্ট করবার জন্যে অপ্সরা কামকুণ্ডলাকে নিয়োগ করলেন ইন্দ্র। কামকুণ্ডলা সখীদের নিয়ে নৃত্যগীত করে নালার ধ্যান ভাঙল। নালা তখন কামকুণ্ডলাকে অভিশাপ দিলেন, 'পৃথিবীতে গিয়ে ভ্রাম্যমাণ 'ওড়' সম্প্রদায়ের (এরা মাটি কাটে, পুকুর তৈরি করে, ঘর বানায় ইত্যাদি) মধ্যে তোমাকে জন্ম নিতে হবে, আর তোমার বিয়ে হবে কুৎসিত এক খোঁড়া লোকের সঙ্গে। কামকুণ্ডলাও ক্রুদ্ধ হয়ে নালাকে অভিশাপ দিলেন, 'তোমাকেও তাহলে মর্ত্যলোকে জন্মাতে হবে, ওড় সম্প্রদায়েই, আমার ঐ কুৎসিত খোঁড়া স্বামী হিসেবে।' তাই হল। কামকুণ্ডলা জসমা নামে জন্ম নিল, আর তার বিয়ে হল কুৎসিত খোঁড়া রূপাজীর (নালা) সঙ্গে। পাটনের রাজা জসমাকে লাভ করবার জন্যে নানা প্রলোভন দেখায়। জসমা প্রত্যাখ্যান করে, গাল দেয়। সে তার খঞ্জ কুরূপ স্বামীর প্রতি বিশ্বস্ত থাকে। রাজা তখন গোটা ওড় সম্প্রদায়কে হত্যার আদেশ দেন। সবাই—জসমার স্বামী রূপাজীও নিহত হয়। জসমা সতী হওয়ার আগে রাজাকে অভিশাপ দেয় 'তোমার রাজ্য সম্পূর্ণ ধ্বংস হবে। তোমার প্রাসাদে একটি মসজিদ বসবে।' জসমা 'সতী' হয়। জসমার ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে এক ফকির আসে এবং জসমা এবং তার ওড় সম্প্রদায়কে বাঁচিয়ে তোলে।

শান্তা গান্ধী কাহিনীর কিছু বদল করেছেন। 'সতী'-র ওপর জোর দেন নি তিনি। মেহনতি মহিলার সৎ শ্রমকে গৌরবদান করেছেন। রাজা যখন জসমাকে পৃথক রাজকীয় আহার-বাসস্থানের প্রলোভন দেখায়, জসমা বলে, "সবাই যা খায়, আমি তাই খাব। সবাই যেখানে থাকে, সেখানে আমি থাকব।" শাপমুক্ত জসমার কাছে যখন স্বর্গে ফেরবার ডাক আসে, তখনো সে বলে, "সবাই যা খায়, আমিও তাই খাব। সবাই যেখানে থাকে, আমিও সেখানে থাকব।" সে পৃথিবীতে থাকবে, স্বর্গে যাবে না। স্বর্গ তার কাছে বড়োই নিষ্প্রাণ আর একঘেয়ে। (এখানে যেন রবীন্দ্র-চিন্তার প্রতিধ্বনি।) পুরাকথা আর লোককথায় শাপভ্রষ্ট নায়ক-নায়িকারা সাধারণত স্বর্গেই ফিরে যায়। জসমা তা যায় নি। এই মর্ত্যাভিমুখিতা গল্পে নতুন সংযোজন। শান্তা-ভাষ্যে ফকির আর মসজিদের প্রসঙ্গ নেই। আছে পাটন রাজ্য ধ্বংসের অভিশাপ।

কামকুণ্ডলা কুহকিনী, কামনার আকর্ষণে টানে। শান্তা-ভাষ্যে সে সৃষ্টিশীল শিল্পী। জসমা শিল্পীর গর্ব আর মর্যাদাবোধ নিয়ে জন্মেছে। ভণ্ড নালা ঋষিকে করা হয়েছে নির্ভীক সত্যসন্ধানী। পঙ্গু কুরূপ রূপাজী হয়েছে নালার দার্শনিক মনের অধিকারী। আশপাশের জগৎ এবং মানুষ—সব-কিছু থেকেই সে শিক্ষা নেয়, তার তুচ্ছ কাজেও শিল্পসুষমা থাকে।

মঞ্চে কোনো সেট বা সীন নেই, থাকার মধ্যে আছে ছোটো একটা চৌকি। সেটি সর্বার্থসাধক। আমাদের যাত্রার চেয়ারের মতো। এখানে চৌকিটা সিংহাসন, তপস্যার আসন, কখনো বা গ্রাম্য নেতার বসার জায়গা। রংলা আর নায়ক এটাকে ঘাড়ে করে নিয়ে যত্রতত্র বসায় আর চৌকির জন্মান্তর ঘটে।

নাচে-গানে-রঙ্গরসে জমজমাট এ প্রযোজনা। প্রায় প্রত্যেক শিল্পীই নাচতে পারেন, গাইতে পারেন। পুরুষ-শিল্পীরাও।

রাজার আদেশে ওড় সম্প্রদায়কে যখন ধ্বংস করা হয়, তখন বহু মশাল হাতে ধ্বংসকে প্রকাশ করে বহু শিল্পীর যৌথ নৃত্য। ক্রমে সব মশাল মিলিয়ে যায়—ধ্বংস শেষ। একটি ছোটো মশাল থাকে জসমার হাতে। মশালটা জ্বলতেই থাকে। তার স্বামী আর সম্প্রদায়ের মৃত্যু তাকে পাথর করে দিয়েছে। সেই অভিব্যক্তি মশাল-আলোয় স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয়। তারপর ওই আগুনই 'সতী' হওয়ার প্রতীক হয়ে যায়। এত মৃত্যু—এ-সবেরই কারণ সে নিজে—কারণ তার সততা তার স্বামীর প্রতি। বিশ্বস্ত সে মজুর হিসেবেও ; কাজ বাকি থাকলে বেশিক্ষণ থেকেও কাজ তুলে দেয় ; কাজের মজুরি ঠিকমতো না পেলে ক্ষুব্ধ হয় ; কাজের মজুরি যা, তার চেয়ে বেশি নেয় না। তার জন্যে এই হত্যা! হৃদয়ে তার আগুন জ্বলে। বলে, 'হৃদয়ে আমার আগুন'। মশালের আগুন, 'সতী'র চিতার আগুন, আর হৃদয়ের আগুন—সব মিশে একাকার। ওই আগুন থেকে

উচ্চারিত হয় একটি অভিশাপ-স্ফুলিঙ্গ : 'পাটনও একদিন এইভাবে ধ্বংস হবে।'

নাটকের উজ্জ্বলতম দৃশ্য এটি। শান্তা গান্ধীর শিল্পকৃতির চরম নিদর্শন। জসমা-রূপী উত্তরা বাওকরের অভিনয়দক্ষতারও বিশেষ দৃষ্টান্ত এটি। এই দৃশ্যটি একক অভিনয়ে রচিত।

বহুজনের রচিত চমৎকার দৃশ্য পাই জসমার বিয়ের সময়। বহু মানুষ, বহু অনুষ্ঠান। বরপক্ষ, কনেপক্ষ। তারপরে খোঁড়া বর নিয়ে লেগে যায় প্রচণ্ড বিবাদ। জোর ঝগড়া—বরপক্ষ বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। জসমা জানায় সে কুরূপ স্বামীকেই বিয়ে করবে। 'ফেরাও ওদের।' আবার ওরা ফেরে। বাধো-বাধো উৎসবের মেলামেশা, আবার বিয়ের আনন্দকোলাহলও থাকে। এসে যায় কন্যার পিতৃগৃহত্যাগের দৃশ্য। আনন্দে-বিষাদে বিচিত্র এক বিদায়দৃশ্য রচনা করেছেন শান্তা গান্ধী বহু শিল্পীকে মঞ্চে নিয়ে।

উত্তরা বাওকরের (জসমা) সুযোগও ছিল বেশি। সে সুযোগের সদ্ব্যবহারও করেছেন তিনি উত্তমরূপে—তাঁর নৃত্যে, গীতে, অভিনয়ে।

সুরেকা সিকরি করেছেন জসমার সৎ-মা। ঈষৎ স্টাইলাইজড তাঁর অভিনয়। চোখে ও চরণে ক্ষিপ্রতা। ঈর্ষা আছে সৎ-মেয়ের প্রতি—সেটা তীক্ষ্ণভাবে প্রকাশও করে। জসমার বিয়ের দেনাপাওনা কেমন হবে—পরদার আড়াল থেকে দরদাম করে। আবার খোঁড়া বর দেখে ক্ষুব্ধ হয়, জসমার বিদায়ে সত্যিকার দুঃখ পায়। এইসব আলো আর ছায়া তাঁর চোখে আর বাগ্‌ভঙ্গিতে মুহুর্মুহু এসে যায়।

রংলা চরিত্রটি করেছেন রঘুবীর যাদব। তুখোড়—এই একটি শব্দে তাঁর পরিচয়। রঙ্গে-ব্যঙ্গে জমিয়ে রেখেছেন, আবার কাহিনীকে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছেন—নিজেরা ছুটে-ছুটে।

রঙ্গ-রসের মধ্যে কুরূপ এবং ঈষৎ বিষণ্ণ দার্শনিক চরিত্রকে (রূপাজী) ফুটিয়ে তোলা আর দর্শককে আকৃষ্ট করা খুবই শক্ত কাজ। বসন্ত যোসালকার এই দুরূহ কাজটি কৃতিত্বের সঙ্গে করেছেন।

উত্তরা বাওকরের তিনটি অভিনয় কলকাতার মঞ্চে আমরা দেখেছি—'খাড়িয়া-কা ঘেরা' (ককেশিয়ান চক সারকল) নাটকে গ্রুশা, 'বর্ণম বন' (ম্যাকবেথ) নাটকে লেডি ম্যাকবেথ, এবং জসমা। আলাদা ধরনের সব চরিত্র। কিন্তু অতি দক্ষ রূপদান। জসমা চরিত্রটি অবশ্য আর-একটু কমবয়সি মেয়ের। তবু অভিনয়গুণে তিনি আমাদের তা মনে রাখতে দেন না।

শান্তা গান্ধী নিজেকে 'কমিটেড' শিল্পী মনে করেন। সমাজের প্রতি তিনি দায় বোধ করেন। লোকনাট্যকে বর্তমান মঞ্চে আনার সমস্যা হিসেবে তাঁর মনে হয়েছে : এই লোকমাধ্যমগুলি খুবই শক্তিশালী। কিন্তু এদের মূল্যবোধ মধ্যযুগীয়, সামন্ততান্ত্রিক। তাই তিনি মাধ্যমের শক্তি নিতে চান, ফিউডাল মূল্যবোধ নয়। এই দিকে তাকিয়েই তিনি এই লোকনাটকটির কিছু-কিছু পরিবর্তন করেছেন। 'সতী'কে করেছেন সৎ শ্রমিক। স্বর্গের চেয়ে মর্ত্যকে করেছেন অধিক কাম্য। এই প্রয়াস খুবই প্রশংসনীয়। কিন্তু একজন 'কমিটেড' শিল্পীর দায় তো অনেক বেশি। তাই নয় কি?

চিত্তরঞ্জন ঘোষ

বিশ্বসাহিত্য

উনবিংশ শতকের বাঙলা সাহিত্য আমাদের কাছে এক শ্রেষ্ঠ সাহিত্য। এখন প্রশ্ন হইল, এই সাহিত্য বিশ্বসাহিত্যের মর্যাদা লাভ করিয়াছে কিনা। কোনো এক দেশের সাহিত্য অনুবাদের মধ্য দিয়াই বিশ্বসাহিত্যের অঙ্গ হইয়া উঠে। আমরা ঐতিহাসিক কারণে ইংরাজের পাঠশালায় ইংরাজি শিখিয়া ইংরাজি সাহিত্য মূলেই পড়িয়াছি। ইহাতে আমরা একটি বড়ো সাহিত্য ওই সাহিত্যের ভাষায় পড়িবার সুযোগ পাইয়াছি। কিন্তু ইহাতে আমাদের কিছু লোকসানও হইয়া থাকিবে। অনুবাদের পথে সাহিত্যের রস বহুলাংশে শুকাইয়া যায়। আবার ঐ পথেই পরের সাহিত্য ঘরের সাহিত্য হইয়া পড়ে। স্যর টমাস নর্থের 'প্লুটার্কস লাইভ্‌স্' (১৫৭৯) অনুবাদের অনুবাদ। গ্রীক ভাষায় লিখিত এই জীবনীগ্রন্থখানির ফরাসি অনুবাদ (১৫৫৯) করেন ফরাসি পণ্ডিত আমিও, এবং সেই ফরাসি অনুবাদের ইংরাজি অনুবাদ বহুশ্রুত 'নর্থস প্লুটার্ক'। এই গ্রন্থ একখানি ইংরাজি ক্লাসিক। শেকসপিয়ারের প্লুটার্ক নর্থের প্লুটার্ক। জন ফ্লোরিওর মনটেনের অনুবাদও (১৬০৩) একখানি উত্তম ইংরাজি গ্রন্থ। দেখিতেছি, অনুবাদের মধ্য দিয়াই বিভিন্ন ইউরোপীয় ভাষার সাহিত্য সমগ্র ইউরোপের এক অখণ্ড সাহিত্য হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু ইংরাজ বঙ্গসাহিত্যকে তাহার ঘরের সাহিত্য করিয়া লইল কই? মিরিয়াম নাইট বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' অনুবাদ করিলেন (১৮৮৪)। এডউইন আরনলড সেই অনুবাদের ভূমিকা লিখিলেন। ডি. ডি. অজওয়েল "আলালের ঘরের দুলাল" অনুবাদ করিলেন (১৮৯৩)। কিন্তু এই দুই গ্রন্থ ইংরাজি সাহিত্যের সঙ্গে মিশিয়া গেল না। ইউরোপের আরও কয়েকটি ভাষায় উনবিংশ শতাব্দীর কয়েকখানি বাঙলা গ্রন্থ অনূদিত হইয়াছে। তবু বলি, আমাদের সাহিত্য ইউরোপীয় সাহিত্যের অন্দরমহলে প্রবেশলাভ করে নাই। অপরপক্ষে, আমরা ইউরোপীয় সাহিত্যকে ঘরের সাহিত্য করিয়া লইয়াছি।

এখন জিজ্ঞাসা করিতে হয়, এমন কেন হইল? সাহিত্যের ওলিম্পিকে আমাদের ভাগ্যে একটি ব্রোনজও কেন জুটিতেছে না? যদি বল, শ্বেতজগতের মানুষ শ্বেতজগতের সাহিত্যকেই একমাত্র সাহিত্য বলিয়া জানে, আমাদের সাহিত্যের প্রতি ঔদাসীন্য এক ধরনের বর্ণবিদ্বেষ, তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করিব—ইউরোপ উপনিষদ গীতা লইয়া মাতিল কেন। এক শ্রেষ্ঠ ফরাসি মনীষী রামকৃষ্ণ এবং বিবেকানন্দের জীবনী লিখিলেন কেন। সুইডিশ অ্যাকাডেমি রবীন্দ্রনাথকে এক শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া পুরস্কৃত করিলেন কেন। ইহার উত্তরে বলিবে—ইউরোপ আমাদের কাছে আধ্যাত্মিক কথা শুনিতে চায়, ইহজীবনের কথা শুনিতে চায় না। ইহজীবনের সকল কথা ইউরোপীয় সাহিত্যেই বিধৃত, সে কথা শুনিতে ইউরোপের পাঠককে ইউরোপের বাহিরে যাইতে হয় না। একথাও যেন মানিয়া লইতে পারি না।

গত শতাব্দীর বাঙলা সাহিত্য ইংরাজের কাছে ছিল পরাধীন দেশের সাহিত্য। সে সাহিত্যে শক্তি কোথা হইতে আসিবে। ইংরাজ লক্ষ্য করিয়াছে, সে সাহিত্য শিক্ষিত বাঙালির সাহিত্য, সকল বাঙালির সাহিত্য নহে। সে সাহিত্যের সৌরভ সারা ভারতে ছড়াইয়া পড়ে নাই। সে সাহিত্য এশিয়া মহাদেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই। অতএব ইংরাজ সে সাহিত্যে কী পাইবে। আর ইংরাজ যদি বাঙলা সাহিত্যকে মাথায় করিয়া না রাখে, সারা ইউরোপ তাহাকে আদর করিবে কেন।

সে যুগের শ্রেষ্ঠ কবি মাইকেল মধুসূদনের প্রসঙ্গই সর্বাগ্রে আলোচনা করিতে পারি। তাঁহার 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র ভাষা ও ছন্দ বাঙালিকে অভিভূত করিয়াছিল। কিন্তু যে অমিত্রাক্ষর ছন্দকে আমরা এক অপূর্ব সৃষ্টি বলিয়া গ্রহণ করিলাম, তাহা ইংরাজ পাঠককে মুগ্ধ করিবে কেন। মাইকেল যখন বাঙলা ভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন করেন, তখন ইংরাজি সাহিত্যে সে ছন্দের বয়স তিনশত বৎসর। আর যাঁহারা মিলটনের অমিত্রাক্ষর ছন্দের আস্বাদ পাইয়াছেন, তাঁহারা মাইকেলের অমিত্রাক্ষর ছন্দের বড়ো গোঁড়া হইবেন না। এই প্রসঙ্গে বাঙলা সাহিত্যের এক শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতের কথা উল্লেখ করিতে পারি। সাহিত্য একাডেমির অনুরোধে যখন ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত মিলটনের অ্যারিওপ্যাগিটিকা অনুবাদ করেন তখন তিনি উক্ত কবির কাব্যগ্রন্থগুলিও যত্ন করিয়া পাঠ করেন। একদিন তিনি 'প্যারাডাইজ লস্টে'র ছন্দ সম্বন্ধে আমাকে বলিলেন—এই ছন্দের কাছে মাইকেলের ছন্দকে বড়ো দুর্বল বলিয়া মনে হয়। কিন্তু মেঘনাদবধকাব্য ভাবে ভাষায় বাঙলা সাহিত্যের এক অপূর্ব বস্তু। এই কাব্যে কোনো গভীর জীবনদৃষ্টি উজ্জ্বল হইয়া উঠে নাই। আবার কোনো ভক্তিরসও ইহা হইতে উপছাইয়া পড়িতেছে না। ইহার মধ্যে নীতিকথারও বড়ো ছড়াছড়ি নাই। আর এই কাব্যে কবি বীররসে ভাসিতেছেন, এমন কথাও বলিতে পারি না। এই কাব্যের শেষে শুনি, সপ্ত দিবানিশি লঙ্কা কাঁদিলা বিষাদে। সে বিষাদ পাঠককেও স্পর্শ করে। মেঘনাদবধকাব্যের মূল সুর ট্র্যাজিডির সুর এবং সে সুর এপিকের মধ্যে যেন লিরিক সুর। আর ঐ দেখো, কাব্যের শেষে রাক্ষসভরসা বীরবর ইন্দ্রজিতের চিতার আগুনে যেন সকল ভুবন আলোকিত হইয়াছে। আর সেই আলোকে দেখি শোকার্ত রাবণ যেন দেবতার রূপ ধারণ করিয়াছেন।

বিশদ বস্ত্র, বিশদ উত্তরি
ধুতুরার মালা যেন ধূর্জটির গলে।

মাইকেল এক তত্ত্বজ্ঞ দার্শনিক হইলে বোধহয় চিতার আগুনে এত আলো দেখিতেন না। আর তাঁহার নিজের হৃদয় কোনো বিষম সন্তাপে পুড়িয়া না থাকিলে তিনি সেই দাহস্থল জাহ্নবীর জলে ধৌত করিতেন না। পৃথিবীর কোনো সাহিত্যে একখানি এপিক এমন নিবিড় ট্র্যাজিডিতে পরিণত হয় নাই। আবার একালের কোনো কবি স্বর্গ মর্ত্য পাতাল, দেব দানব মানুষ লইয়া এমন এক অখণ্ড লোক সৃষ্টি করেন নাই। প্রাচীন কাব্যে দেখি, ভূলোক আর দ্যুলোক যেন এক বৃহৎ জগৎ-সংসারে একাকার হইয়া গিয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালি কবি যেন সহজেই সেই প্রাচীন জগতে প্রবেশ করিয়াছেন। ইউরোপের কত কবি প্রাচীন গ্রীক কবির জগৎটিকে আবার সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছেন। তাঁহাদের কালের কেহ-কেহ বা প্রাচীন কালের স্বাদ গন্ধ, মৃদুমন্দ পাইয়াছেন। কিন্তু যে কোনো কবিই তাঁহার কালেরই কবি, এবং তাঁহার কালের কবি বলিয়াই তিনি সর্বকালের কবি। মেঘনাদবধকাব্যে কবির সমসাময়িক জীবনের কোনো ছাপ নাই। ইহা যেন এক সুনিপুণ হস্তে পটে-আঁকা প্রাচীন জীবনের ছবি, পুরাকালের যে গৌরবশশী চিরতরে অস্ত গিয়াছে, যাহা আর ফিরিবে না, তাহাই যেন এই কবির অলৌকিক প্রতিভার জাদুস্পর্শে আবার আবির্ভূত হইল। এই কাব্য সুন্দর, স্বাভাবিক নহে। কিন্তু ইহার মধ্যে এত প্রাণ কোথা হইতে আসিল। মূলত মেঘনাদবধকাব্য কবির আত্মবিলাপের এক এপিক বিস্তার। কবি বুঝি তাঁহার জীবনের বিষাদকে এক মহৎ এপিক কাহিনীর মহৎ বিষাদের মধ্যে মিশাইয়া দিয়া শান্তি পাইয়াছেন। ইহা যেন এক ব্যর্থ জীবনের বহু বাসনার চিতাভস্মের গ্রীসিয়ান আর্ন। একখানি বাঙলা কাব্যের এই 'অ্যাটিক্ সেপ' ইউরোপীয় পাঠককে হয়ত মুগ্ধ করিত। বিশ্বসাহিত্যের কথা বলিতে যাইয়া আমাদের

ঘরের সাহিত্যের একখানি কাব্য সম্বন্ধে দুই-একটি কথা বলিলাম এই একটি কথা বুঝাইতে যে, এ কাব্য পৃথিবীর সাহিত্যে অনন্য। ইহা ইংরাজি, জার্মান, ফরাসি প্রভৃতি ইউরোপীয় ভাষায় অনূদিত হইলে বিশ্বসাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি হইত।

কিন্তু যে কাব্য বাঙালি বা ভারতীয় পাঠক প্রায় উপেক্ষা করিলেন, সে কাব্য বিশ্বসাহিত্যের দুয়ারে পৌঁছাইবে কোন পথে? এই বিষয়ে একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করিতে পারি। ভের্সাই শহরে যে বাড়িটিতে মাইকেল তিন বৎসরেরও অধিক বাস করিয়াছিলেন, এবং যে বাড়িতে তিনি তাঁহার অধিকাংশ সনেট ও ছোট কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, সেই বাড়িটি ওই শহরের পৌরসংস্থার সঙ্গে পত্রালাপ করিয়া শনাক্ত করিয়াছিলাম। বাড়িটিতে মাইকেলের নামাঙ্কিত একটি ব্রোনজ ফলক বসাইবার অভিলাষে ফরাসি সরকারের কাছে পত্র দিয়াছিলাম। নিউইয়র্কে একটি ব্রোনজফলক প্রস্তুত করাইয়া তাহার ছবি, এবং কবি সম্বন্ধে একটি নোট ফরাসি সরকারকে পাঠাইলে তাঁহারা জানাইলেন যে, এইরূপ একটি ব্রোনজফলক স্থাপনে তাঁহাদের আগ্রহের অভাব হইবে না। কিন্তু এই ব্যাপারে তাঁহারা ফ্রান্সে ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের নিকট হইতে একখানি পত্রের অপেক্ষায় থাকিবেন। আমি আমাদের রাষ্ট্রদূতমহোদয়কে একখানি পত্র দিয়া সকল কথা জানাইলাম। রাষ্ট্রদূত-মহোদয়ের নিকট হইতে কোনো উত্তর আসিল না। ড. লোকনাথ ভট্টাচার্য তখন প্যারিসে ছিলেন। তিনি কবি, প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের ডকটর এবং ফরাসি ভাষায় সুপণ্ডিত। আমি ইংল্যান্ডে পৌঁছাইয়া লোকনাথবাবুকে একখানি চিঠি দিয়া অনুরোধ করিলাম—তিনি যেন আমাদের রাষ্ট্রদূতের দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়া ব্রোনজফলকটি স্থাপনের ব্যবস্থা করিয়া দেন। লোকনাথবাবু চিঠি পাইয়াই আমাদের রাষ্ট্রদূতের সাংস্কৃতিক সচিবের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং আমাদের উদ্দেশ্যের কথা তাঁহাকে বুঝাইয়া বলেন। আমাদের ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের সাংস্কৃতিক সচিব লোকনাথবাবুকে একটিই প্রশ্ন করিয়াছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন —মাইকেল কে? নিরুপায় হইয়া ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে একখানি চিঠি দিলাম এই বলিয়া যে, তিনি যদি মনে করেন যে এই ব্রোনজফলক ভের্সাই-র ওই বাড়িতে স্থাপন করা সংকর্ম, তাহা হইলে তিনি যেন অনুগ্রহ করিয়া ভারতীয় রাষ্ট্রদূতকে পত্র দেন। প্রধানমন্ত্রী বিশ্বভারতীর ছাত্রী হিসাবে মাইকেলের নাম শুনিয়াছেন, এই বিশ্বাসে চিঠিখানি লিখিয়াছিলাম। তিনি রাষ্ট্রদূতকে তারবার্তা পাঠাইয়া এই ব্রোনজ-ফলক স্থাপন করিবার সুযোগ করিয়া দিলেন। কিন্তু ১৯৬৭ সালের ৩রা জুলাই ভের্সাই শহরে এই উপলক্ষে যে সভা অনুষ্ঠিত হইল, সেই সভায় রাষ্ট্রদূত আসিলেন না। ভারতীয় রাষ্ট্রদূতাবাস হইতে কেবল সাংস্কৃতিক সচিব মহোদয় আসিয়াছিলেন। সেই দূতাবাসে উচ্চশিক্ষিত ভারতীয়ের সংখ্যা বড়ো কম ছিল না। বুঝিলাম, বাঙালি কবি মাইকেল ভারতীয় কবির আসন লাভ করেন নাই। ভের্সাই শহরের মেয়র এই সভায় ব্রোনজফলক-টির আবরণ উন্মোচন করেন এবং তাঁহার বক্তৃতায় বলেন যে, সেদিন হইতে মাইকেল এই শহরের এক বিশিষ্ট নাগরিক হিসাবে উল্লেখিত হইবেন।

এখন চিন্তা করা যাউক, ভারতীয় রাষ্ট্রদূত এই উপলক্ষে কী করিতে পারিতেন। তিনি প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় ইতিহাস দর্শন সাহিত্যের অধ্যাপকদের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়া ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে মাইকেল সম্বন্ধে একটি আলোচনাসভার ব্যবস্থা করিতে পারিতেন। ফরাসি দেশে মাইকেল সম্বন্ধে সকল তথ্য উপস্থিত করিয়া আমি তাঁহার দপ্তরে একখানি চিঠি লিখিয়াছিলাম। উহাতে মাইকেলের ভের্সাই শহর এবং ফরাসী কবি ভিক্তর হ্যুগো সম্বন্ধে সনেটের ইংরাজি গদ্যানুবাদ ছিল, তাঁহার নীতিগর্ভ কবিতার উপর ফরাসি কবি লা ফঁতেনের প্রভাব সম্বন্ধে কিছু কথা ছিল, ফরাসি ভাষায় লিখিত মাইকেলের একখানি চিঠি এবং তাঁহার দান্তে সম্বন্ধে সনেটটির স্বকৃত ফরাসি অনুবাদের উল্লেখ ছিল। ফরাসি সাহিত্যে সমালোচনা সম্বন্ধে মাইকেলের একটি স্মরণীয় উক্তিও এই চিঠিতে উদ্ধৃত করা হইয়াছিল। মেঘনাদবধ-কাব্যের গড়ন সম্বন্ধে মাইকেল রাজনারায়ণকে লিখিয়াছিলেন :

I think I have constructed the poem on the most rigid principles and even a French critic would not find fault with me.

লোকনাথবাবু এই বিষয়ে রাষ্ট্রদূত-মহোদয়কে সাহায্য করিতে পারিতেন এবং তিনি মাইকেল সম্বন্ধে ফরাসি বিশ্ববিদ্যালয়ে ফরাসি ভাষায় এক উত্তম বক্তৃতা করিতে পারিতেন। কিন্তু আমাদের রাষ্ট্রদূতাবাস এ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন রহিলেন। সাংস্কৃতিক সচিব মহোদয় কোনোমতে প্রধানমন্ত্রীর আদেশ পালন করিলেন।

যে কবিকে আমরা মাথায় করিয়া রাখিতে চাহি না, সে কবির সংবাদ বিশ্বের মানুষ রাখিবে কেন। গত শতাব্দীর ইংরাজি, জার্মান, ফরাসি বা রুশ সাহিত্য যে সর্বতোভাবে বিশ্বসাহিত্যের চাইতে সমৃদ্ধ, সে বিষয়ে দ্বিমত হইতে পারে না। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর বাঙলা সাহিত্যের কিছুই বিশ্বসাহিত্যে স্থান পাইতে পারে না, এমন কথা বলিতে পারি না। তবে এই সাহিত্যের কোন ভাগ কি কোন বস্তু সারা বিশ্বের মানুষ মুগ্ধ হইয়া পড়িবে, তাহা কে নির্ণয় করিবে? ইংরাজ পাঠকসমাজের সঙ্গে আমাদের কিঞ্চিদধিক পরিচয় আছে। সেই পাঠকসমাজ ইংরাজি সাহিত্যে এবং ইউরোপীয় সাহিত্যে মগ্ন। বাঙলা সাহিত্যের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি বড় পড়িবে বলিয়া মনে করি না। অপর পক্ষে, আমাদের সাহিত্য বিশ্বসাহিত্যের মাপকাঠিতে কোথায় দাঁড়াইয়া আছে, তাহাও জানিতে কৌতূহল হয়। বাঙলা সাহিত্যের ইংরাজি অনুবাদ করিয়া তাহা পড়িবার দায় ইংরাজের। এখন প্রশ্ন হইল এই যে, ইংরাজ যদি সেই দায় সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকেন, তাহা হইলে আমাদের কোনো কর্তব্য আছে কিনা। বিদেশের বিভিন্ন হাটে হাটে আমরা কত পণ্য বিক্রি করিতেছি। শিল্পকলার ক্ষেত্রেও দেখিতেছি, আমাদের কত ফিল্ম বিদেশে প্রদর্শিত হইতেছে। আমাদের যন্ত্রসংগীতও দেখি বিদেশে আদৃত হইতেছে। কেবল ভাষার বেড়া ভাঙিয়া আমাদের সাহিত্য বিদেশে প্রবেশ করিতে পারিতেছে না। বাঙলা সাহিত্যের অনুরাগী এক ইংরাজ যুবকের সঙ্গে গত বৎসর কলিকাতায় সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তাঁহার নাম উইলিয়াম রাডিচে। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজির কৃতী ছাত্র। বাঙলা শিখিয়া রবীন্দ্রনাথের কিছু কবিতা পেঙ্গুইনের জন্য অনুবাদ করিয়াছেন। সেই গ্রন্থখানি বাহির হইয়াছে কিনা বলিতে পারি না। কিন্তু লক্ষ করিলাম, মাইকেল সম্বন্ধে তাঁহার গভীর উৎসাহ। কিন্তু ইংলন্ডের কোন সংস্থা রাডিচে সাহেবকে এই কাজে উৎসাহিত করিবে? কোন বিশিষ্ট প্রকাশক তাঁহার মেঘনাদবধকাব্যের ইংরাজি অনুবাদ প্রকাশ করিবেন? কয়জন ইংরাজ সেই গ্রন্থ কিনিয়া পড়িবে? কয়জন ইংরাজ সমালোচক তাঁহার এই অনুবাদের সমালোচনা করিবেন? এক বিশেষ যৌথ উদ্যোগ ব্যতিরেকে আমাদের বাঙলা সাহিত্য ইংরাজি ভাষার মধ্য দিয়া বিশ্ব-সাহিত্যের অঙ্গ হইয়া উঠিতে পারিবে না। প্রথম প্রয়োজন কয়েকটি অনুবাদ-সংস্থার। কয়েকটি প্রকাশক, অক্সফোর্ড, কেমব্রিজ, লনডন প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন বাঙলার অধ্যাপক, রয়্যাল সোসাইটি অব লিটারেচারের কয়েকজন সদস্য, কয়েকটি সাহিত্য-পত্রিকার সমালোচক এবং বঙ্গদেশের সাহিত্য ইতিহাস সংস্কৃতি সম্বন্ধে উৎসাহী কয়েকজন লেখক বা পণ্ডিত এই সংস্থার পরিচালনা করিবেন। ইংরাজি-ভাষী তিনটি দেশেও—অর্থাৎ আমেরিকা, ক্যানাডা অস্ট্রেলিয়াতে—অনুরূপ সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হইবে। এই চারটি সংস্থা একযোগে শ্রেষ্ঠ বাঙলা গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশে তৎপর হইবেন।

আমরা বঙ্গদেশ হইতে এই সংস্থা-চতুষ্টয়ের সঙ্গে বিশেষভাবে সহযোগিতা করিতে পারি। কোনো অনুবাদক যদি আমাদের দেশে আসিয়া আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে নিবিড়ভাবে পরিচিত হইতে ইচ্ছা করেন, আমাদের কোনো বিশ্ববিদ্যালয় তাহার সেই শিক্ষার ভার লইবেন। আমাদের ছয়টি বিশ্ববিদ্যালয় যদি বছরে ছয়জন অনুবাদককে ফেলো হিসাবে গ্রহণ করিতে পারেন, তাহা হইলে এই অনুবাদের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইতে পারে। আর আমরা প্রত্যেক অনুবাদের এক হাজার খণ্ড ক্রয় করিবার প্রতিশ্রুতি দিতে পারি।

আমাদের সাহিত্যের ইংরাজি অনুবাদ সম্বন্ধে আমাদের উৎসাহের অভাব হইতে পারে না। যে গ্রন্থখানি আমরা মূলে পড়িয়া আনন্দ পাই তাহার ইংরাজি রূপেও আমাদের আকর্ষণ করিবে। শুনিয়াছি শেক্সপীয়রের জার্মান অনুবাদ পড়িয়া নাকি ইংলন্ডে শেক্সপীয়র সম্বন্ধে এক নূতন চিন্তার সূত্রপাত হইয়াছিল। যে কোনো সাহিত্য অনুবাদে যেন এই নবরূপ লাভ করে। অনুবাদ মূলানুগ হইয়াও এক নূতন সৃষ্টি। রবার্ট ব্রিজেস বাইবেলের অথরাইজড ভার্সন বা কি জেমস বাইবেল সম্বন্ধে বলিতেন :

...it has not only more beauty than any other vernacular rendering, but is in its vital parts more beautiful and intimate than its original.

একটি প্রাচ্যভাষার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থগুলির ইংরাজি অনুবাদ ইংরাজ লেখককেও এক নূতন ভাবজগতের সন্ধান দিতে পারে। আধুনিক ইউরোপীয় সাহিত্যের মূলস্রোতকে আমরা গ্রীকো-ল্যাটিন বলিয়া চিহ্নিত করিয়া থাকি। ইহার মধ্যে যে একটি প্রাচ্য উপাদান রহিয়া গিয়াছে তাহা আমরা ভুলিয়া যাই। বাইবেলের বহুদেশ ওল্ড টেস্টামেন্ট একখানি প্রাচ্যভাষার ক্লাসিক। সেই মহাগ্রন্থখানি যখন খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয়-দ্বিতীয় শতাব্দীতে গ্রীকবেশ ধারণ করিয়া ইউরোপে প্রবেশ করিল তখন এক অর্থে ইউরোপের সাহিত্যজগতে প্রাচ্য কাব্যসরস্বতীর আবির্ভাব ঘটিল। এই গ্রীক ওল্ড টেস্টামেন্টের গ্রীক, শ্লেটো বা অ্যারিস্টটলের গ্রীক বলিয়া চিহ্নিত হইল না। এই গ্রীক ভাষা সেমিটিক গ্রীক বলিয়া পরিচিত হইল। এইভাবে প্রাচীন ইউরোপের ভাষায় প্রাচ্য ধ্বনি প্রাচ্য ভাব প্রকাশ করিল। মূল নিউ টেস্টামেন্টের ভাষা সমকালীন গ্রীক, কিন্তু উহার রচয়িতারা যে ওল্ড টেস্টামেন্ট পড়িতেন তাহা ছিল সেমিটিক গ্রীকে অনূদিত ওল্ড টেস্টামেন্ট। ইউরোপীয় বাইবেলে এই প্রাচ্য কণ্ঠস্বর কোনো দিন স্তব্ধ হয় নাই। ৪০৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত সেন্ট জেরোমের ল্যাটিন বাইবেলে সেই কণ্ঠস্বর শুনিতে পাই। কিং জেমস বাইবেলের অভিনব ইংরাজিতেও সেই কণ্ঠস্বর। ইউরোপীয় সাহিত্যে যদি এক দ্বিতীয় রেনেসাঁস আসে এই প্রাচ্যের সাহিত্যের সংস্পর্শেই আসিবে। আমরা সেই দ্বিতীয় রেনেসাঁসের অপেক্ষায় বসিয়া আছি। সেই রেনেসাঁসে আমরাও আমাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে এক নতুন আলোকে দেখিতে পাইব।

রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত